বাংলাদেশের কবিতা (১৯৪৭-১৯৯০) : কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য

গবেষক

মো. ইসমাইল হোসেন সাদী

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩১

পুনঃভর্তির শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৫৫

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

ভীষ্মদেব চৌধুরী পিএইচ ডি
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
মুঠোফোন : ০১৭১১ ২২২ ১২২

Bhishmadeb Choudhury Ph D
Professor, Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka 1000
Mobile: 01711 222 122

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. ইসমাইল হোসেন সাদী কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের কবিতা (১৯৪৭-১৯৯০) : কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এতে প্রকাশিত প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত মৌলিক। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক ইতঃপূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেননি। এর কোনো অংশ গবেষক কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেননি।

(অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'বাংলাদেশের কবিতা (১৯৪৭-১৯৯০) : কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় আমার নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয়নি। এতে ব্যবহৃত প্রাথমিক তথ্য ও সহায়ক তথ্য-উপাত্তের সূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব।

(মো. ইসমাইল হোসেন সাদী)

পিএইচ ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩১
পুনঃভর্তির শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৫৫
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

আমি ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন গবেষক হিসেবে পিএইচডি প্রোগ্রামে নাম নিবন্ধন করি। আমার গবেষণার শিরোনাম 'বাংলাদেশের কবিতা (১৯৪৭-১৯৯০): কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিরোনাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণ আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনাতেই সম্পন্ন হয়েছে। শতব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি অভিসন্দর্ভটি সময় নিয়ে বহুবার পাঠ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আমার ব্যক্তিগত পঠন-সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলাদেশের কবিতা বিষয়ে তাঁর পঠন-পাঠন আমাকে মুগ্ধ করেছে। ফলে কবিতা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও বিশ্লেষণ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমাকে প্রভূত সাহস জুগিয়েছে। তিনি সানন্দে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এ-গবেষণাকর্ম সম্পাদনে প্রতিনিয়ত সহযোগিতার পাশাপাশি অনুপ্রাণিত করেছেন ভাষাসংগ্রামী, রবীন্দ্র-গবেষক আহমদ রফিক। নব্বই-ঊর্ধ্ব এই মনীষীর সংশয় ও উদ্বেগ ছিল, তাঁর জীবদ্দশাতে গবেষণাকর্মটি আমি সম্পন্ন করতে পারি কি না। অবিভক্ত ভারত, পাকিস্তান আমল, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যক্ষদর্শী বলে তাঁকে আমি একজন ত্রিকালদর্শী মানুষ মনে করি। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি; বিরল ও প্রখর স্মৃতিশক্তির ধারক প্রিয় মানুষটির পরামর্শ পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

আমার শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদী প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছেন দ্রুত গবেষণাকর্মটি শেষ করার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক সিরাজ সালেকীন, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর পরামর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাফাত মিশু, শ্রীনগর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কুদরত-ই-হুদার পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকর্মকে গতিশীল করেছে। তাঁদের সবার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকর্মটি যেন সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে পারি, সে-জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমার প্রাক্তন কর্মপ্রতিষ্ঠান *প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমান। প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছেন সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মালেকা বেগম, প্রথমা প্রকাশনের পাণ্ডুলিপি সম্পাদক ও শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন, *প্রথম আলো*র প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক এবং বর্তমানে ইন্ডিপেনডেন্ট টোয়েন্টিফোর ডটকমের নির্বাহী সম্পাদক সেলিম খান, সাংবাদিক রোকেয়া রহমান, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শারমিন আক্তার। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার দীর্ঘ সময়কালে নিয়মিত উপস্থিত হতে হয়েছে তত্ত্বধায়কের বাসায়। এ-সময়গুলোতে মাতৃস্নেহে গবেষণার অগ্রগতি জানতে চেয়েছেন রাজধানীর গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সমর্পিতা চৌধুরী। তাঁর সমাদর, স্বভাবজাত স্নেহ ও ঔদার্য থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। তাঁর আন্তরিকতা ভুলবার নয়।

গবেষণাপর্বের দীর্ঘ এ-যাত্রায় মাঝেমধ্যেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি, নিরুৎসাহিত বোধ করেছি। বিশেষ করে কোভিডের সময়গুলোতে যখন গবেষণার কাজে কোনোভাবেই মনোযোগী হতে পারছিলাম না, তখন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন কতিপয় বন্ধু-স্বজন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক মিথুন ব্যানার্জি, পরিবেশবিদ ড. গোলাম রব্বানী, কবি অনন্য কামরুল, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও নিউজিল্যান্ডের ওটাগো ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক রাকিবুল হাসান খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ও যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত মাফরুহা সিফাত। তাঁদের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা।

গবেষণাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস, প্রথম আলো গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের ডিন অধ্যাপক সামিয়া হকসহ সব সহকর্মীকে।

আমার এ-গবেষণাকর্ম একেবারে অসম্ভব ছিল যদি না আমার সহধর্মিণী জান্নাত সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমার মতো তিনিও অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। মাঝেমধ্যে মেজাজ হারিয়ে ফেললেও তিনি মুখ বুঁজে সহ্য করেছেন। পূর্ণকালীন চাকরি করে এ-গবেষণা করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত করেছি আমার দুই সন্তান সাত বছর বয়সী প্রাজ্ঞ ও দেড় বছর বয়সী প্রত্যুষাকে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ছেলের তুচ্ছ আবদারও অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। সন্তানদের প্রাপ্য সময় কেড়ে নিয়ে এ-গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে হয়েছে। তাদের প্রতি অপার ভালোবাসা।

আমার মা সাজেদা খাতুন, বাবা হজরত আলী রোগজর্জরিত শরীরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করেছেন আমার গবেষণার অগ্রগতির প্রত্যাশায়। তাই আমার এ-গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কবিতা (১৯৪৭-১৯৯০) : কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য

[সার-সংক্ষেপ]

এখনো বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষক-শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা রয়েছে এবং ইতিহাসের আর্থসামাজিক পর্বগুলোতে লক্ষ করলে পাওয়া যায় অবিকল্প এই নির্ভরতা অতীতে আরও বেশি ছিল। তাই ধরে নেওয়া যেতেই পারে, বাংলাদেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন কবিদের কবিতাশিল্পে বিচিত্র বিষয়, উপাদান ও প্রবণতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গও বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গের বিষয়-মাত্রা ও গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং কবিদের নান্দনিক সাফল্যকে চিহ্নিত করা। এ-প্রয়াসে আমাদের গবেষণায় অবলম্বিত হয়েছে গুণগত অনুসন্ধান পদ্ধতি। নির্দিষ্ট কালসীমায় (১৯৪৭-১৯৯০) সম্পন্ন গবেষণাকর্মটিতে গুণগত গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে সমাজবৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন-দৃষ্টির সমন্বয় করা হয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশের কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন পর্ব নয়, তাই কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গের শেকড় খুঁজতে যথারীতি আমাদের প্রথম অবস্বলন করতে হয়েছে চর্যাপদের ওপর। সেই পথ ধরে কবিতার ইতিহাস যত এগিয়েছে, আমরা ক্রমশ অনুসন্ধান করেছি মধ্যযুগের তুলনামূলকভাবে বেশি আকর্ষণীয় কাব্যিক স্তরগুলোতে। এক্ষেত্রে শাহ মুহম্মদ সগীর, বড়ু চণ্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, *শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়নের* অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিচিত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যসহ শাক্ত পদাবলির রামপ্রসাদ সেনের মতো মধ্যযুগের খ্যাতিমান কবিদের প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যকর্মে আমরা কেন্দ্রীভূত রেখেছি আমাদের অনুসন্ধান।

উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকপর্বের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। এই সূত্রে আমরা দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার ওপর। তাই গবেষণা-বিষয়ের শিরোনামে 'বাংলাদেশের কবিতা' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হলেও আমাদের গবেষণার আওতাভুক্ত হয়েছে এ-শতকের প্রধান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ-কাব্য*, বিহারীলাল চক্রবর্তীর *বঙ্গসন্দুরী*, *সারদামঙ্গলসহ* প্রাসঙ্গিক কিছু রচনা। আর যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ব্যাপ্তি উনিশ ও বিশ শতকজুড়ে, সেহেতু কৃষক ও শ্রমজীবীদের নিয়ে তাঁর রচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে-পরের কবিতাসহ বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রাসঙ্গিক কিছু কবিতাও আমাদের গবেষণাভুক্ত হয়েছে। একই বিবেচনায় কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী চেতনার কবিতাপ্রসঙ্গ এবং জসীমউদ্‌দীনের নির্দিষ্ট সময়ের কবিতাপ্রসঙ্গকে আমরা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি।

ত্রিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র প্রাসঙ্গিক কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ কতটা এসেছে,

কেন এসেছে কিংবা আসেনি, তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। আড়াই দশকের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘটন বৈশ্বিক ও ভারতীয় রাজনীতিকে নানামুখী পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ-সময় অনেক কবিই হয়ে উঠেছেন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন। কেউ কেউ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়েছেন। কবিতাকে তাঁরা নিয়েছিলেন 'জীবনের জন্য শিল্প' হিসেবে। যেহেতু বাংলাদেশের কবিতার যাত্রাই হয়েছে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলস্বরূপ, সেহেতু চল্লিশের রাজনীতি-সচেতন কবি ও কবিতা এ-অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে গুরুত্বের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। ফলে জনমানুষ তথা বঞ্চিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে মার্ক্সবাদী কবি দিনেস দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর কবিতায়, তার পটভূমিসহ শিল্পিত কবিতাবলিতে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত না হয়েও আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় কতটা গুরুত্ব পেয়েছে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ, তাও অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে।

যেহেতু আমাদের মূল লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়-পরিসরে বাংলাদেশের কবিতায় (১৯৪৭-১৯৯০) কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা, তাই ত্রিশ ও চল্লিশের কবিদের কবিতা বিবেচনার ক্ষেত্রে কেবল তাঁদের আবির্ভাবকালের দশকসীমার মধ্যে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা না হলে গবেষণার কাল ও পরিধি লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতো। কেননা, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক কবিই পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়েও কবিতাঙ্গনে সক্রিয় ছিলেন।

বাংলা কবিতা কীভাবে বাংলাদেশের কবিতায় রূপান্তরিত হলো এবং এর মধ্য দিয়ে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠল কবিদের কবিতার ভাষায়, সেসব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিক সীমানা দেয়াল বাংলা কবিতাকে পৃথক করলেও তা দুর্বল না হয়ে হয়ে উঠল দোর্দণ্ড স্বাজাত্যবোধে উচ্চকিত। ১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার কবিদের করে তুলল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় আশ্‌রাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত কবিতা-সংকলন *নতুন কবিতা*। নতুন ভূখণ্ডের নতুন স্বাদের এসব কবিতাতে পাকিস্তানপ্রাপ্তির উল্লাস ব্যক্ত হলেও একধরনের স্বকীয়তা অর্জনের প্রয়াস ছিল স্পষ্ট। তেরোজন কবির দুই বা ততোধিক কবিতা এতে সংকলিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বলে এ-সংকলনের দুজন কবির কবিতা গবেষণার স্বার্থে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চার বছরব্যাপী চলমান ভাষা আন্দোলনপর্বে পূর্ববঙ্গের পঞ্চাশের কবিদের তেমন কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল হিসেবে ১৯৫৩ সালে আমরা পাই ঐতিহাসিক সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*। বাংলাদেশের কবিতার যাত্রারম্ভেই স্বকীয়তা অর্জনের সাফল্য তথা চেতনাগত ও ভাষাগত দালিলিক প্রমাণ হিসেবে সংকলনটির গুরুত্ব অপরিসীম। এর

মধ্য দিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণাকে ভুলে এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয় ঝেড়ে ফেলে পূর্ববঙ্গের বাঙালি কবিগণ মূলত প্রগতি ভাবনাকে মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়ে, কবিতাকে নিজস্ব সড়কে প্রতিস্থাপন করে এবং লক্ষ্যভেদী শিল্পসংকল্পে এগিয়ে নেওয়ার সাহস অর্জন করেন। কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত এ-সংকলনে কবিতার পাশাপাশি গল্প-গদ্য-গান-চিত্রকর্মও প্রকাশিত হয়েছিল। এতে স্থান পাওয়া তিনজন কবির কবিতাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে নিয়ে আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে। এরপর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রকাশ পেতে থাকে বাংলাদেশের আরও নতুন আবির্ভূত কবির কাব্যগ্রন্থ।

ষাটের দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে চিহ্নিত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন একদিকে ছাত্র আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একতাবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকারের নেওয়া নানা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ চলেছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবিতে জনরোষে উত্তাল ছিল রাজপথ। এ-সময়ে আবির্ভূত কবিগণ পূর্বসূরি পঞ্চাশের কবিদের চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে কাব্যসৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁদেরও নতুন ধাঁচের কবিতা রচনার জন্য নতুন উপাদান ও শিল্পকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। এ-সময় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে কবিদের রাজধানীমুখী হওয়ার প্রবণতা আরও বেড়েছে। দেশে চলছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসন। আগের দশকের মতো এ-সময়ও চেপে বসেছিল জান্তাদের কুশীলবেরা। ফলে কোনো কোনো কবি হতাশায় পর্যবসিত হয়ে লিখেছেন নঞর্থক কবিতা; কেউ কেউ নিজেদের সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড় করিয়ে সংগ্রাম ও শিল্পচর্চাকে একসূত্রে গেঁথে সোচ্চার হয়েছেন অধিকার আদায়ে। তাঁদের কবিতাই কথা বলে উঠেছে বাংলাদেশের কবিতার নিজস্ব স্বর ও সুরে; কোনো কোনো কবি কেবল নাগরিক চেতনাচিত্র গাঁথতে চেয়েছেন তাঁদের কবিতাকথনে; আবার কোনো কোনো কবি শেকড় ছেড়ে গ্রাম-প্রকৃতি-মানুষের প্রতি নস্টালজিক থেকে মানসিকভাবে বারবার ফিরতে চেয়েছেন শেকড়ের কাছে; কেউ-বা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়েও কবিতার সামগ্রিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছেন চিরচেনা গ্রামকেন্দ্রিক সর্বজনীন শ্রমজীবীদের কাব্যচর্চার কেন্দ্রে স্থাপন করে। তবে এসব বৈশিষ্ট্যের মাঝেই কারও কারও কবিতায় প্রবলভাবে এসেছে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গের নানামাত্রিক চালচিত্র।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সত্তরের দশক অত্যন্ত ঘটনাবহুল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হতে না হতেই স্বাধীন দেশের স্থপতিকে সপরিবার হত্যা, ষাটের দশকের মতো আবারও অগণতান্ত্রিক পথে দেশের পশ্চাদপসরণ, সামরিক বাহিনী দ্বারা রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের চলা-বলা ও লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা, দিশেহারা জনজীবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নতুন কবিদের আবির্ভাব ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই এ-সময়ের কবিগণ আরও বেশি রাজনীতি-সচেতন, আরও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

আশির দশকের মতো অস্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় রাজনীতি ও সমাজিক প্রতিশ্রুতি আরও বেশি প্রগাঢ় হওয়া দরকার ছিল। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যে এ-সময়ও ছিল ক্ষোভ ও বিষণ্নতা। মধ্য সত্তরে সদ্য স্বাধীন দেশে যে স্বৈরশাসকের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এ-দশকের শুরুতে সেই স্বৈরশাসকের হত্যাজনিত পতনের পর দেশ চলে যায় অন্য স্বৈরশাসকের কবলে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ-সময়ের কবিগণ সামাজিক দায়বদ্ধতার চেয়ে শিল্প স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। এ-সময়ে সংগঠিত লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার ছদ্মবেশে কবি-সাহিত্যিকেরা ছোট ছোট দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে একধরনের উন্নাসিকতার মধ্য দিয়ে তাঁরা কবিতার নতুন ধারা প্রণয়নের প্রয়াস চালান। যা আসলে বাংলাদেশের মূলধারার কবিতা থেকে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, তাঁদের অনেকের কবিতা দিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের কবিতাকে চেনা যায় না। ফলে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ তাঁদের কবিতায় উপেক্ষিত হয়েছে। তাই এ-সময়ের অনেক খ্যাতিমান কবিরই কবিতা আমাদের আলোচনাভুক্ত হয়নি।

আমাদের গবেষণায় আলোচিত সব কবির নির্বাচিত কবিতার শিল্পসাফল্য ও নান্দনিকতা মূল্যায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও সমাজবৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে কবিতার নান্দনিক সমীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ তুলে আনার ক্ষেত্রে কবিদের ভাষাগত দক্ষতা, শব্দ ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যবোধ, চিত্রকল্পের মৌলিকতাসহ সামগ্রিক নান্দনিকতার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

আমাদের অভিসন্দর্ভের অন্বিষ্ট ছিল, বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় রচিত কবিতায় কৃষক-শ্রমিক ও তাদের জীবনের প্রসঙ্গ অনুসন্ধান ও তার মূল্যায়ন। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের উপান্তে গিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ব্যতীত বেশির ভাগ কবিই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিপতি, শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টি দিয়েই কৃষক-শ্রমিককে অবলোকন করেছেন। ফলে সাতচল্লিশোত্তর সময়ে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলার মধ্য দিয়ে নতুন ধরন ও নতুন ধারার কাব্যচর্চা শুরু হলেও কৃষকের সংগ্রামী জীবন ও চির-উপেক্ষিত অবস্থা তাঁদের কবিতাকে খুব একটা স্পর্শ করেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, নতুন রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা শুরু করার মধ্য দিয়ে সমাজ ও সময়ের প্রতি সচেতন থেকে এবং নতুন দায়িত্বের প্রতি প্রবলভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেকেও নাগরিক কবি হয়ে ওঠার এক অদম্য বাসনা সবাইকে পেয়ে বসেছিল। শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার দরুন উঠতি মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে নগরবাসী হওয়ার এই প্রবণতা পঞ্চাশের দশক থেকে ষাট-সত্তর পেরিয়ে আশির দশকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নির্বাচিত কবিদের বিপুলসংখ্যক কবিতার মধ্য থেকে খুব কমসংখ্যক কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। এই কবিতাসমূহকে তিনভাবে ভাগ করা

যায়। প্রথমত, কেবল কবিতার শিল্পগত শ্রীবৃদ্ধি ও মানবৃদ্ধিতে কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গের ব্যবহার। এই প্রবণতাকে নিছক কবিতার প্রয়োজন মেটানোর অবলম্বন বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্বিতীয়ত, কৃষক-শ্রমিকের বঞ্চনা ও ত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করে কবিতা রচনার প্রয়াস; যেখানে কখনো-কখনো কবিগণ তাদের (কৃষক-শ্রমিকের) উত্তরসূরির সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গকে কবিতা ও শিল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করে কবিতা রচনার প্রয়াস চালানো। এক্ষেত্রে বামপন্থি বা মার্ক্সবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত কবিগণের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের অনেকের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ অধিক গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণির মানুষের অধিকার আদায়ের ভাবনা, তাদের চিরায়ত বঞ্চনা থেকে মুক্তির প্রয়াসে নিজেদের ভেতরে লালন করা বহমান যন্ত্রণা দ্বারা সমাজকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা কিংবা কৃষক-শ্রমিকের হয়ে নতুন স্বপ্ন দেখতে পক্ষাবলম্বন করার প্রয়াসও তাঁদের কবিতায় লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিকের উত্তরসূরি হিসেবে তাদের বঞ্চিত সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরা শিল্পিত কবিতা নির্মাণে অগ্রগামী হয়েছেন। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে এ-ত্রিধারার কবিতাকেই বিশ্লেষণ-বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭-১৩

প্রথম অধ্যায় ১৪-৪৫
পরিপ্রেক্ষিত : বাংলা কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৬-১০০
বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায় ১০১-২৪৫
বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ : উপাদান ও সৃজনবৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : পঞ্চাশের দশকের কবিতা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ষাটের দশকের কবিতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সত্তরের দশকের কবিতা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আশির দশকের কবিতা

চতুর্থ অধ্যায় ২৪৬-২৯৭
বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন : নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষা

উপসংহার ২৯৮-৩০২

গ্রন্থপঞ্জি ৩০৩-৩১১

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় বাংলা কবিতার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শাসনে-ত্রাসনে ইতিহাসের বাঁকবদল কবিতার গতিপথকেও নতুনরূপে চিহ্নিত করেছে। তেমনই ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশের কবিতা' বাংলা কবিতার বৃহত্তর মহাসড়কে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়, আঙ্গিক, শিল্পচিন্তা, স্বকীয় চিত্রকল্প-ভাবনা এবং শব্দ-ছন্দের নবমাত্রিক মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৯৪৭-উত্তর কালে বাংলাদেশের কবিতার সমৃদ্ধিযাত্রা স্পষ্ট হলেও এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাসের গভীরে। এভাবে বাংলাদেশের কবিগণ বহুবিচিত্র বিষয় ও প্রবণতাকে আত্মস্থ করে কাব্যশিল্পকে চিরস্থায়ী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাদানের সুযোগ পেয়েছেন। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশবিভাগ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কবিগণ ভাষার ভিত্তিতে বাঙালি জনজাতি গঠনেও ভূমিকা রেখেছেন। বাঙালির সামূহিক প্রয়াস দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হওয়ার পাশাপাশি ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে শানিত হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংঘটিত করেছে, ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, স্বাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিজয় অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে কবিগণ শিল্পগত ও জাতিগত প্রয়োজনে স্বকীয় কবিতাভাবনায় বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রক্ষেপণের পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাধারণের আত্মত্যাগ, কৃষক-শ্রমিকের অসহায়ত্ব, তাদের অধিকার-ভাবনা প্রভৃতি বিষয় এবং সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবিতার নিজস্ব অবয়ব গড়ে তুলেছেন। বাংলা কবিতার এই সুর, বাণী ও অভীপ্সা একেবারে নতুন স্বাদের; নতুন প্রত্যয় ও উপলব্ধিরও।

মূলত ভূমি, কৃষি ও কৃষিশ্রমভিত্তিক সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে গোত্রান্তরিত হয়ে আসে বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। দেশবিভাগের সময় ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পেলে শিক্ষিত সমাজের একটা বৃহৎ অংশ নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কবিদের শেকড় গ্রাম এবং কৃষি সমাজভিত্তিক হলেও তাঁরাও ছিলেন ক্রমশ শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হওয়া জনগোষ্ঠীর একাংশ। এখনো বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষক-শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা রয়েছে এবং ইতিহাসের আর্থসামাজিক পর্বগুলোতে লক্ষ করলে পাওয়া যায় অবিকল্প এই নির্ভরতা অতীতে আরও বেশি ছিল। তাই ধরে নেওয়া যেতেই পারে, মৃত্তিকাসংলগ্ন এইসব কবির কবিতাশিল্পে বিচিত্র বিষয়, উপাদান ও প্রবণতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গও বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের

উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গের বিষয়-মাত্রা ও গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং কবিদের নান্দনিক সাফল্যকে চিহ্নিত করা। এ-প্রয়াসে আমাদের গবেষণায় অবলম্বিত হয়েছে গুণগত অনুসন্ধান পদ্ধতি। নির্দিষ্ট কালসীমায় (১৯৪৭-১৯৯০) সম্পন্ন গবেষণাকর্মটিতে গুণগত গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে সমাজবৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন-দৃষ্টির সমন্বয় করা হয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশের কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন পর্ব নয়, তাই কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গের শেকড় খুঁজতে যথারীতি আমাদের প্রথম অবম্বলন করতে হয়েছে চর্যাপদের ওপর। সেই পথ ধরে কবিতার ইতিহাস যত এগিয়েছে, আমরা ক্রমশ অনুসন্ধান করেছি মধ্যযুগের তুলনামূলকভাবে বেশি আকর্ষণীয় কাব্যিক স্তরগুলোতে। এক্ষেত্রে শাহ মুহম্মদ সগীর, বড়ু চণ্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, *শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়নে*র অপেক্ষারত স্বল্প-পরিচিত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যসহ শাক্ত পদাবলির রামপ্রসাদ সেনের মতো মধ্যযুগের খ্যাতিমান কবিদের প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যকর্মে আমরা কেন্দ্রীভূত রেখেছি আমাদের অনুসন্ধান। তাই আমাদের গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘পরিপ্রেক্ষিত : বাংলা কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ’।

উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকপর্বের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। এই সূত্রে আমরা দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার ওপর। তাই গবেষণা-বিষয়ের শিরোনামে ‘বাংলাদেশের কবিতা’ শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হলেও আমাদের গবেষণার আওতাভুক্ত হয়েছে এ-শতকের প্রধান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ-কাব্য*, বিহারীলাল চক্রবর্তীর *বঙ্গসন্দুরী*, *সারদামঙ্গল*সহ প্রাসঙ্গিক কিছু রচনা। আর যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ব্যাপ্তি উনিশ ও বিশ শতকজুড়ে, সেহেতু কৃষক ও শ্রমজীবীদের নিয়ে তাঁর রচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে-পরের কবিতাসহ বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রাসঙ্গিক কিছু কবিতাও আমাদের গবেষণাভুক্ত হয়েছে। একই বিবেচনায় কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী চেতনার কবিতাপ্রসঙ্গ এবং জসীমউদ্‌দীনের নির্দিষ্ট সময়ের কবিতাপ্রসঙ্গকে আমরা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। কারণ, এ-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা : কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ’। এ ছাড়াও এ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ত্রিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র প্রাসঙ্গিক কবিতা। তাঁদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ কতটা এসেছে, কেন এসেছে কিংবা আসেনি, তার অনুসন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য এই অধ্যায়ে। আড়াই দশকের ব্যবধানে

দুটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘটন বৈশ্বিক ও ভারতীয় রাজনীতিকে নানামুখী পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ-সময় অনেক কবিই হয়ে উঠেছেন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন। কেউ কেউ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়েছেন। কবিতাকে তাঁরা নিয়েছিলেন 'জীবনের জন্য শিল্প' হিসেবে। যেহেতু বাংলাদেশের কবিতার যাত্রাই হয়েছে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলস্বরূপ, সেহেতু চল্লিশের রাজনীতি-সচেতন কবি ও কবিতা এ-অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে গুরুত্বের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। ফলে জনমানুষ তথা বঞ্চিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে মার্ক্সবাদী কবি দিনেস দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর কবিতায়, তার পটভূমিসহ শিল্পিত কবিতাবলিতে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত না হয়েও আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় কতটা গুরুত্ব পেয়েছে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ, তাও অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যেহেতু আমাদের মূল লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়-পরিসরে বাংলাদেশের কবিতায় (১৯৪৭-১৯৯০) কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ ও সৃজনবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা, তাই ত্রিশ ও চল্লিশের কবিদের কবিতা বিবেচনার ক্ষেত্রে কেবল তাঁদের আবির্ভাবকালের দশকসীমার মধ্যে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা না হলে গবেষণার কাল ও পরিধি লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতো। কেননা, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক কবিই পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর পেরিয়েও কবিতাঙ্গনে সক্রিয় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন : উপাদান ও সৃজনবৈশিষ্ট্য'। অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। পরিচ্ছেদগুলোতে বাংলা কবিতা কীভাবে বাংলাদেশের কবিতায় রূপান্তরিত হলো এবং এর মধ্য দিয়ে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠল কবিদের কবিতার ভাষায়, সেসব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিক সীমানা-দেয়াল বাংলা কবিতাকে পৃথক করলেও তা দুর্বল না হয়ে হয়ে উঠল দোর্দণ্ড স্বাজাত্যবোধে উচ্চকিত। ১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার কবিদের করে তুলল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় আশ্‌রাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত কবিতা-সংকলন *নতুন কবিতা*। নতুন ভূখণ্ডের নতুন স্বাদের এসব কবিতাতে পাকিস্তানপ্রাপ্তির উল্লাস ব্যক্ত হলেও একধরনের স্বকীয়তা অর্জনের প্রয়াস ছিল স্পষ্ট। তেরোজন কবির দুই বা ততোধিক কবিতা এতে সংকলিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বলে এ-সংকলনের দুজন

কবির কবিতা গবেষণার স্বার্থে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চার বছরব্যাপী চলমান ভাষা আন্দোলনপর্বে পূর্ববঙ্গের পঞ্চাশের কবিদের তেমন কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল হিসেবে ১৯৫৩ সালে আমরা পাই ঐতিহাসিক সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*। বাংলাদেশের কবিতার যাত্রারম্ভেই স্বকীয়তা অর্জনের সাফল্য তথা চেতনাগত ও ভাষাগত দালিলিক প্রমাণ হিসেবে সংকলনটির গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্য দিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণাকে ভুলে এবং সাম্প্রদায়িক পরিচয় ঝেড়ে ফেলে পূর্ববঙ্গের বাঙালি কবিগণ মূলত প্রগতি ভাবনাকে মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়ে, কবিতাকে নিজস্ব সড়কে প্রতিস্থাপন করে এবং লক্ষ্যভেদী শিল্পসংকল্পে এগিয়ে নেওয়ার সাহস অর্জন করেন। কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত এ-সংকলনে কবিতার পাশাপাশি গল্প-গদ্য-গান-চিত্রকর্মও প্রকাশিত হয়েছিল। এতে স্থান পাওয়া তিনজন কবির কবিতাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে নিয়ে আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে। এরপর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রকাশ পেতে থাকে বাংলাদেশের আরও নতুন আবির্ভূত কবির কাব্যগ্রন্থ। এ-পর্যায়ে পঞ্চাশের কবিদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, দিলওয়ার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমানের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে 'পঞ্চাশের দশকের কবিতা' শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে। তাঁদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কোনো কর্মী-কবি না থাকলেও তাঁদের কবিতা ছিল সমাজ ও মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল। সেই সুবাদে একেকজন একেকভাবে কৃষক-শ্রমিকের জীবনকে তাঁদের কবিতায় শিল্পিত উপায়ে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের কবিতা এ-গবেষণায় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

ষাটের দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে চিহ্নিত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন একদিকে ছাত্র আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একতাবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকারের নেওয়া নানা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ চলেছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবিতে জনরোষে উত্তাল ছিল রাজপথ। এ-সময়ে আবির্ভূত কবিগণ পূর্বসূরি পঞ্চাশের কবিদের চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে কাব্যসৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁদেরও নতুন ধাঁচের কবিতা রচনার জন্য নতুন উপাদান ও শিল্পকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। এ-সময় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে কবিদের রাজধানীমুখী হওয়ার প্রবণতা আরও বেড়েছে। দেশে চলছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসন। আগের দশকের মতো এ-সময়ও চেপে বসেছিল জান্তাদের কুশীলবেরা। ফলে কোনো কোনো কবি

হতাশায় পর্যবসিত হয়ে লিখেছেন নঞর্থক কবিতা; কেউ কেউ নিজেদের সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড় করিয়ে সংগ্রাম ও শিল্পচর্চাকে একসূত্রে গেঁথে সোচ্চার হয়েছেন অধিকার আদায়ে। তাঁদের কবিতাই কথা বলে উঠেছে বাংলাদেশের কবিতার নিজস্ব স্বর ও সুরে; কোনো কোনো কবি কেবল নাগরিক চেতনাচিত্র গাঁথতে চেয়েছেন তাঁদের কবিতাকথনে; আবার কোনো কোনো কবি শেকড় ছেড়ে গ্রাম-প্রকৃতি-মানুষের প্রতি নস্টালজিক থেকে মানসিকভাবে বারবার ফিরতে চেয়েছেন শেকড়ের কাছে; কেউ-বা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়েও কবিতার সামগ্রিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছেন চিরচেনা গ্রামকেন্দ্রিক সর্বজনীন শ্রমজীবীদের কাব্যচর্চার কেন্দ্রে স্থাপন করে। তবে এসব বৈশিষ্ট্যের মাঝেই কারও কারও কবিতায় প্রবলভাবে এসেছে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গের নানামাত্রিক চালচিত্র। কবিতার এসব বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিবেচনায় রেখে 'ষাটের দশকের কবিতা' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। এ-সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের মধ্যে যাঁদের কবিতা কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অনুসন্ধানের জন্য বিবেচিত হয়েছে, তাঁরা হলেন রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, আবিদ আনোয়ার।

এ-অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে অনুসন্ধানের আওতায় নেওয়া হয়েছে সত্তরের দশকের কবিতা। তাই এর নামও অভিন্ন, 'সত্তরের দশকের কবিতা'। বাংলাদেশের ইতিহাসে সত্তরের দশক অত্যন্ত ঘটনাবহুল। রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হতে না হতেই স্বাধীন দেশের স্থপতিকে সপরিবার হত্যা, ষাটের দশকের মতো আবারও অগণতান্ত্রিক পথে দেশের পশ্চাদপসরণ, সামরিক বাহিনী দ্বারা রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের চলা-বলা ও লেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা, দিশেহারা জনজীবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নতুন কবিদের আবির্ভাব ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই এ-সময়ের কবিগণ আরও বেশি রাজনীতি-সচেতন, আরও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এ-সময়ের কবিদের মধ্যে যাঁদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে, তাঁরা হলেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আবিদ আজাদ, ত্রিদিব দস্তিদার, সমুদ্র গুপ্ত, আবু হাসান শাহরিয়ার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'আশির দশকের কবিতা'। গবেষণা-প্রকল্পের কাল-পরিসর অনুযায়ী এটি শেষ দশক। এ-সময়ের বেশির ভাগ কবির মধ্যে ত্রিশের কবিদের মতো ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জেঁকে বসেছিল। ফলে 'ব্যতিক্রম ও নতুন কিছু করার মানসে' তাঁদের অনেকের কবিতায় সামাজিক প্রতিশ্রুতি, রাজনৈতিক সচেতনতা উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ আশির দশকের মতো অস্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় রাজনীতি ও সমাজিক প্রতিশ্রুতি আরও বেশি প্রগাঢ় হওয়া দরকার ছিল। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যে এ-সময়ও ছিল ক্ষোভ ও

বিষণ্নতা। মধ্য সত্তরে সদ্য স্বাধীন দেশে যে স্বৈরশাসকের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এ-দশকের শুরুতে সেই স্বৈরশাসকের হত্যাজনিত পতনের পর দেশ চলে যায় অন্য স্বৈরশাসকের কবলে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ-সময়ের কবিগণ সামাজিক দায়বদ্ধতার চেয়ে শিল্প স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। এ-সময়ে সংগঠিত লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার ছদ্মবেশে কবি-সাহিত্যিকেরা ছোট ছোট দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে একধরনের উন্নাসিকতার মধ্য দিয়ে তাঁরা কবিতার নতুন ধারা প্রণয়নের প্রয়াস চালান। যা আসলে বাংলাদেশের মূলধারার কবিতা থেকে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, তাঁদের অনেকের কবিতা দিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের কবিতাকে চেনা যায় না। ফলে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ তাঁদের কবিতায় উপেক্ষিত হয়েছে। তাই এ-সময়ের অনেক খ্যাতিমান কবিরই কবিতা আমাদের আলোচনাভুক্ত হয়নি। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কিছু প্রাসঙ্গিক কবিতাকে প্রতিশ্রুতিশীল মনে হয়েছে। তাঁর কবিতায় একাধারে শিল্প ও সমাজের প্রতি সমান নিবেদন লক্ষ করা যায়। এর বাইরে মাসুদ খান, কাজল শাহনেওয়াজ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, শোয়েব শাদাবের কিছু কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনের নানা অনুষঙ্গ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আশির দশকের অনেক কবির কাব্যগ্রন্থ আমাদের নির্ধারিত কাল-পরিসরের পরে প্রকাশিত হয়েছে বলে তাঁদের কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল নয়, কবিতার রচনাকাল বিবেচনায় নিয়ে আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে।

'বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন : নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শিরোনামে এ-অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়টি বিন্যস্ত হয়েছে। শব্দই শেষ পর্যন্ত কবিতার চারিত্র্য নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ কেবল আলংকারিক সৌন্দর্যই প্রকাশ করে না, বিষয় ও বক্তব্যের ভাবগত ব্যঞ্জনাকেও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। এ অধ্যায়ের উল্লিখিত প্রত্যয়কেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নান্দনিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এ-অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত সব কবির নির্বাচিত কবিতার শিল্পসাফল্য ও নান্দনিকতা মূল্যায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও সমাজবৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে কবিতার নান্দনিক সমীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ তুলে আনার ক্ষেত্রে কবিদের ভাষাগত দক্ষতা, শব্দ ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যবোধ, চিত্রকল্পের মৌলিকতাসহ সামগ্রিক নান্দনিকতার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

উল্লেখ্য, কবিতা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে উল্লিখিত কবিদের মধ্যে কারও শ্রেষ্ঠ কবিতা, কারও নির্বাচিত কবিতা, কোনো কোনো কবির কবিতাসমগ্রকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, জীবদ্দশায় যেসব কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কিংবা 'নির্বাচিত কবিতা' নামে আলাদা কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁদের কবিতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেগুলোই হয়েছে আমাদের অবলম্বন। আর যেসব কবির 'নির্বাচিত' বা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে 'কবিতাসমগ্র', তাঁদের সব কবিতাই আমরা বিশ্লেষণের আওতায় নিয়েছি। আমাদের আলোচনার বাইরে রয়ে গেছেন অনেক খ্যাতিমান কবি। আপাতভাবে মনে হতে পারে, তাঁদের অনেককে আলোচনাভুক্ত করা হলে এ-গবেষণাকর্ম আরও সমৃদ্ধ হতো। কিন্তু কালপরিসর ও কলেবরের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমরা দশক অনুযায়ী খ্যাতিমান প্রায় সব কবির কবিতা পাঠের পর প্রাসঙ্গিক কবিদেরই এ-গবেষণার আওতায় এনেছি। যাঁদের কবিতা এ-গবেষণার বাইরে রয়ে গেল বলে মনে হতে পারে, তাঁদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়নি বলেই সেসব আমাদের বিচেনাভুক্ত হয়নি। বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ নিয়ে এ-অভিসন্দর্ভের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ বাংলাদেশের সাহিত্য-গবেষণায় মৌলিক সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত : বাংলা কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন

প্রাচীনকালে পৃথিবীর সব বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। একসময় মানুষের জীবন-জীবিকা থেকে শুরু করে বসতি, কর্মসংস্থান, শ্রমজীবন সবই গড়ে ওঠে নদীকে কেন্দ্র করে। এই ধরনের পরিবেশ যেমন বসতি গড়ার পক্ষে অনুকূল, তেমনি জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্যও সুবিধাজনক। নদী-তীরবর্তী এলাকায় সেচের সুবিধা যুগ যুগ ধরে মানুষকে কৃষিকাজ, বিশেষ করে চাষবাস, পশুপালন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি প্রকৃতি ও আবহাওয়া-নির্ভর শ্রমসাধ্য কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। নদীর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত মাছ মানুষের খাদ্যতালিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর পাশাপাশি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নদীবন্দর কিংবা জলপথ ছিল মানুষের যোগাযোগ বা যাতায়াতের অপরিহার্য অবলম্বন। নদীকে কেন্দ্র করে সভ্যতাগুলো প্রতিষ্ঠার শুরুতে ফসল উৎপাদন তথা কৃষিই ছিল মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সাধারণ এই প্রবণতা বিরাজমান।[১] নদীকে কেন্দ্র করে কেবল গ্রামীণ সভ্যতা নয়, নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার দৃষ্টান্তও প্রচুর। অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমবিকাশ কিংবা আধুনিক সময়ে শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমের বিস্তার—সবই ঘটেছে নদী-তীরবর্তী এলাকাকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, সিন্ধুসভ্যতা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের প্রধান নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে।

বাংলাদেশ নামক যে ভূখণ্ডটি ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে, তার অবস্থানও ব্যতিক্রম নয়। কেননা, 'অখণ্ড বাঙলা গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা আর তারই শতশত শাখা-নদীর অবদান। সভ্যতা, সংস্কৃতি, জনপদ, রাষ্ট্রকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ—সবকিছুই গড়ে উঠেছে এ-সকল নদনদীর তীরে রাঢ়-পুণ্ড্র আর বঙ্গজনপদের মানসিক, রাষ্ট্রিক ও ইতিহাস প্রবাহের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য এবং পরিণতির প্রশ্নে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা অমোঘ ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সক্রিয়।' (সূত্র : মনসুর মুসা; ২০১৩ : ২২) তাই এ দেশেরও সব বড় শহরই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই জাতিগত স্বকীয়তা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, জীবনযাপনের ধরন, বহুবিধ পেশাজীবনের চারিত্র্য নির্ধারিত হয়েছে নদী-তীরবর্তী এসব শহরকে ঘিরে। তা ছাড়া 'ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর অংশ এবং উহা পৃথিবীর বৃহত্তর বদ্বীপগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বাংলাদেশ প্রচুর পলিমাটিতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের উত্তর, উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে যথাক্রমে ওরাও, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, মোরাং প্রভৃতি উপজাতির[২] বাস। বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকায় মগজাতীয় লোকেরা বাস করে। বাংলাদেশের ব্যাপক সমতল অঞ্চলজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালি জনগোষ্ঠীর

লোকজন।’ (রংগলাল; ১৯৮৫: ১৬) বাস্তব কারণেই আদিকাল থেকে ওইসব অঞ্চলের বাসস্থান গড়ে তোলা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, শ্রমজীবন এবং তৎকালীন শিল্প-সাহিত্যের নিদর্শনেও বিভিন্ন পেশাজীবনের ইঙ্গিত ও পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ধারা এবং আধুনিক সাহিত্যে মানুষের বৃত্তি তথা শ্রমিকশ্রেণির পেশা এবং তাদের জীবনের নানা সংক্ষিপ্ত অনুষঙ্গ মাত্রাগত তারতম্যে ভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাব্য-উপাদানে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পেশাজীবনের উপস্থিতি পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন পেশাজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে জানা যায় :

> রাজা, রাজবংশ ও রাজধানীর উত্থানপতন যতই হোক না কেন বাঙলার সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন সে-অনুপাতে তেমন একটা হয়নি। কার্ল মার্কস এশিয়াটিক সমাজের যুগব্যাপী নিশ্চলতার কথা বলেছেন। সেই কথা বাংলার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। একই পদ্ধতির চাষাবাদ, একই রকম কৃষি-যন্ত্রপাতি, একই পদ্ধতির মাছ-ধরার ব্যবস্থা, একই ধরনের পেশাভিত্তিক গ্রামীণ বন্দোবস্ত দীর্ঘদিন চলে আসছে। বাঙালি কৃষকের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঋতুচক্রে বাঁধা। প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য এখানে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। অপচয় ও কৃচ্ছ্রতা কোনোটাই চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। হাজার বছর আগে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা যখন পদ রচনা করেছেন, তখন ‘হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী’ বলে দুঃখ-জাগানিয়া শ্লোক তৈরি করেছেন। (মনসুর মুসা; ২০১৩: ১১)

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যার কোনো পদে পেশা হিসেবে কৃষিজীবীর সরাসরি উল্লেখ না পাওয়া গেলেও কৃষিজাত খাবার হিসেবে ভাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটিতে ভাতের উপস্থিতি কৃষিজীবনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। আমরা জানি, যাদের কায়িক শ্রমে সচল থাকে সমাজ-রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা, উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত সেই জনগোষ্ঠীকেই বলা হয় শ্রমিক। কিন্তু চর্যাপদে সরাসরি কৃষিব্যবস্থা বা কৃষকদের সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ না থাকাটা একধরনের প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায়। তবে ধরে নেওয়া যায়, ভাতের উপস্থিতি মানেই ধান-চাল-কৃষি-চাষবাস-কৃষক ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ, গুপ্তযুগ (স্থিতিকাল আনু. খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ থেকে চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ), পালযুগ (আনু. ৭৫৬-১১৬২), সেনযুগে (আনু. ১০৯৭-১২২৫) বাংলায় কৃষিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন শাসনকাঠামো গড়ে উঠেছিল। শাসন পরিচালনার কেন্দ্রীয় ভাবনায় থাকত কৃষি। আর চাষাবাদ হতো ধান, যব, আখ প্রভৃতি শস্যের। শুধু তা-ই নয়, এ-সময় গ্রামসমাজে মধ্যস্বত্বভোগীর বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। তারা ক্রমশ আঞ্চলিক শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। (জুলফিকার; ২০০৪: ১৬) তবে কৃষি বা কৃষকের প্রসঙ্গ সরাসরি

না এলেও চর্যাপদে অন্যান্য শ্রমনির্ভর জাতিগোষ্ঠী বা পেশাজীবীর উপস্থিতি রয়েছে। চর্যাপদে কৃষিকাজ বা কৃষকশ্রেণির উল্লেখ না থাকার বিষয়ে ইতিহাসবিদ গোপাল হালদার সচেতন ছিলেন। শুধু চর্যাপদ নয়, সমাজে কৃষি ও কৃষকের সরাসরি প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগব্যাপী বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের বেশির ভাগ নিদর্শনে কৃষি বা কৃষক প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়নি। গোপাল হালদার লিখেছেন :

> বাঙ্‌লার যে সামাজিক অবস্থায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য উদ্ভুত (উদ্ভূত) হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অবস্থার প্রামাণিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না।...ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙ্‌লা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ; আর কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষি-পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক; এখনো প্রায় তা-ই রয়েছে।...অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যত্রের মতো বাঙ্‌লায়ও এই উৎপাদনের প্রধান অংশ যেত গ্রামের উচ্চবর্গের সেবায় (যেমন, রাজপুরুষ, রাজসেবক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, ও জৈন গুরু, করণ প্রভৃতি), সামন্ত গোষ্ঠীর নানা স্তরের ভূস্বামীদের হাতে। সাধারণ ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষক অবশ্যই দেশে সংখ্যায় বেশি ছিল। কিন্তু শূদ্রপর্যায়ের ভূমিহীন সেবক-জাতীয় কৃষিজীবী ও কারুজীবীরা (হালিক, জালিক, ডোম, বাগ্‌দী, শবর প্রভৃতি; তারা কেউ কেউ ভূমিজ অন্ত্যজ,—প্রাচীনতম উপজাতির বংশধর) ছিল অনাচরণীয়, গ্রামান্তেবাসী (এখানকার মতোই) এবং নিতান্ত হীনাবস্থ;—অবশ্য তারাই ছিল উৎপাদনের প্রধান বাহন। (গোপাল; ১৪০০: ১১)

আজও বাংলাদেশের মানুষের বেশির ভাগই পল্লিবাসী। এই পল্লিসমাজ যে শ্রম ও বৃত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান অবলম্বন কৃষি। কৃষিভিত্তিক জীবন, কৃষিশ্রম, চাষবাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের আধুনিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়। হয়তো এই কারণেই নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যে সেই নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'প্রাচীন বাঙলার কৃষি যে ধানোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে ক্ষেত্রকরাণ্, কর্ষকান্, কৃষকান্ ইত্যাদি কথার তো বারবার উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী...মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান বিক্রয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞাপিত করিতে হইত।' (নীহাররঞ্জন; ১৪০২: ১৩৫-১৩৬)

সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, নগরায়ণ আধুনিক যুগে বিকশিত সমাজকাঠামোর স্বরূপকে ধারণ করে। মধ্যযুগ বা প্রাচীনযুগে আমাদের এই অঞ্চলে খুব বেশি নগরায়ণের সুযোগ ঘটেনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূ-গঠন বৈশিষ্ট্য, ঘন ঘন রাজধানীর পরিবর্তন ইত্যাদি এবং সামন্ত সমাজের অচলায়তন-

বৈশিষ্ট্যও এই নগরায়ণ বিস্তৃত না-হওয়ার হয়তো অন্যতম কারণ। তবে ইরফান হাবিব রচিত *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সমীক্ষা* গ্রন্থে বাংলার বাইরে নগর-সভ্যতার বিকাশের চিত্র পাওয়া যায়। এ-গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শহরের নামও উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখাতে পাওয়া যায় অন্য রকম যুক্তি : 'আদিম সমাজ হইতে অতি সহজেই কেবলমাত্র কৃষিভূমির আকর্ষণেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এখানে নানা জাতি সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে, তারপর প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া পরস্পরের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়া ক্রমে একটি সমাজ-জীবন গড়িয়াছে, তাহার ভিত্তি করিয়াই বাংলার পল্লীসাহিত্য রচনার প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছে।' (আশুতোষ; ১৯৯৮: ৩) চর্যাপদে কৃষি ও কৃষকের অনুপস্থিতি নিয়ে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য ইরফান হাবিবের বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকাংশে সাযুজ্যপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলেছেন :

> পাণিনির সময় থেকে বাংলাদেশে নগরের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত; টলেমির সময়ে তাম্রলিপ্তি এবং য়ুয়ান চোয়াঙের সময়ে মহাস্থান সমৃদ্ধ নগর ছিল। সুতরাং চর্যাগীতিতে গ্রামের অনুল্লেখের কারণ অন্যত্র নিহিত। আমাদের বিশ্বাস, চর্যাগীতিতে গ্রামজীবনের কোনো পরিচয় নেই এবং সেজন্যই এখানে গ্রামের নাম নেওয়া হয়নি। এই ধারণা শুধু অনুমাননির্ভর নয়। লক্ষ করা যাবে যে, চর্যাগানে কৃষির উল্লেখ প্রায় নেই বললে চলে।...টিলায় বসবাসকারী ব্যাধদের জীবনচিত্র বাদ দিলে চর্যাগীতির সবটাই নগরজীবনের চিত্র। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ডোমদের বাস নগরের বাইরে হলেও নগর-সন্নিহিত স্থানেই। (আনিসুজ্জামান; ২০০৯: ২৬-২৭)

এ অধ্যায়ে আমাদের অন্বিষ্ট প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বা কবিতাবলিতে বিধৃত শ্রম-পরিচয় এবং কোন শ্রেণির মানুষ তাতে সম্পৃক্ত ছিলেন, তা অনুসন্ধান করা। চর্যাপদ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সাধন-সংগীত হিসেবে রচিত হলেও তা মূলত কবিতা; আর যেহেতু এগুলো গাওয়ার জন্যও রচিত, তাই এগুলোকে কাব্যগীতিও বলা হয়। চর্যাকারদের রচিত সেসব কবিতা বা সাধন-গীতির মধ্যে ওই সময়ের (আনু. ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রমজীবী মানুষের কথা বিধৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, আমাদের এই অঞ্চলের সভ্যতা গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের শ্রমে-ঘামে। পেশায় ভিন্নতা থাকলেও কায়িক শ্রমই ছিল সেই সময়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান এবং একমাত্র পেশা। অবশ্য সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কাজের সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততা ঘটে কিংবা মানুষই প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন কাজ বা পেশার উদ্ভাবন ঘটায়। অর্থাৎ মানুষের চাহিদার বিপরীতে জীবনযাপনের পদ্ধতি যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি পেশা বা বৃত্তিরও পরিবর্তন ঘটে শ্রমজীবী মানুষের।

চর্যাপদের সমাজচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁত তৈরি, চাঙারি বোনা, মাছ আহরণ, নৌকা চালানো, মদ চোলাই করা (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৬৭) প্রভৃতি বৃত্তিকে ঘিরে আবর্তিত হতো মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এমনকি ডোমনির (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৮৫) মতো শ্রমজীবী মানুষের কথাও চর্যাকারদের লেখায় এসেছে। ওই সব আদিম পেশায় মানুষের সম্পৃক্তি এখনো রয়েছে। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে নগরকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা নির্বাহের নতুন নতুন উপায়। কারণ, সময়গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে নগরায়ণের। প্রসার ঘটেছে পুঁজিবাদী সভ্যতা-নির্ধারক শিল্প-কারখানার। বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজারে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের উদ্যোক্তারাও শামিল হয়েছেন। ফলে কলকারখানার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ছে। গ্রামের কৃষিজীবী বা দিনমজুরেরা বেশি উপার্জনের আশায় অভিবাসী হচ্ছেন শহরে। বদলে যাচ্ছে তাঁদের পেশা। তাই নগর বা শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত বৈচিত্র্য বেড়েছে; পেশাভেদে তাঁদের কাজের ধরনও বদলে গেছে।

চর্যাপদে দেখা যায়, চর্যাগুলো যে সময়ে রচিত হয়েছে, সে সময়ে এই অঞ্চলের সাধারণ বা খেটেখাওয়া অধিবাসীদের সংযুক্তি ছিল গুটিকয়েক পেশার সঙ্গে। চর্যাকারগণ যে ধর্মচর্চার এবং তাঁদের সাধনার অংশ হিসেবে চর্যাগুলো রচনা করেছেন, তাতে বস্তুত স্বাভাবিক লোকজীবনের আচারের মধ্যে ধর্মমতেরই মূল কথা লুকিয়ে আছে। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্ররূপে চর্যাকর্তাগণ ধর্মের কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন। তবু এরই মাঝে সমাজজীবনের কিছু চিহ্ন বা সংকেত পাওয়া যায়। পদকর্তারা সেই সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনের যেসব চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁদের সহজাত প্রকাশক্ষমতার মাধ্যমে, সেগুলোতে সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের সেই প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন পেশাজীবনের কথা উঠে আসে; চিত্রিত হয় সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার বাস্তবতা। এমনকি স্পষ্ট হয় তাদের শ্রম বা কাজের ধরন, জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা; তাদের প্রার্থনা, ক্রিয়াকর্ম, পারিবারিক জীবন কিংবা বস্ত্র, অলংকারাদির ব্যবহারসহ নিত্যজীবনে ব্যবহৃত বাসনপত্র প্রভৃতি উপকরণের আদ্যোপান্ত। বেশ কয়েকটি চর্যায় ডোম-ডোমনি, শবর-শবরী, কাপালিক প্রভৃতি পেশাজীবীর কথা বলা হয়েছে। তাদের মতো সমাজের নিচু শ্রেণির পেশাজীবীর সঙ্গে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের পার্থক্য, তাদের বাসস্থান যে নগর থেকে দূরবর্তী এলাকায় প্রভৃতি বিষয় উল্লেখের পাশাপাশি এই সমাজসত্যও উল্লেখিত হয়েছে যে, 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ।।' (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৮৫) অর্থাৎ ডোমজাতীয় পেশাজীবী নারী অস্পৃশ্য, তাই নগরের বাইরে তাদের

বসবাস। ডোম্বি আসা-যাওয়া করত নৌকায় এবং বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চাঙাড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের 'রূপমুগ্ধ কামান্ধ' ব্রাহ্মণ তার কুঁড়েঘরের পাশে ঘোরাঘুরি করে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলাদেশের নানা স্থানে এখনো এই জাতীয় যাযাবর মানুষের দেখা মেলে। তারা নৌকাতেই সর্বত্র যাতায়াত করে। নৌকাকেই তারা ঘরবাড়ি হিসেবে ব্যবহার করে; কয়েক দিনের জন্য কোনো স্থানে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে; রাস্তা-ঘাটে অবস্থান করে দৈনন্দিন ব্যবহার্য নানা ধরনের বাঁশের তৈজসপত্র তৈরি করে এবং লোকালয়ে তা বিক্রি করে। সাধারণ মানুষ অনেক সময় এইসব শৌখিন জিনিস ক্রয় করে এবং ব্যবহারও করে। এই জনগোষ্ঠীর নারীরা অনেক সময় নৃত্য-গীতপরায়ণও হয় এবং তা দিয়েই লোকের মন ভোলায়। চর্যাকারেরা সমাজের ব্রাহ্মণ বা উঁচু শ্রেণির অবস্থানও চিহ্নিত করেছেন। তাতে দেখা যায়, উঁচু শ্রেণির বাসিন্দারা সব সময়ই সমাজের নিম্ন শ্রেণিকে অস্পৃশ্য মনে করতেন। তাদের তৈরি কোনো খাবার তাঁরা গ্রহণ করতেন না। তবে এও দেখা যায়:

> বিপদে পড়লে শূদ্রের হাতের তৈলপক্ব ভর্জিত দ্রব্য, পায়েস ইত্যাদি খেতে ব্রাহ্মণদের নিষেধ ছিল না—সামান্য মনস্তাপ প্রকাশ করলেই দোষ কেটে যেত। তেমনি শূদ্রের হাতে ব্রাহ্মণ বিপদের সময় জল পান করলেও খুব একটা অপরাধের চোখে দেখা হতো না। শহরের প্রান্তে টিলায় ঘর বেঁধে এই অন্ত্যজরা বাস করত। অন্ত্যজদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য। তাদের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণদের পাপ হতো। স্পর্শ বিচারে নানা বিধি-নিষেধ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে উদ্ধত উগ্রতায় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। (অতীন্দ্র; ১৩৬৭: ৩০)

অথচ প্রয়োজনে ডোম্বির উদ্দেশে বলা হয়, 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মই সাঙ্গ।/ নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।' (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৮৫) অর্থাৎ ওগো ডোম্বি, তোমাকে সাঙ্গা (বিয়ে) করব। আমি এক কানু-কাপালিক এবং উলঙ্গ যোগী। (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৮৭) ডোমদের প্রধান পেশা ছিল চাঙাড়ি বোনা, নৌকা চালানো। আর তাদের প্রধান খাবার ছিল ভাত। অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকে ভাতই এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া তৎকালীন সমাজের একটা বিশেষ চিত্রও উঠে আসে, যা বতর্মান বাস্তবতার সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ :

> টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
> হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
> ...   .
> জো সো বুধী সোহি নিবুধী

জো সো চোর সোহি সাধী।।

(হাই ও পাশা; ১৪০২: ১৪২)

চর্যাকার শবরপা 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালী।/ মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী' (হাই ও পাশা; ১৪০২: ১২৮) বলে এক শ্রেণির পেশাজীবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। শবর শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যাধ, যাদের পেশা ছিল পশু শিকার করা। তারা মূলত উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিল। যাযাবর জীবন ছিল তাদের। আদিকালে বেশির ভাগ সময় শিকারই ছিল তাদের প্রধান পেশা। অনেকের মতে, বর্তমানে আমাদের সমাজের যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীটি বেদে বা বাদিয়া বলে পরিচিত, যাদের প্রধান পেশা সাপ ধরা, তাবিজ-কবজ বিক্রি করা, পাখি শিকার করা বা সাপের খেলা দেখিয়ে উপার্জন করা, তারাই সম্ভবত চর্যাপদের শবর-শবরী। *বাংলাপিডিয়ার* বৈদ্যুতিন সংস্করণে 'শবর' ভুক্তিতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি শবররা উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা যাযাবর ও শিকারী ছিল। পরে তারা চা শ্রমিক হিসাবে মৌলভীবাজার জেলার হরিণছড়া, রাজঘাট ও নন্দরাণী এলাকায় বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে এ দেশে শবরদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। (bn.banglapeadia.org)

চর্যাকাররা সেই সময়ের সমাজের যেসব পেশাজীবীর প্রসঙ্গ তাঁদের সৃষ্ট পদগুলোতে উপস্থাপন করেছেন, তাতে তাদের সামাজিক অবস্থান বা তাদের পেশাজীবন কেমন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন কবি বা লেখক বা সাধক যে সমাজকে ধারণ করেন কিংবা তিনি যে সমাজের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই সময় ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। তবে শ্রেণিবিভাজিত এই সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এ কথা সত্য যে:

> সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ পর্যায়ের লোক কিংবা বর্ণাশ্রমের মধ্যেই নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি। তা যদি না হবে, তবে ভিক্ষু-জীবনেও তাঁরা সংসারের সাধারণ জীবনের অতি প্রত্যক্ষ ও পরিচিত অভিজ্ঞতাকেই কাব্যে অবলম্বন করবেন কেন। জুয়াখেলা, শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, তুলোধোনা, চাঙারী বোনা, দেশজ মদ্য পান করে মাতাল হওয়া, বনে বনে আহার্য সংগ্রহ করা—এসব প্রাত্যহিক কর্ম এবং সেই সব কর্মসঞ্জাত ফলের মাধ্যমে বিবিধ উপমারূপক সংগ্রহ—এসব কি সত্যি সত্যি বোঝায় না এইসব সিদ্ধাচার্যের সামাজিক সত্তা কোন্ কেন্দ্রে স্থাপিত ছিল। এদেরকে অবলম্বন করে তাঁরা তাঁদের জীবন উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক সত্যসন্ধান করেছেন। (অতীন্দ্র; ১৩৬৭: ৩০)

কয়েকটি চর্যায় কিছু বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। একতারা, ডমরু, বাঁশি, মাদল প্রভৃতি যাঁরা বাজাতেন, তাঁদের বাদ্যযন্ত্র-সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নদীমাতৃক এই অঞ্চলে নৌকা পরিচালনা বা নৌপথকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের জীবন আবর্তিত হতো। কেননা, বিভিন্ন পদে সিদ্ধাচার্যরা নৌকা, দাঁড়, কাছি, সেঁউতি, ভেলা, চকা, নৌবন্দর, নৌবাণিজ্য, পারাপার, পাটনী প্রভৃতি নৌ-সংশ্লিষ্ট শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। নৌবন্দর, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে গোপাল হালদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শুধু কৃষক নয়,...বাঙ্লায় বণিক শ্রেণীও উদ্ভূত হচ্ছিল, ছোট ছোট নদী-বন্দরও ছিল। অর্থাৎ কৃষি ও পণ্য উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন নয় কৃষি নেই, বণিকই বাংলা দেশে প্রথম পত্তন স্থাপন করেছে। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজে বণিক-শক্তির বিকাশের সুযোগ আসলে বেশি ছিল না। (গোপাল; ১৪০০: ১২)

এখনো বাংলার নিবিড় গ্রাম ও শহরে, এক শ্রেণির গায়ক-গায়িকা দেখা যায়, যাঁরা লাউয়ের খোলের সঙ্গে তার-তন্ত্রীযোগে একধরনের বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে তার সাহায্যে নাচ-গান করে বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান এবং উপার্জন করে থাকেন। এই ধরনের গায়ক-গায়িকার উপস্থিতি বীণাপাদের চর্যাগীতিতে দেখা যায় :

> সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
> অনহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী ॥
> বাজাই অলো সহি হেরুঅ-বীণা।
> সুন তান্তিধনি বিলাসই রুনা।।
>
> (হরপ্রসাদ; ১৯১৬: ৭২-৭৩)

সার্বিকভাবে চর্যাপদ বিশ্লেষণে সমাজের বর্ণবিন্যাস অনুযায়ী যেসব জনগোষ্ঠীর পরিচয় বেশি পাওয়া যায়, তারা ছিল সেই সময়ের সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী। তাই চর্যাকারগণ এই সব গোষ্ঠীকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই কারণেই চর্যাগীতিগুলোতে তন্তুবায়, শৌণ্ডিক, ডোম, চণ্ডাল, শবর, কাপালিক, কামলি, চণ্ডাল, শুঁড়ি, ব্যাধ, মাঝি, তাঁতি, ধুনুরি, কাঠুরে, জেলে, পতিতা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় ও জীবিকার মানুষের উল্লেখ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৪৯) ফলে বিভিন্ন চর্যাগীতিতে ফুটে ওঠে তাদের কর্মব্যস্ত জীবনচিত্র: জেলেরা মাছ ধরছে, ডোমেরা বাঁশের চাঙারি তৈরি করছে, শুঁড়িরা মদ চোলাই করছে, শিকারীরা দল বেঁধে শিকার করছে। এরা সবাই শ্রমজীবী—নানা বৃত্তিধারী দরিদ্র মানুষ। চর্যাগীতিতে সমাজ থেকে দূরে বসবাসকারী এসব শ্রমজীবী মানুষের জীবনছবি ধরা পড়েছে। এর

বাইরে চর্যায় আমরা দেখতে পাই সাগর-উপকূলসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবি। আর গৃহস্থ জীবনে নিত্যব্যবহার্য উপকরণের মধ্যে খাট, পিঁড়ি, ঘড়া, হাঁড়ি প্রভৃতি এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পাওয়া যায় ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, লাউ, তেঁতুল, পান প্রভৃতি। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাভি ও বলদের কথা উল্লেখ আছে। (আনিসুজ্জামান; ২০০৯: ২৪)

আমাদের অন্বিষ্ট কাব্যে বিধৃত কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনের প্রসঙ্গ অনুসন্ধান। কিন্তু চর্যাপদে কৃষি বা কৃষকজীবনে সরাসরি তেমন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই চর্যাপদ তৎকালীন সমাজের পুরো শ্রমজীবনের চিত্রকে ধারণ করে কি না কিংবা চর্যাকারদের কৃষি বা কৃষিকাজে সম্পৃক্ত মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব ছিল কি না অথবা কৃষিজীবীদের কোনো কারণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কি না, কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবীর কথা বাদ পড়েছে কি না, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কেননা, একটা সমাজের জন্য অপরিহার্য প্রায় সব ধরনের পেশাজীবীর পরিচয় মিললেও, যে-সময়ে কৃষক বা কৃষিজীবী ব্যতিরেকে কোনো সমাজ ছিল অকল্পনীয়, সেই কৃষিজীবনের কোনো প্রসঙ্গ সরাসরি স্থান পায়নি চর্যাপদে। অথচ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের হর্ষবর্ধনের (৫৯০-৬৪৭) সময়েও বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি ধানচাষের তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেই সময়ে জমির মালিকানা যেমন ভিন্ন রকমের ছিল, তেমনি কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায়ের বিভিন্নতাও লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে রোমিলা থাপারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> এই সময়ে যেসব ফসলের চাষ হতো পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও বহুকাল পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে আখ ও গমের চাষ হতো এবং মগধ ও আরও পূর্বদিকের অঞ্চলগুলিতে ধানচাষ হতো। এছাড়া বহু রকমের সবজি ও ফলের উল্লেখও আছে। গ্রামঞ্চলে চাকা ঘুরিয়ে জলসেচের পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ছিল।...জমির কর আদায় হতো বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কখনো সোজা জমি থেকে, কখনো বা উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে। (রোমিলা; ১৯৬০ : ১০৮)

এই সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, কৃষি ও কৃষকের ঐতিহ্যিক অবস্থান। তাই চর্যাপদে অপ্রত্যক্ষভাবে স্থান পাওয়া কৃষকের প্রসঙ্গ—‘হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী’কেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত করতে হয়। কেননা, ভাত, চাল, ধান, কৃষক, কৃষিজীবন একে অপরের পরিপূরক। যেহেতু চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন, তাই বাঙালি সমাজে কৃষিভিত্তিক বৃত্তিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতকেও অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই মেনে নিতে হয়।

তবে কৃষিজীবন না থাকলেও যেসব শ্রমজীবী মানুষের কথা চর্যাকারগণ বলেছেন, তাঁরা কেউ যে শিল্পশ্রমিক ছিলেন তা কিন্তু নয়। আদতে 'পালযুগে ভূমিভিত্তিক সাম্রাজ্য কৃষিনির্ভর ছিল। পাল অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন গুরুত্ব পায়নি। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্ভবত দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ কিংবা বড়জোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে প্রসারিত ছিল।' (bn.banglapedia.org) অবশ্য তখন শিল্প-কারখানার অস্তিত্ব ছিল না; প্রধানত ছিল কুটিরভিত্তিক পণ্য উৎপাদন। তা সত্ত্বেও সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের শ্রমজীবনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে চর্যাগুলোতে। চর্যায় স্থান পাওয়া পেশাগুলোর মধ্যে তাঁত বোনা ছিল অন্যতম প্রধান পেশা। মূলত ডোমদের কাজ ছিল তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি তৈরি করা। তারা খেয়া পারাপারের কাজও করত। চর্যা ২৪-এ আমরা দেখতে পাই ডোম-ডোমনীদের তাঁতবস্ত্র বিক্রি করতে। তন্তুবায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ২৪ ও ২৫ সংখ্যক চর্যায়। এ ছাড়া ধুনুরি ব্যাধ ও কাঠুরিয়ার কথা বলা হয়েছে ২৩, ২৬, ২৮, ৪৫ সংখ্যক চর্যায়। ১৮ ও ২৮ সংখ্যক চর্যায় দেখা যায় শুঁড়িদের মদ চোলাই করতে। নৌকা ও মাঝির দেখা পাওয়া যায় ৮, ১৫, ৩৮ সংখ্যক পদে। এসব পেশাজীবীর ওপরই নির্ভর করত চর্যায় বিধৃত সমাজের অর্থনৈতিক তৎপরতা। তাই বলা যায়, সমাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক মানও অনুন্নত ছিল। চর্যাগীতিতে চিত্রিত অন্ত্যজ গোষ্ঠীর জীবিকা ও বৃত্তিগুলো সেই সময়ের সাধারণ মানুষ এবং চর্যাকারদের আর্থিক দৈন্যকেই ইঙ্গিত করে। ৪৯ সংখ্যক চর্যায় আছে 'বজ্র নৌকা দেওয়া হ'ল পদ্মার খালে, অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুণ্ঠিত হ'ল।' আবার ৩৩ ও ৩৮ সংখ্যক চর্যাতেও চোর-ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৪ সংখ্যক চর্যায় চোরের ঘরে তালা-চাবি লাগানো প্রসঙ্গ এসেছে। (হাই ও পাশা; ১৪০২: ৫১-৫২)

দুই

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পর প্রাচীনত্বের দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সময়ের বিস্তৃতি বা দূরত্বের দিক থেকে চর্যাপদ রচনার সময়সীমার শেষ থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য রচনার সম্ভাব্য সময়ের পার্থক্য দেড় শ থেকে আড়াই শ বছর (১৩৫০-১৪৫০ খ্রি.)। কিন্তু তারও আগে খনার বচনের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। খনা ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে নিপুণা ও বচন রচয়িতা বিদুষী নারী। খনার প্রকৃত নাম লীলাবতী বলে জানা যায়। তাঁকে নিয়ে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি।[৪] তাঁর আবির্ভাব অনুমান করা হয় ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে[৫] (সূত্র: সিরাজুল ইসলাম; বাংলাপিডিয়া; ২০০৩: ২১) তবে অনুমান নয়, খনা ও তাঁর বচনের ভাষা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন:

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদলবদল হইয়া বর্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে তাহা মধ্যযুগীয়। তবু এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ...ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়। (নীহাররঞ্জন; ১৪০২: ১৩৭)

খনার অস্তিত্ব কোন কালে, কোনো কালে আদৌ তাঁর অস্তিত্ব ছিল কি না, এসব বিবেচনায় বড় হয়ে গেছে ইতিহাসের সত্যের চেয়ে কাব্যের সত্য। কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কাব্য-পঙ্‌ক্তি 'কবি তব মনোভূমি/ রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' যদিও পণ্ডিতেরা কেউ খনার বচনকে জোরোলোভাবে সাহিত্যপদবাচ্য বা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দেননি, কিন্তু বচনগুলোতে কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে, চাষবাস ও ফসলাদি সম্পর্কে, জলবায়ু, আবহাওয়া, এমনকি যাপিত জীবন, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও শ্রমজীবন সম্পর্কে যেসব উক্তি পাওয়া যায়, তা আজও বাঙালি সমাজের গ্রামীণ জনসাধারণ অনুসরণ করে আসছে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে। (পূরবী; ২০১৫: ১-২)

তবে সমাজগতির ধারাবাহিকতায় চর্যাপদে বিধৃত বাঙালি সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের চরিত্রগুলোর পেশাগত মিল বা অমিল দুটোই লক্ষ করা যায়। তবু চর্যাপদের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য বিষয় ও অবয়বে। চর্যাপদ রচিত হয়েছিল কয়েকজন চর্যাকারের সাধনগীতি হিসেবে আর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* রচনা করেছেন একজন কবি। অবশ্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে পুরাণের কাহিনীর মিল খোঁজেন অনেক সমালোচক। কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের মতে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর কাহিনী যতটা না পৌরাণিক, তার চেয়ে বেশি লৌকিক, তত বেশি সামাজিক। আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯) বলেছেন, 'এটি লোকগীতি-নাট্য-ভিত্তিক রচনা—বড় জোর রতি সম্ভোগ কাব্য। কথকতাভিত্তিক কাঠামো রয়েছে বলেই এতে মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই বিবৃত।' (শরীফ; ২০১৮: ১৯৯) এ-বিষয়ে নাট্যকার সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) ভাষ্য এ রকম, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা নাট্য পরিবেশনারীতির বিচারে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সংলাপাত্মক পদের পরিসর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর সর্বত্রই বিস্তৃত আকারে লভ্য। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ চরিত্র ও ঘটনাগত নাট্যকৌতূহল সংলাপের যে আবর্তনে রচিত হয়েছে তা এ কালের পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে। (সেলিম; ১৯৯৬: ৬৩-৬৫)

তবে সাদা চোখে দেখলে বোঝা যায়, মূলত রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এর কাহিনী এগিয়ে গেছে; উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজচিত্র এবং কয়েক ধরনের শ্রমজীবী মানুষের পরিচয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের চরিত্রগুলো মথুরা-বৃন্দাবন-গোকুল অঞ্চলের, যাদের বসবাস মূলত নগর থেকে দূরবর্তী এলাকায়। স্বভাবতই তা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে সমাজজীবন বিধৃত হয়েছে, তার দুটি ধারা রয়েছে। এক. পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা; দুই. লোকায়ত সংস্কৃতির সমাজসংস্কার—যেখানে গোপপল্লি প্রধান হয়ে উঠলেও শ্রমনির্ভর অন্যান্য গোষ্ঠীরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। (নরেশচন্দ্র; ১৯৯৩: ২৫৫)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর শ্রমজীবী হিসেবে এ-কাব্যে কুমার, তেলী, নাপিত, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ, বণিক, ঐন্দ্রজালিক, সাপুড়ে, মাঝি, বাগদি, ব্যাধ, কাঠুরিয়া, যোগিনী, ডোম প্রভৃতি গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। এ-কাব্যে, পাওয়া যায় কিছু কুসংস্কারের দৃষ্টান্তও। যেমন: 'কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা। হাঁছী জিঠী তাত কোহো নাহিঁ দিল রাধা।।' (সূত্র: অমিত্রসূদন; ১৯৯৬: ২৪২) এর বাইরে পেশাভিত্তিক বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে কাব্যে উঠে আসা অস্পৃশ্যতাবোধের চিত্রও লক্ষণীয়; যা চর্যাপদে ছিল নিচুস্তরের প্রতি উঁচুস্তরের। এগুলো হয়তো তৎকালীন সমাজের লোকবিশ্বাস। যেখানে দুটি নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের পেশা অন্য বর্ণের দ্বারা উপেক্ষিত বা নিচু বলে ভাবা হয়েছে। যেমন : তেলীর তেল বিক্রি করার জন্যে হাঁক শোনা রাধার কাছে যাত্রাকালের অশুভ সংকেত বলে মনে হয়েছে। অথচ রাধা ছিলেন একজন গোপবধূ; হাটে-গঞ্জে দুগ্ধজাত পসরার বিক্রয়িত্রী, নিতান্তই এক শ্রমজীবী।[৬] অনভিজাত ও শ্রমজীবী হলেও অন্য পেশাজীবীর প্রতি অবজ্ঞার এই দৃষ্টিভঙ্গি কয়েক শত বছর আগের এ-কাব্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্রে যেমন আমরা পাই, তেমনি এখনো তা সমাজে বিরাজমান।

তবে বিস্ময়কর হলেও সত্যি, চর্যাপদের শ্রমজীবী মানুষের কাজের ধরনের মধ্যে যেমন সরাসরি কৃষিজীবী কাউকে পাওয়া যায় না, তেমনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যেও কৃষিজীবী কাউকে সরাসরি পাওয়া যায় না। তবে রাধার দুধ-দই বিক্রি করা আর কৃষ্ণকে রাখালরূপে উপস্থাপন এবং তার গরু চরানোর মধ্যে কৃষকজীবনের সামান্য সংকেত পাওয়া যায়। তবে ইতিহাস ভিন্নকথা বলে :

> সুলতানী আমলের প্রথম যুগে অভিবাসন ও দাসত্ব শহরাঞ্চলের শিল্পের বিকাশ ঘটালেও শহুরে জনগণ যার ওপর প্রধানত ভিত্তি করত তা আসত গ্রামাঞ্চল থেকে সুলতানী থেকে সুলতানী শাসক শ্রেণীকর্তৃক আহরিত রাজস্বের বৃদ্ধি থেকে।...এই আদায়ের মুখ্য রূপটি ছিল খরাজ,

যা একধরনের ভূমিকর হিসাবে কৃষকের জীবনধারণে ন্যূনতম চাহিদার অতিরিক্ত উদ্বৃত্তের সিংহভাগের উপর রাজার দাবী সূচিত করত। (ইরফান; ২০০৪: ৮)

তিন

মধ্যযুগ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কাল। ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যের পণ্ডিতেরা ১২০১ খ্রিষ্টাব্দকে মধ্যযুগের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দকে এর শেষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। এর আগে, প্রাচীন যুগে দীর্ঘ সময় ধরে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ অঞ্চল শাসন করলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে শাসক হিসেবে আবির্ভাব ঘটে মুসলমানদের। কেবল ধর্মীয় কারণে নয়, শাসনকাঠামো ও শাসনপদ্ধতির পার্থক্যের কারণেও এ সময় সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে সাধারণ মানুষদের অনেকেই বংশপরম্পরায় নিজেদের পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে শ্রমজীবন কাটালেও কেউ কেউ নতুন নতুন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় উপার্জনের তাগিদে। মধ্যযুগের আদি নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের সমসাময়িক কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীর (আনু. ১৪-১৫ শতক) রচিত *ইউসুফ জোলেখা*। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) আমলে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে এটি রচিত। *ইউসুফ-জোলেখা*কে নিয়ে কোরানের কাহিনী অবলম্বনে ফারসি, এমনকি বাংলাতেও বিভিন্ন সময়ে কাব্য রচিত হয়েছে। সগীরের কাব্যেও মূল আখ্যান অভিন্ন হলেও এখানে বড় হয়ে উঠেছে মানবপ্রেম। উল্লেখ্য, 'কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীর পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।' (সূত্র: এনামুল; ২০১৩: ৭২) আর সে-কারণেই কাব্যে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের সময় মিসর-রাজ শস্যের ভাণ্ডার খুলে দিলে অন্যান্য শস্যের নাম না এলেও ধানের প্রসঙ্গ আসে। এমনকি ইউসুফ তাঁর আপন ভাইকে কাছে রাখতে যে চাতুর্যের আশ্রয় নেন, সে-বিষয়ে আগে থেকে তাকে বলে রাখেন :

ভাই সব সঙ্গে জাইতে তোহ্মাক ন দিমু।
সঙ্কেত সন্ধান করি তোহ্মাক রাখিমু।।
কনকের এক কাটা ধান্য মাপি দিতে।
তোহ্মার গুণির মাঝে রাখিব গোপতে।।

(সগীর; ২০১৩: ২৭২)

গ্রন্থটি যেহেতু রোমান্সমূলক প্রণয়কাব্য, তাই হয়তো কবি কোনো নির্দিষ্ট শ্রমজীবনকে তুলে ধরতে চাননি। *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যে 'বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া'ই মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধানের প্রসঙ্গ এসেছে। এই সূত্রেই বলা যায়, কৃষকের প্রসঙ্গ সরাসরি না এলেও বাংলার

কৃষিজাত পণ্য ধানের উপস্থিতি কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমজীবনের ইঙ্গিত দেয়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *ইউসুফ-জোলেখা*র অব্যবহিত পর সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্য ধারার নানা আখ্যানকাব্যসমূহ। সমগ্র মধ্যযুগে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে।

যুগে যুগে শ্রমজীবী মানুষের পেশার পরিবর্তন ঘটে, সাধারণ মানুষের উপার্জনের নতুন উপায় সংযোজিত হয়। মধ্যযুগে কেমন ছিল মানুষের শ্রমজীবন, সে-সম্পর্কে পূর্বাপর ধারণা পেতে এবং সেই সময়ের সমাজ ও সমাজের মানুষের জীবন ও পেশা সম্পর্কে জানতে মধ্যযুগে অব্যাহতভাবে চর্চিত মঙ্গলকাব্যের শরণ নেওয়ার বিকল্প নেই। সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, এ সময়ও চর্যাপদে বিধৃত ধর্মীয়ভাবে নির্ধারিত শ্রেণিবৈষম্য বা উঁচু-নিচুর পার্থক্য কিংবা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে চিত্রিত বর্ণ বা পেশাগত পার্থক্যের কারণে সমগোত্রীয় মানুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের প্রবণতা আগের মতোই রয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক, কৃষি এ-সময় মানুষের অন্যতম পেশা হিসেবে গণ্য হলেও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনমান ভালো ছিল না। কারণ এ সময় ভূমিকর, বাসস্থান, কৃষিপণ্য, এমনকি গবাদি পশুর ওপরও কর চাপিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি। এমন চাপে পড়ে কৃষকেরা কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আর ব্যবসায়ীরা তা শহরে সরবরাহ করেছেন। (ইরফান; ২০০৪: ৯) এর বিকল্প হিসেবে শিল্প-কারাখানায় যুক্ত থেকে মানুষের শ্রম বিনিয়োগ করার কোনো সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

বরং ধর্মীয় অবস্থান বা ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক স্তর অনুযায়ী পেশাগত পার্থক্য এ সময় প্রকট ছিল। যে-কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হতো পেশার মাধ্যমেই। যারা ব্রাহ্মণ, তাদের কাজের ধরনের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাজ ছিল আলাদা। অর্থাৎ বর্ণ যেমন পেশা নির্ধারণ করে দিত, তেমনি পেশা দিয়েও সেই সময় মানুষের বর্ণ বা 'জাত' চেনা যেত। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই শ্রেণীকরণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওই সময়ের মানুষের পেশা-পরিচয়। (ভীষ্মদেব; ১৯৯১: ১৯৫)

একজন মানুষ যে স্তরেরই হোক, তিনি কোনো-না-কোনো কাজকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যেই যেহেতু মধ্যযুগের সমাজ ও মানুষের অবস্থার কথা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে, তাই মঙ্গলকাব্য নিবিড়ভাবে পাঠ করলে দেখা যায়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার মধ্যে বিজয় গুপ্তের (আনু. পঞ্চদশ শতাব্দী) *মনসামঙ্গল* (১৪৯৪ খ্রি.) ধারার কাব্য *পদ্মাপুরাণ*-এ উল্লেখ রয়েছে সমাজের উচ্চ-নিম্ন বর্ণের নানা

জাতির মানুষের পরিচয়। কৃষকের উপস্থিতি ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ সময় জমিদার শ্রেণি যেমন ছিল, তেমনি ছিল কৃষক শ্রেণি। তাই 'বাংলা দেশে অপরের জমিতে চাষ করে এমন কৃষকের কথা ফারসি দলিলেও পাওয়া যায়। অনেকে গ্রামের সম্পন্ন চাষীদের দ্বারা নিয়োজিত হতো। তার প্রমাণ আছে পদ্মা-পুরাণ-এ। সেখানে চাঁদ সদাগর মজুরের কাজ করেছিল এবং নিয়োগকর্তা কিষান লাগিয়ে চাষ করাত।' (গৌতম; ১৪২০: ৪৭) যেমন :

ক্ষেতে আসিয়া চাষা ধরিলেক তারে।
ক্রোধ করি তারে লাথি চাপড় মারে।
গৃহস্থেরে বলে চান্দ মের নারে ভাই।
তোমার বাপের পুণ্যে কলাই শাক খাই।

(সূত্র: অমৃতলাল; ১৯৯৯: ১৫৪)

বিভিন্ন পেশার শত শত লোকের উপস্থিতি দেখা যায় *পদ্মাপুরাণ*-এর চরিত্র বেহুলার 'বিরহযাত্রা'র সময়ে। এর বাইরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মুসলমান, মোল্লা, কাজি, জোলা, ডোম-ডোমনী, দাসী, বাদী, চাষি, নাপিত, ওঝা, গোয়ালা, ধোপা, যুগী, কামার, কুমার, বাজিকর, ইত্যাদি শ্রেণির মানুষের বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। (সূত্র: অমৃতলাল; ১৯৯৯: ৬৪)

চার

মধ্যযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনুমানিক ১৫৪০-১৬০০ খ্রি.) *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য (ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত)। এ-কাব্যের সব চরিত্রই সাধারণ। তারা আজকের সমাজের সাধারণ মানুষকেও প্রতিনিধিত্ব করে। সকল মঙ্গলকাব্যে একটি আখ্যান বা কাহিনী, কিন্তু *চণ্ডীমঙ্গলের* দুটি কাহিনী; একটি কালকেতু উপাখ্যান, অন্যটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। (আশুতোষ; ১৯৯৮: ৪৫৯) এ-কাব্যের কাহিনী দুটি কালকেতু-ফুল্লরা এবং ধনপতি-খুল্লনা হিসেবে বেশি পরিচিত। *চণ্ডীমঙ্গলে* সমাজের উঁচু শ্রেণির ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের উপস্থিতি রয়েছে। এর বাইরে পেশাজীবীদের মধ্যে গোপ, তেলি, বারুই, নাপিত, মোদক, কামার, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, সুবর্ণবণিক, কাঁসারি, সাপুড়ে, কৈবর্ত, ধীবর, ধোপা, দরজি, শিউলি, ছুতার, মাঝি, চণ্ডাল, শুঁড়ি, চামার, ডোম, যাজক, জ্যোতিষী, ময়রা, বারবণিতা প্রভৃতি শ্রমজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ-কাব্যে অন্যতম চরিত্র কালকেতুর মাধ্যমে গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার কথা এসেছে। আমরা জানি, সময়টি ছিল মুঘল শাসনামলের। এ-সময় কৃষিব্যবস্থা খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছিল

কৃষকদের ওপর আরোপিত করারোপের নানা পদ্ধতি। এ-সত্ত্বেও 'কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘলযুগের শোষকশ্রেণির বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস। এই শ্রমজাত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো না, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের "আবওয়াব" বা বেআইনি কর। কৃষক তার সংবৎসরের শস্যের একটি বিরাট অংশ আবওয়াব মেটাবার জন্যে দিয়ে দিত। মুঘল সম্রাটরা এই আবওয়াব সংগ্রহ বারবার নিষিদ্ধ করলেও কার্যত এগুলো কোনো সময় বাতিল হয়নি।' (গৌতম; ১৪২০: ৫১) সাধারণ মানুষের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী হয়তো সে-কারণেই তাঁর চরিত্র দ্বারা পরিকল্পিত নগরে এই 'আবওয়াব' বাতিল করেছিলেন। তাই কৃষকদের গুজরাট নগরে বসবাসে উৎসাহিত করতে কবি নানান সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে 'বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু' অংশে কবির বক্তব্য :

শুন ভায়া বুলান মণ্ডল
সন্তাপ করিব দূর আস্যই আমার পুর
কানে দিব কনক কুণ্ডল
মনে না ভাবিবে আন মূলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে সেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
(সূত্র: হাই ও পাশা; ১৪০২: ৮৮)

এর আগের আখ্যান কাব্যগুলোতে কৃষি বা কৃষকের উল্লেখ যেখানে ছিল সীমিত, সেখানে চণ্ডীমঙ্গলে এসে আমরা তা পাচ্ছি অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্টভাবে। কৃষি ও কৃষকের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে এখানে আমরা পাচ্ছি ধান, গরু, লাঙল, চাষের কথা। কৃষিভিত্তিক সমাজে যে ধরনের অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়, সেগুলোর সমাধানের ইঙ্গিত উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষ করা যায়। কৃষকের ধান বিক্রিতে কর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, ব্রাহ্মণের জন্যও থাকবে বিশেষ সুবিধা। একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন এবং বিশেষত কৃষকের বিশেষায়িত সুবিধার কথা কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রতিষ্ঠাকল্পে পাওয়া যায়। (সিরাজ; ২০২০: ৪৯) এ-কাব্যের বিভিন্ন অংশে খাদ্যশস্য বা খাবার-দাবারের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় কৃষিজীবীর কথা। যেমন: 'ফুল্লরার বার মাস্যের দুঃখ' অংশে কবি লিখেছেন :

মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পুরে ॥

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী॥
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥...
মাস মধ্যে মাস্যর আপনে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান।।

(সূত্র: হাই ও পাশা; ১৪০২: ৫৪-৫৫)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পেশাজীবীর উপস্থিতি থাকলেও কবি কঙ্কণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে যে প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে, সেই কালকেতুর গুজরাট নগরীতে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণাশ্রম বা বর্ণভেদ প্রথা অধিক ক্রিয়াশীল ছিল। এ-কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতুর পেশা শিকার করা। সে-সময়ের অর্থনীতিতে এই পেশাজীবীদের যেমন ভূমিকা ছিল, তেমনি অবদান ছিল অন্য পেশাজীবীদের উৎপাদিত কাঠ, জ্বালানী কাঠ, কাঠকয়লা, লাক্ষা, বুনো রেশন, পশুচর্ম, মধু, ভেষজ উদ্ভিদের। এ-সময়ের অরণ্য ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই অধিকতর সুফলা জমিগুলোকে প্রথমে কৃষির আওতায় আনা হয়েছিল। (ইরফান; ২০০৪: ২৪) কবি এ-কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে নগরে আগত মানুষের যে বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, তা বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক।

কবি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—চার বর্ণে বিভক্ত মানুষের পরিচয় কালকেতু-উপাখ্যানের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে যেসব পেশাজীবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জোলা, কাবাড়ি, পটুয়া, সানাকর, কলন্দর, মুগবি, পিঠাহারি প্রভৃতি। এসব পেশাজীবীর অনেকেই নিজেদের প্রয়োজনে চাষবাসও করতেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রসঙ্গ কিংবা বিভিন্ন খাদ্যশস্য বা কৃষিপণ্যের নাম উল্লেখ করে কবিকঙ্কণ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কতটা মাটি ও মানুষের কবি। অন্য কবিরা যেখানে কৃষি সমাজকে এড়িয়ে গেছেন, তিনি সেখানে ততটাই স্পষ্টবাদী :

সরিষা মুসুর মাষ ধান্য নাহি দিশপাস
গুড় তিল মুগ বরবটী।
তণ্ডুল কিনিল ছোলা মুল্যা লয় চিনির গোলা
তৈল্য কিনে উমানিয়া ঘটী।।

(সূত্র: হাই ও পাশা; ১৪০২: ৭৩)

ঐতিহাসিক দিক থেকে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের রচনাকালে এই অঞ্চল ছিল মুঘলদের শাসনাধীন। সংকট ছিল কৃষক ও সাধারণ মানুষের। এ-সময়ের কৃষক তথা সাধারণ মানুষ যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ছিল, তার চিত্র ইরফান হাবিবের অন্য গ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত ওলন্দাজ এক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য থেকে

পাওয়া যায়। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ এমনই প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে যে তাদের জীবনের ছবি বা নিখুঁত বিবরণ দিলে বলতে হয় এই জীবন শুধু এক তীব্র অভাব ও নিদারুণ দুঃখের বাসভূমি। আলোচ্যপর্বে চাষীদের সাধারণ ভোগ্য ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের বিবরণ দিতে গেলে সেটি আসলে কোনোমতে টিকে থাকার জন্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় স্তরের রূপরেখা হয়ে দাঁড়াবে। তবে বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য যে ভাত-মাছ ছিল, সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। (ইরফান; ২০১৯: ৯৬-৯৭) হয়তো সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট লাঘবের মানসেই *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের স্রষ্টা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নের নগর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫২) কাব্যকে বলা হয় মধ্যযুগের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষাশৈলীর কাব্য। ভাষার দিক থেকে কেবল নয়, কাব্যবয়ানের দিক থেকেও তিনি নতুনত্ব এনেছিলেন। তাই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে তিনি দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যটুকু প্রচার ছাড়া বাদবাকি সবকিছুকে মর্ত্যলোকের চরিত্র দিয়ে সাজিয়েছেন। ফলে সেই সময়কার ঐতিহাসিক নানা চরিত্র স্থান পেয়েছে এ-কাব্যে। এ-কারণে ভবানন্দ, মানসিংহ, জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্যকে তিনি কাব্যের চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পাশাপাশি এ-কাব্যে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পেশা ও পেশাজীবী গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে অনেক পেশাজীবীর উল্লেখ আছে পূর্বে উল্লেখিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *মনসামঙ্গল* বা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যেও। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণ থেকে শুরু করে এখানে পাওয়া যায় মুসলমান সমাজভুক্ত সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। আর পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় কুমার, পাল, ঘোষ, গোপ, নাপিত, পসারি, কৈবর্ত, ছুতার, স্বর্ণকার, শুঁড়ি, কোটাল, চুড়িদার, ডোম, মিরজাদা, বেনে, কাঁসারি, শাঁখারি, গোয়ালা, চাষা-ধোবা, চাষা-কৈবর্ত, বেঁদে, মাল, বাজিকর, মালাকর, রাজবংশী, পাটনী প্রভৃতির। ঈশ্বরী পাটুনী *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের খুব পরিচিত এক নাম, যিনি পেশায় ছিলেন খেয়াঘাটের মাঝি। শ্রমজীবী এই চরিত্রের একটি উক্তি এখনো জনপ্রিয় এবং বাঙালি সমাজে আজও প্রাসঙ্গিক।

> অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
> পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।।
> সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
> ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।
> ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
> একা দেখি কূলবধূ কে বট আপনি।।...

আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।

(সূত্র: হাই ও পাশা; ১৪০৫: ১৪-১৭)

এছাড়া 'গাড়ী করে এনেছিল নৌকা বহুতর', 'নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়' (সূত্র: হাই ও পাশা; ১৪০৫: ২৪) প্রভৃতি চরণের মধ্য দিয়েও শ্রমজীবী মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আর এ-কাব্যের 'রন্ধন' অংশে পাওয়া যায় কৃষিপণ্য ও বিপুল খাদ্যশস্যের নাম। তাতে বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজে কৃষি ও কৃষক ছিল অপরিহার্য অংশীদার। সেই সময়ে প্রচলিত সেই সব খাদ্যশস্য এবং তা থেকে তৈরি খাবার এখনো বাঙালি সমাজে আগের মতোই জনপ্রিয়। যেমন :

ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে।।
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা।।
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে গুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া।।

(সূত্র: হাই ও পাশা; ১৪০৫: ১০৩)

এই অংশে আরও উল্লেখ পাওয়া যায় দলকচু, ওড়কচু, কলাবড়া, সরু ধান্যের তণ্ডুল, কলামোচা, মাগুর মাছ, শৌল মাছ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ব্যঞ্জনের নাম। উল্লেখিত পেশাজীবী ছাড়া যেসব পেশাজীবীর নাম *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে অনেক পেশাই হয়তো বর্তমান যুগে অপরিচিত; কিছু পেশাজীবীর মানুষকে হয়তো খুঁজে পাওয়াও ভার, আর কিছু পেশার হয়তো নাম বদলে গেছে। তবু বলা আবশ্যক, এরা সবাই পেশা অনুযায়ী নিজ শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন বলেই আমরা তাদের শ্রমজীবী বা শ্রমিক বলতে চাই। সমাজের শ্রেণিবিভাজন অনুযায়ী কেউ হয়তো উঁচু স্তরের, কেউ-বা নিচু স্তরের মানুষ, কিন্তু সবাই নিজেদের শ্রম ব্যয় করে জীবন ধারণ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলোতে যে ধরনের পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক শব্দের অর্থ অভিন্ন। তবু, বাংলা সাহিত্যের

তৎকালীন নিদর্শনগুলোতে নানা নামে আশিটির[৭] (গোপিকারঞ্জন; ১৯৯৯: ২১) অধিক পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঁচ

শিবমঙ্গল বা *শিবায়ন* বা *শিব-সঙ্কীর্তন*ও মঙ্গলকাব্য ধারার একটি কাব্য। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমসাময়িক কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য এটি রচনা করেন। তাঁর সঠিক জন্মসাল জানা যায় না। তবে কাব্য রচনার কাল এবং ভাষার ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় তিনি ভারতচন্দ্রের সময়পর্বের কবি। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের মতো *শিবমঙ্গল* কাব্যও বেশ কয়েকজন কবি রচনা করেছেন। তবে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্তন* (আনু. ১৭৫০ খ্রি.) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিব-কাহিনীতে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। শিবমঙ্গল ধারার কাব্যগুলোর মধ্যে তাঁর কাব্যই বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। (আশুতোষ; ১৯৯৮: ২২৩) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও শিবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে তা প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় নয়। কিন্তু *শিবায়নে* শিবই প্রধান। এখানে শিব প্রধানত কৃষক; কৃষক শুধু নন, নায়ক এবং কৃষকের আপনজনও। সে-কারণেই বলা যায়, ‘বাঙলা ও বাঙালীর লৌকিক শিব নামে দেবতা, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমান বাঙালী, তাঁর দাম্পত্যে, তাঁর বৈষয়িক জীবনে, তাঁর সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, লাভ-ক্ষতিতে তিনি অভাবক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন ভ্রষ্টচরিত্র বাঙালী গৃহস্থ। তাই দেবতা থাকেন নি তিনি, নিত্যদেখা, নিত্যজানা আত্মীয় বন্ধু পরিজন তিনি, সেজন্যেই তিনি এতো আপন, এতো প্রিয়। তাঁর সঙ্গে গ্রামীণ গৃহী বাঙালীর ধন-মান ও শ্রেণীগত কোন ব্যবধান নেই।’ (শরীফ; ১৯৭১: ৪২৯) এভাবেই প্রথমবারের মতো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কোনো কাব্যে কৃষকের নায়ক হয়ে ওঠা; আর তা সম্ভব হয়েছে *শিবায়ন*-এর মধ্য দিয়ে। তবে এখানে ‘শিব কেন্দ্রের হয়েও প্রান্তের, দেবতা হয়েও গার্হস্থ্য, কৈলাসে বসবাস করেও শ্মশানচারী, পিশাচেরা তাঁর অনুসারী অসুরেরা তাঁর ভক্ত; তিনি কিরাতরূপে আবির্ভূত হন, তিনি ভিক্ষা করেন, আবার কৃষির সূচনাও করেন।’ (সিরাজ; ২০২০: ৩৩) ভিক্ষায় প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে চাল, ডাল, শসা, আলু শাক, কচু ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। আর পেশা হিসেবে পাওয়া কৃষক, গোয়ালা, মোদক প্রভৃতি নাম শ্রমজীবী-নির্ভর গ্রামীণ সমাজকেই ভাস্বর করে তোলে। এ-কাব্যে শিব উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং এর জন্য তিনি নানা প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করেন; তবু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। সেটিই শিবমঙ্গলের অন্যতম বিশেষত্ব হিসেবে লক্ষণীয়।

তাই *শিবায়ন*-এ কৃষক শিবের মাহাত্ম্য নায়োকোচিত। শিব কীভাবে পেশা হিসেবে কৃষিকে বেছে নিয়েছিলেন, তার বিবরণ কাব্যের আখ্যান থেকে বিস্তারিত জানা যায়। একসময় কৃষকের কল্যাণকর দেবতা হিসেবে কোচ সমাজে যে শিব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটাই সম্ভবত *শিবায়ন* রচনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকবে। তবে মঙ্গলকাব্যগুলোতে শিবকে দেবতা হিসেবেই নানা ভূমিকায় দেখা যায়। দেশের সাধারণ মানুষ কৃষক। একমাত্র *শিবায়নে*ই শিবকে সাধারণ কৃষক হিসেবে ফসল উৎপাদনে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। আবার এটাও সত্য, কৃষকের উৎপাদন-বৃদ্ধির আদি দেবতাও ছিলেন কৃষকরূপে কল্পিত। *শিবায়ন*-এর সামাজিক আপস-রফার সূত্রে পৌরাণিক হিন্দুর সেই দেবাদিদেব এই কৃষক-দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কৃষকের বাস্তব জীবনের মতোই গড়ে ওঠে *শিবায়নে*র কৃষকের সংস্কার ও পরিকল্পনা। কৃষক-শিবের চরিত্র তা-ই নির্মিত হয় বাংলার প্রাকৃতজনের জীবনাদর্শে। (গোপাল; ১৪০০: ১৩৪) বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ধান ভানতে শিবের গীত'। এর মাধ্যমে লোকজীবন বা জনসমাজেও শিব বহুল পরিচিত। এই শিবের গীতের শিবকে *শিবায়ন*-এ অলস কৃষক, কৃষিকাজে উদাসীন ও অভাবী হিসেবেও দেখা যায়। এমনকি এই শিবকে একসময় ভিক্ষাবৃত্তি করতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় সতী যখন পুনর্জন্ম লাভ করে গৌরী নাম ধারণ করেন, তখনই তাকে কৃষিকাজে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। শিব পরামর্শ মেনে ইন্দ্রের কাছ থেকে 'চাষ-ভূমির পাট্টা' গ্রহণ করেন; যদিও ইন্দ্র প্রথমে রাজি ছিলেন না। যখন দেখেন শিব চাষ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন, তখন রাজি হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এরপর ভৃত্য ভীমের সাহায্যে কুবেরের কাছ থেকে ধানের বীজ সংগ্রহ করেন শিব: 'কল্পতরু কেবল কুবের পায়্যা ঘরে।/ ভীমের সহিতে শিবে সমাদর করে।।/ শিবের সংবাদ শুন্যা সুখী হৈল মনে।' (রামেশ্বর; ১৯৫৭: ২৩০) চাষের জন্য জমিও প্রস্তুত করেন শিব। ভীমের সাহায্য নিয়ে মাঘ মাসের বৃষ্টিপাতের শুভক্ষণে তিনি জমি চাষ করেন:

> পৃথিবীতে প্রবেশ করিলা পশুপতি।
> দেবীচক দ্বীপের উপরে উপনীতি।।...
> দিন সাতেক বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
> হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।
> আরম্ভে উগাল্যা গেল একশত কুড়া।
> পড়্যা গেল পাড় যেন পর্ব্বতের চূড়া।।
> দুদণ্ডে ছাড়িয়া হাল হাল্যা গেল ঘরে।
> বান্ধ আলি বৈকালে বান্ধিল একপরে।।'
>
> (রামেশ্বর; ১৯৫৭: ২৩৪)

নিয়মানুযায়ী অন্যান্য কাজ শেষে শিব প্রচুর ফসল ফলাতে সক্ষম হন। শিবের অনুচরগণ ধান ভেনে চাল উৎপাদন করেন। (ভূমিকা: *শিবায়ন*; ১৯৫৭: ২৮) এর মধ্য দিয়ে শিব-গৌরী সংসারের খাদ্যাভাব দূর হয়। আর *শিবায়ন* পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকের বাঙালির চিরাচরিত এক কৃষিজীবন দেখার সুযোগ হয়।

একসময় কৃষিকাজকে 'দেবকার্য' হিসেবে পরিগণিত করা হতো। বিশেষ করে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষিকাজ সম্মানজনক পেশা হিসেবে গৃহীত হতো। অভিজাত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিকাজের প্রচলন ছিল। ধনাঢ্য কৃষকেরা কৃষিজমি-সংলগ্ন এলাকায় বাস করতেন এবং ফসল উৎপাদন শেষে তা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। এ-সময় তাঁরা খানিকটা সন্ন্যাস-যাপনের মতো স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে থাকতেন। এ বিষয়ে *শিবায়নে* উল্লেখ আছে:

> ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
> সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥
> এই পাকে প্রভু মোরে পাসরিয়া আছে।
> প্রিয় ধান্য পোতা গেলে পিটা ফেলে পাছে।
>
> (রামেশ্বর; ১৯৫৭: ২৫৬)

এমনকি গবাদিপশুও পালন করতেন শিব। কেননা, কৃষিকাজের সঙ্গে গবাদি পশুপালনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষত, 'সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে কৃষিকার্য্য সম্মানজনক বৃত্তি বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইত। অভিজাত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও কৃষিকার্য্যের প্রচলন ছিল। অভিজাত গৃহস্থ স্বয়ং কৃষি ক্ষেত্রে বাস করিতেন এবং ফসল সংগ্রহ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বৎসরের মধ্যে ছয় হইতে আট মাস কৃষিক্ষেত্রে স্ত্রীপুত্র গইতে বিচ্যুত হইয়া বাস করিতে হইত। তিনি নিজে গোপালন করিতেন।...কৃষিকার্য্য তখনও দেবকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।' (সূত্র: যোগিলাল হালদার; ১৯৫৭: ৪৭) অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ সর্বজনীনতা লাভ করেছে। তাই কৃষিকাজ আর কেবল 'দেবকার্য' নয়। বরং শিল্প-কারখানা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কৃষিকাজ অবহেলিত পেশা এবং কৃষক সমাজের প্রান্তিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।

অথচ যখন কৃষিকাজ সমাজে 'দেবকার্য' হিসেবে পরিগণিত হতো, তখন সবকিছুই হতো পরিকল্পনমাফিক। কারণ প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস নয়; বরং সুরক্ষাচেষ্টায় নিয়োজিত থাকত মানুষ। ফলে, প্রকৃতি ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল চাষবাসের সমস্ত পরিকল্পনা। শুভক্ষণ কী, কখন চাষ করলে ফসল ভালো হবে, কী করলে গরু সুস্থ থাকবে, কোন সময় চাষবাস ক্ষতিকর বা

নিষিদ্ধ প্রভৃতি জ্ঞান ছিল কৃষকদের, যা *শিবায়নে*ও পাওয়া যায়। যেমন মাঘমাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হলে তাকে শুভক্ষণ গণ্য করা হতো যেমন :

মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরিষিলা।।
দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।

(রামেশ্বর; ১৯৫৭: ২৩৪)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোর তাৎপর্য তুলনা করা যায় বহুল প্রচলিত খনার বচন 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজা পুণ্যি দেশ'-এর সঙ্গে। মাঘ মাসের শেষের বর্ষণে চাষবাস শুরু করেন কৃষকেরা। আবার প্রকৃতির নিয়মমাফিক কৃষিকাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে তৎকালীন কৃষকদের সচেতন থাকতে হতো। *শিবায়নে* তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নিষিদ্ধ দিনে হালচাষ বন্ধ থাকলেও অন্যান্য কৃষিকাজ বন্ধ থাকত না। এ সময়গুলো কৃষকেরা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতেন। গরুর চিকিৎসা সম্পর্কেও কৃষক যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দুপুরে হালচাষ শেষে কৃষাণ খাবার গ্রহণ করতে গেলে গৃহস্থ নিজেই এ সময় গরুর দেখভাল করতেন। এই বিষয়গুলোও শিবের কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে পাওয়া যায় রামেশ্বরের এ-কাব্যে:

হাল ছাড়্যা হাল্যা যবে করে জলপান।
হেল্যাকে চরান শিব হয়্যা সাবধান।।
দিন দশে দু হেল্যার কান্ধ গেল বস্যা।
ধুতুরার রস তাতে শিব দিল ঘস্যা।।
হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্য মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো।।
সেই সেই কালে যার হয় হল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ।।
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া।।

(রামেশ্বর; ১৯৫৭: ২৩৭)

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, *শিবায়ন*-এ কবি শুধু শিবকে কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি, তৎকালীন কৃষিব্যবস্থা, কৃষকের বিধিনিষেধ, চাষবাসের পরিকল্পনা, আবহাওয়া বিবেচনায় নিয়ে চাষবাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া—সবকিছুরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাই বলা যায়, মধ্যযুগের

কাব্যসাহিত্যে কৃষি, কৃষিশ্রমিক ও কৃষিব্যবস্থার অনবদ্য চিত্র বিধৃত হয়ে আছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন*-এ।

ছয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিচিত্র বিষয় ও ধারায় সমৃদ্ধ। এতে মঙ্গলকাব্যের যেমন বড় অবদান রয়েছে, তেমনি আরবি-ফারসি-হিন্দি সাহিত্যের অনুসরণে রচিত আখ্যানকাব্য, ধর্মীয় ও জীবনীভিত্তিক কাব্য, সংস্কৃত থেকে কৃত অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলিরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সব ধরনের সাহিত্যকর্মে আমাদের এই অঞ্চলের নিজস্ব শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর যেমন রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও মূল্যবোধ, তেমনি কবিদেরও কাব্য রচনার পেছনে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তাই জীবনাচরণের দিক থেকে সাদৃশ্য নয় বলেই অনূদিত সাহিত্যে বাঙালির নিজস্বতা তথা, বাঙালির পেশাজীবনকে ততটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার বাঙালি কবিদের রচিত হলেও বৈষ্ণব পদাবলিতে জাতিগত বা পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ এর প্রধান উপজীব্য রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা, জীবাত্মা-পরামাত্মার সম্পর্কের টানাপোড়েন ও প্রেম-ভক্তি। অন্যদিকে শাক্ত পদাবলির বিষয় ও উপস্থাপন কৌশল অনেক বাস্তবসম্মত হওয়ায় কারও কারও রচিত কাব্যগীতিতে আমাদের কৃষিজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে।

শাক্ত পদাবলিতে নারী শক্তি দুটি ধারায় মূল্যায়িত—উমা ও শ্যামা। উমাকে কেন্দ্র করে আগমনী-বিজয়া এবং শ্যামাকে কেন্দ্র করে জগজ্জননীর রূপ, ভক্তের আকুতি প্রভৃতি অংশ রচিত। এই দুজন আবার ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। পার্বতী, সতী, দুর্গা, উমা, চণ্ডিকা প্রভৃতি নাম ধারণ করে আবার মিলিতভাবে কালিকা বা কালী নামে বিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এই কালী বা কালিকাই প্রধান। (ধ্রুবকুমার; ১৯৯৪: ৩) তবে প্রাচীন অনার্য সমাজে তিনি শতাধিক নামে পূজিত হতেন। তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাব্যগীতি এবং এর সঙ্গে বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজ সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও তা-ই সত্য বলে মনে হয়। কেননা, বাঙালির ধর্মীয় জীবনে দেব অপেক্ষা দেবীর স্থান যে উঁচুস্থানে, তা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যত সহজে একটি পরিবার এবং তা থেকে এক-একটি সুনিদিষ্ট অঞ্চল গড়ে ওঠার সুযোগ পায়, যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তা সহজে সম্ভব হয় না। (আশুতোষ; ১৯৯৮: ৩)

বৈষ্ণব পদাবলির মতো শাক্ত পদাবলির রচয়িতাও অনেক। ফলে সব পদাবলিই সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হয়েছে, তেমন বলা যায় না। তবে সবই গীত হওয়ার মতো। এগুলো আগে কবিতা, পরে সংগীত

হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে। ফলে এগুলোকে কাব্যগীতিও বলা হয়ে থাকে। শাক্ত পদাবলির কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রজনীকান্ত সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, নরচন্দ্র রায় প্রমুখ বেশি পরিচিত। তাঁদের মধ্যে আবার রামপ্রসাদ সেনের পদাবলিতে যতটা মাটি ও মানুষের পরিচয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, অন্য কবিদের ক্ষেত্রে ততটা পাওয়া যায় না। গান হিসেবেও রামপ্রসাদের পদাবলিগুলো যতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে, অন্য কবিদের গান ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) বয়সের দিক থেকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমসাময়িক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিভার দিক থেকে ভারতচন্দ্রের পরই রামপ্রসাদকে ধরা হয়। তিনি সাধক কবি হিসেবে সর্বজনবিদিত। তাঁর গানে 'বাংলার মাটির গন্ধ আছে, মানুষের প্রাণকেও সেই অষ্টাদশ শতকে সে গীত স্পর্শ করেছিল। কোনো কোনো পদে এমন একটা ঘরোয়া ভাবের সরল শ্রী ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা আছে, যা লোকগীতে ছাড়া সাধারণত পাওয়া যায় না।—অন্তত সাধারণ বৈষ্ণব পদাবলীতে তা দুর্লভ। ভয়ঙ্করী কালী, দুর্গার মতো বাঙালীর কাছে দয়াময়ী জননী হয়ে উঠেছেন—আর রামপ্রসাদী গীতের মারফত এই সম্পর্কটি রসস্নিগ্ধ হয়ে বাংলা দেশের জনচিত্তেও পুনঃপ্রবেশ করেছে।' (গোপাল; ১৪০০: ২১৮) এই যে জনচিত্ত, তাতে উপমা বা রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবেশ করান বাংলার ঐতিহ্যকে, শ্রমজীবনকে, কৃষি-সংশ্লিষ্ট উপাদানকে। যেমন :

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত।।

(সূত্র: ধ্রুবকুমার; ১৯৯৪: ২৪৮)

রূপকের মাধ্যমে তিনি দেবীর কাছে যেন অভিমানী বা আবেগের কথা পরিবেশন করেছেন। বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত প্রবাদ 'কলুর বলদের মতো শ্রম দেওয়া'। কিন্তু এখানে তিনি বলেছেন ষড়ুরিপুর কথা। যেহেতু মাতৃশক্তিকে খুশি করার প্রয়াস, তাই সেখানে রামপ্রসাদের শব্দচয়ন খুবই আকর্ষণীয় এবং মায়াময়। আরেকটি পদে তিনি বলেছেন, 'নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।।/ আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।' (সূত্র: ধ্রুবকুমার; ১৯৯৪: ২৪৯) পঞ্চেন্দ্রিয়র কথা এমন কাব্যিকভাবে তিনি পাঠকের সামনে এনেছেন, যার মধ্য দিয়ে বাঙালির আবেগকে তিনি একাকার করেছেন। আবার কৃষকের অপরিহার্য অনুষঙ্গ গরুর কথাও ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন। তবু কাব্যগীতিরও কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত একসময় খুব শ্রোতাপ্রিয় ছিল। এখনো সে-সুর অক্ষত রয়েছে। তাঁকে শ্যামাসংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার ও আগমনী গানের ধারাপ্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। একটা পদে তিনি রূপকের আশ্রয়

নিয়ে এমনভাবে কৃষি ও কৃষি-জমির কথা উপস্থাপন করেছেন, সহজে তার গূঢ়ার্থ বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমরা অনুধাবন করতে পারি, কৃষি বা কৃষকের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলে কখনোই এভাবে কারও লেখা সম্ভব নয় :

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হইবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥...
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।।
(সূত্র: হাই ও পাশা; ১৯৯৮: ২২১)

শ্যামাসংগীতের এই চরণগুলোও অতি জনপ্রিয় এবং শিল্পগুণসম্পন্ন। আর ভাষার দিক থেকে খুব আধুনিক ও মুখের ভাষার কাছাকাছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হলেও তিনি ছিলেন সমাজ-সচেতন। তা না হলে সাধারণ মানুষের প্রায় কথ্যরীতির ভাষা এবং সাধারণ মানুষের পেশার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে কাব্যগীতি বা এই প্রার্থনাগীত তিনি রচনা করতে পারতেন না। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এবং রামপ্রসাদ সেনের এই ভাষাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এটাও স্পষ্ট, আধুনিক যুগ আসন্ন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতা আলোচনার নিরিখে বলা যায়, চর্যাপদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হলেও 'মঙ্গলকাব্যগুলোতেই প্রথম প্রান্তিক মানুষ অরণ্য বা পর্বত থেকে সমতলে এসে পৌঁছেছে। এই আসার যাত্রাপথ তৈরি হয়েছে জল-ভূমি-উর্বরতা ও কৃষির সূত্রে। পর্বতবাসী শিব নেমে এসেছে কৃষিজীবী কোচ-বাগদিপাড়ায়; অরণ্যচারী শিকারি জীবন ছেড়ে কিরাতনন্দন কালকেতু হয়েছে কোনো এক কৃষিনির্ভর জনপদের রাজা। এই কৃষিক্ষেত্র বা উর্বর জমিতেই রচিত হবে পরবর্তী জীবনের গল্প।' (সিরাজ; ২০২০: ৫৩) যেমন শাক্তপদাবলিসমূহে মাতৃ-মাহাত্ম্যের বাণী ধরা পড়লেও অনেক গীতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে কৃষি ও কৃষকের প্রসঙ্গ।

সময়গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা কবিতার বিষয় ও ভাষার বিবর্তন হতে হতে এখন তা ক্রমশ সাধারণের বোধগম্যতার কাতারে চলে এসেছে। মানুষের মনে প্রয়োজনীয় সংস্কারবোধ জাগ্রত হতে শুরু হয়েছে। এভাবে সময় যত এগিয়েছে, মানুষ আধুনিকমনস্ক হয়েছে। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের (১৭৫৭-১৯৪৭) আওতায় থাকার কারণে ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়

আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলেও। ব্রিটিশ আমলের শুরুর দিকে (১৭৬৫) ‘দেওয়ানি হাতে নিয়েই ইংরেজ টের পায় এ দেশের কৃষিব্যবস্থা অতি প্রাচীন, জমির সঙ্গে রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এখানে নানা সনাতন প্রথায় নিয়ন্ত্রিত এবং জমির মালিকানা, ফসলবোনার কায়দা ইত্যাদি সব কিছুই এক সাবেক সংস্কারের অঙ্গ। অতীতকে উপেক্ষা করে এখানে রাজস্ব আদায় সম্ভব নয়।’ (সূত্র: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়; ২০১০: ২৪) ভারতে ক্ষমতায় আরোহণের শুরুর দিকে ইংরেজদের ভাবনা ছিল এ রকমই। কিন্তু কালক্রমে তা বদলেছে। কৃষকেরা ক্রমশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। একপর্যায়ে তারাই সমাজের ‘নিম্নবর্গের’ (Subaltern) শ্রেণিভুক্ত হয়ে যায়। এ-প্রসঙ্গে নিচের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাকে ‘আধুনিক’ পর্ব বলে অভিহিত করা হয়, মার্কসীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তার মূল চরিত্রটিকে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। ইউরোপের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু ধারণা মার্কসবাদী আলোচনায় প্রচলিত আছে। সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদন ব্যবস্থা, তার ভঙ্গুর অবস্থা; পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের সূত্রপাত; কৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া; জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি; একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার—মোটামুটি এইভাবেই সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবকে দেখা হয়ে এসেছে। (সূত্র: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়; ২০১০: ৫)

এরপর সমাজের মানুষ যখন অধিকার সচেতন হয়েছে, ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, অবকাঠামোর উন্নয়নের হার যত বেড়েছে, শিল্প-কারখানার সুবাদে যত বেশি ঘটেছে নগর-সভ্যতার বিকাশ, ততই অংশগ্রহণ বেড়েছে নানা ধরনের শ্রমজীবী মানুষের। ফলে নানা সংকট ও বৈষম্য বেড়েছে এই শ্রেণির মানুষের জীবনে। শোষকেরা ক্রমশ শোষণের নানামাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে শ্রমজীবী মানুষকে মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করতে। এভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হওয়া শ্রমিক শ্রেণি নাগরিক সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকেও উপেক্ষিত থেকেছে। এ সময় কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নিজ দায়িত্বে শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছেন কবিতা নির্মাণের মধ্য দিয়ে; কখনো-বা এড়িয়েও গেছেন। নতুন সেইসব আয়োজনে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যুক্ত হয়েছে নতুন শব্দের সমাহার; সূচিত হয়েছে নতুন জীবনভাষ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ফলে তাঁরা কখনো উচ্চস্বরে, কখনো শৈল্পিক স্বরগ্রামে সমাজচিত্র ধারণ করেছেন। আমাদের পরবর্তী অন্বিষ্ট, আধুনিকমনস্ক সেইসব কবির কবিতা ও কাব্যশৈলীর মাঝে কৃষক-শ্রমিকের সন্নিবেশ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনার কবিতানিহিত সৃজনবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা।

টীকা

---

১ এমন শহরও আছে, যেগুলো বিখ্যাত এবং সেগুলো নদী-তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত নয়। তবে প্রাচীনকালে নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা শহরকে কেন্দ্র করে যতটা কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করত, সেটা তেমনটা নদীবিহীন শহরে দেখা যায় না।

২ 'উপজাতি' শব্দটি বাংলা ভাষায় অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়েছে। কারণ যেকোনো বিশেষ্যের আগে 'উপ' অক্ষর দুটি অর্থে ব্যবহার করে মূলত মূল শব্দের চেয়ে কম তাৎপর্যের কিছু বা তার কাছাকাছি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বোঝায়। উপশহর, উপকণ্ঠ, উপসচিব প্রভৃতি তারই নমুনা। কিন্তু জাতি তো জাতিই। একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, আচরণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে নিজস্বতা গড়ে ওঠে, তা-ই অন্য জাতি থেকে তাকে আলাদা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তার আগে 'উপ' ব্যবহার করলে সেই জাতিকে অবমূল্যায়ন করা হয়। এমন শব্দচয়নের মাধ্যমে ওই জাতিকে অন্য সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চেয়ে খাটো করে দেখার সুযোগ থাকে। যাদের এত দিন 'উপজাতি' হিসেবে অভিহিত করা হতো, আধুনিককালের নৃতাত্ত্বিকগণ তাদের বলছেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা আদিবাসী। যেকোনো অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা নানা কারণে আস্তে আস্তে সংখ্যায় কমে যেতে পারে। তাই বলে তো জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় না। সে-কারণে উপজাতি নয়, আমাদের উচিত, তাদের আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা।

৩ ইরফান হাবীব তাঁর *মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস: একটি সমীক্ষা* গ্রন্থে শহরের বিকাশের প্রসঙ্গ এনেছেন। কুৎব, দিল্লি, কিলোখ্‌রি, সিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে জনবসতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পাথর, ধ্বংসস্তূপ ও ইট থেকে যেসব চিহ্ন পাওয়া যায়, তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৩০ সালে ইবনে বতুতা দিল্লি শহরের সুবিশাল বিস্তার ও এর জনসংখ্যার বর্ণনা করেছিলেন। এর বাইরেও লাহোর, মুলতান, লক্ষ্ণৌ, অনহিলওয়াড়া প্রভৃতি শহরের নাম পাওয়া যায়।

৪ একটি কিংবদন্তি অনুসারে খনার নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের দেউলি গ্রামে। পিতার নাম অনাচার্য। চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রম চন্দ্রপুরে তিনি বহুকাল বাস করেন। অপর কিংবদন্তি অনুসারে তিনি ছিলেন সিংহলরাজের কন্যা। শুভক্ষণে জন্মলাভ করায় তাঁর নাম রাখা হয় ক্ষণা বা খনা। এদিকে বিক্রমাদিত্যের সভার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহপুত্র মিহিরের জন্মের পর গণনা করে দেখেন যে, তাঁর আয়ু মাত্র এক বছর। তাই পুত্রকে তিনি একটি পাত্রে রেখে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। পাত্রটি ভাসতে ভাসতে সিংহল দ্বীপে পৌঁছায়। সিংহলরাজ শিশুটিকে নিয়ে লালন-পালন করেন এবং বয়ঃক্রমকালে খনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। মিহির ও খনা উভয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতঃপর মিহির সস্ত্রীক জন্মভূমিতে ফিরে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে তাঁরা একত্রে বসবাস করতে থাকেন। খনার স্বামী মিহির একসময় বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হন এবং পিতার ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করেন। একদিন পিতা-পুত্র আকাশের তারা গণনায় সমস্যায় পড়েন। খনা এ সমস্যার সমাধান করে বিক্রমাদিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে রাজসভায় প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে পিতার আদেশে মিহির খনার

জিহ্বা কেটে দেন। কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়।

(সূত্র: http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE)

৫ খনার বচনগুলো আমাদের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এর লিখিত যে রূপ এখন পাওয়া যায়, তাতে সন্দেহ হয় বচনগুলোর মূল রূপ লিখিতভাবে ধরা পড়েছে কি না। যদি আমরা বাংলাপিডিয়ার অনুমিত রচনাকালকে সঠিক ধরে নিই, তবে দেখা যায় তার অনেক পরে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা এর চেয়ে পুরোনো বা 'অনাধুনিক'। যেহেতু লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না, তাই ধরে নিতে হয়, মুখে মুখে চর্চিত হতে হতে এর ভাষাগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এমনকি ভাষার প্রমিতকরণ ঘটেছে, তেমন বলাও অসমীচীন হবে না। শস্য উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে খনার বচন রয়েছে। যেমন কয়েকটি শস্যের চাষপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'ষোলো চাষে মূলা। তার অর্ধেক তুলা।/তার আর্ধেক ধান। বিনা চাষে পান।' এ ছাড়া খনার বচন শুধু আমাদের ভাষায় প্রচলিত নয়। বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার, নেপাল, তিব্বতসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের খনার বচন পরিচিত ও আদৃত।

৬ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে যেমন প্রায় সমগোত্রীয় বা সমমর্যাদার এক পেশার শ্রমজীবীর অন্য পেশার শ্রমজীবীকে অবজ্ঞা করতে দেখা যায়, তেমনি কালো কাককে কুলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।। যেমন: 'ঘরের বাহির হৈতেঁ/তেলিনি তেল বিচিতেঁ/ কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।/ আগেঁ সুনা ঘটে নারী/ হাঁছী জিঠিহো না বারী/ চলিলোঁ তাহার উচিত পাঁও ফলে।। (অমিত্রসূদন; ১৯৯৬: ২৫১)

৭ চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্য-নিদর্শনগুলোতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের মানুষের নির্দিষ্ট পেশাসহ আশির অধিক পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পেশা প্রাধান্য থাকলেও মুসলিম পেশাজীবীর উল্লেখও পাওয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের পেশার মধ্যে রয়েছে: পূজারি, শিকারী, বণিক, খাজনা আদায়কারী, তেলি, মালী, তাঁতী, কবিরাজ, বারুই, তাম্বুলী, নাপিত, কর্মকার, কুমার, মোদক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, শাঁখারী, কাঁসারী, গোয়ালা, গোপ, যোগী, ধোপা, চাষা-ধোপা, কৈবর্ত, মোড়ল, পাটনী, ছুতার, ধীবর, দাস, চুনারী, বাইত, চণ্ডাল, বাগদি, নড়ি, শিউলি, মাল, শুঁড়ি, চামার, ডোম, কেউট, হাড়ি, সরাক, কিরাত, কোল, আগরী, গুড়ি, মুচি, কূর্মী, কোরঙ্গা, পোদ, কপালী, তিয়র, বেদে, বাজিকর, কান্, রাজবংশী, তাতালে, চুড়িদার, মেথর, মাটীয়া, কোঁচ, কামিলা, চৌদুলি, দরজি, লবণিঞা, চিনি উৎপাদনকারী, দিনমজুর, কুলু, জোলা, মুগরি, পিঠারি, কাবাড়ি, গরসাল, সানাকর, পটুয়া, তিরকর, কাগতি, কলন্দর, কোটাল, রাউত, মাহুত, ভাঁড়, ভাবক, ভক্তিয়া, দাই, চোর, নাটুয়া, কসবি। উল্লিখিত সব বৃত্তির অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। এসব বৃত্তির মধ্যে অনেক বৃত্তির নাম পরিবর্তন হয়েছে, অনেক বৃত্তি বিলুপ্ত হয়েছে। কোনো কোনো বৃত্তি অন্যটির সঙ্গে লীন হয়েছে।

সহায়ক পঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ

অতীন্দ্র মজুমদার (১৩৬৭)। *চর্যাপদ*। নয়া প্রকাশ, কলকাতা

আনিসুজ্জামান (২০০৯)। *স্বরূপের সন্ধানে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৯৮)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

আহমদ শরীফ (২০১৮)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* [প্রথম খণ্ড]। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

—(১৯৭১)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* [দ্বিতীয় খণ্ড]। বর্ণমিছিল, ঢাকা

ইরফান হাবিব (২০০৪)। *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সমীক্ষা* (অনুবাদ: সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়)। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

—(২০১৯)। *মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

গোপাল হালদার (১৪০০)। *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী (১৯৯৯)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গৌতম ভদ্র (১৪২০)। *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ*। সুবর্ণরেখা, কলকাতা

জুলফিকার হায়দার (২০০৪)। *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় (১৪০২)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পূরবী বসু (২০১৫)। *কিংবদন্তির খনা ও খনার বচন*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯১)। *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রংগলাল সেন (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রোমিলা থাপার (১৯৬০)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ*। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, হায়দরাবাদ

সিরাজ সালেকীন (২০২০)। *কবিতায় নৃগোষ্ঠী : মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সেলিম আল দীন (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [সম্পা.] (১৯১৬)। *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগানও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

সম্পাদিত গ্রন্থ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য [সম্পা.] (১৯৯৬)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অমৃতলাল বালা [সম্পা.] (১৯৯৯)। *বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*। বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ এনামুল হক [সম্পা.] (২০১৩)। *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় [সম্পা.] (১৯৯৪)। *শাক্ত পদাবলী*। রত্নাবলী, কলকাতা

নরেশচন্দ্র জানা [সম্পা.] (১৯৯৩)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনচর্চা*, কলকাতা

মনসুর মুসা [সম্পা.] (২০১৩)। *বাঙলাদেশ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.] (১৪০২)। *কালকেতু উপাখ্যান*। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

—(১৪০২)। *চর্যাগীতিকা*। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

—(১৪০২)। *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

—(১৯৯৮)। *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

যোগিলাল হালদার [সম্পা.] (১৯৫৭)। *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০১৩)। 'বাঙলাদেশ'। *বাঙলাদেশ* [মনসুর মুসা সম্পা.]। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

রণজিৎ গুহ (২০১০)। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.)। আনন্দ, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১০)। 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.)। আনন্দ, কলকাতা

ওয়েবসাইট

https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%B0

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা : কৃষক-শ্রমিকের জীবন

সামন্ত সমাজে যেমন তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ও শ্রমজীবীরদের সমাজের নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটি এ-ধরনের সমাজের অলিখিত বাস্তবতা। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদসহ গোটা মধ্যযুগের বেশির ভাগ কাব্যধারার এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যের এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। মধ্যযুগের সাহিত্যের একমাত্র ব্যতিক্রম *শিব-সঙ্কীর্তন* বা *শিবমঙ্গল*। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কাব্যেই প্রথম কৃষককে নায়ক হিসেবে পাওয়া যায়। আর এ কৃষক স্বয়ং শিব। ধর্মীয় কোনো বাতাবরণে নয়, একজন চিরকালীন বাঙালি কৃষক ফসল ফলাতে যেসব কর্মযজ্ঞ পালন করে থাকেন, যেসব সংস্কার ও বিধিনিষেধ মেনে চলেন, এ-কাব্যের কৃষক শিব তার সবই মেনে চলেছেন। শ্রমজীবী মানুষ যে কাব্যসাধনার প্রধানতম অবলম্বন হতে পারে, এই ধারা *শিবমঙ্গল*-এ শুরু হয়েছিল। এরপর আর কোনো কবির কবিতায় সেভাবে কৃষিপ্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়নি। তবে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম *মেঘনাদবধ কাব্যে* (১৮৬১) বীরবাহুর মৃত্যুর পর অন্য সৈন্যদের করুণদশা ফুটিয়ে তুলতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) কৃষকদের ধানকাটার পরের দৃশ্যের মতো বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'হায় রে যেমতি/ স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,/ পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,/ রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!' (মধুসূদন; ১৯৪২: ২৪০) এরপর বাংলা সাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) আবির্ভাব ঘটে। নিসর্গ-আশ্রিত কবিতা সৃজনে তাঁর সাফল্য স্মরণীয়। কবিতা নির্মাণে তিনি নিসর্গকে কখনো দেশ, কখনো মানসী, কখনো-বা দেবী-বন্দনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তেমনই প্রয়াস লক্ষ করা যায় *বঙ্গসুন্দরী* (১৮৭০) কাব্যগ্রন্থেও। বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্যের নিসর্গচিত্র ধরতে গিয়েই তিনি অনিবার্য উপাদান হিসেবে আনেন গ্রামবাংলার প্রসঙ্গ। তাতে যেন আবশ্যক হিসেবে উঠে আসে মাঠ, চাষি ও ফসলের কথা। তিনি এক অপার প্রশান্তি পেতে চান এই বলে :

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই
নাম ধাম সকল লুকাই;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

(বিহারীলাল; ২০০০: ১৩)

কেন তিনি 'চাষীদের সঙ্গেতে' বেড়াতে চান, তার কার্যকরণ লিপিবদ্ধ করেছেন পরের স্তবকে: 'চারি দিক মনোরম/ আমোদে করিব শ্রম/ সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।' গ্রামীণ প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য যে কৃষি ও চাষি ব্যতীত অসম্ভব, তা-ই যেন প্রতীয়মান হয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা-

সৃজনপ্রয়াসে। তবে সমাজ ও রাজনীতির নানা পটভূমিতে আধুনিক কবিগণ যে শ্রমজীবনকে নিজেদের কাব্যশিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তেমন দৃষ্টান্ত পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে রবীন্দ্র-নজরুল পর্যন্ত।

এ-সময় কৃষক ও শ্রমিককে নিজেদের সৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে, বাঙালির অস্তিত্বের শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাঁরা উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) উনিশ শতকের শেষদিকে *সোনার তরী* (১৮৯৪) কাব্যের মধ্য দিয়ে সম্ভবত প্রথম কৃষি ও কৃষকের প্রসঙ্গ এনেছিলেন। কৃষক ও কৃষিজাত প্রধান শস্য ধানক্ষেতের প্রসঙ্গ রূপকের আড়ালে এনেছেন বলে তার ভিন্ন কোনো গূঢ়ার্থ খোঁজা সম্ভব হয় ঠিকই, কিন্তু কৃষি ও কৃষক তাঁর কবিতায় উঠে আসার নেপথ্যে গড়ে উঠেছিল পূর্ববাংলায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক মেলবন্ধন। এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে গেছেন তিনি এ-কাব্যের ভূমিকায়, 'এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।... সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।' (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৮০: ৪৩৬) তাই তাঁর পক্ষে সৃজনপ্রয়াস উচ্চকিত হয় এভাবে: রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা/ ভরা নদী ক্ষুরধারা/ খরপরশা/ কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।' (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৮০: ৪৩৭)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) সংঘটিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যকার টানাপোড়েনের কারণে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, একপক্ষ হেরেছে, অন্যপক্ষ বিজয়ী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো পক্ষই জেতেনি। কারণ, এর অভিঘাতে আক্রান্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে থাকা ভারতীয় উপমহাদেশও একটা পক্ষের অংশ ছিল। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এর কুফল ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের মধ্যে কৃষক-শ্রমিক, বিশেষ করে দৈনিক কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে অতিবাহিত হয় যাদের সংসার এবং নিত্যশ্রমের ভিত্তিতে সচল থাকে যাদের জীবন ও জীবিকার চাকা, তাদের ওপর নেমে এসেছিল অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। এসব চিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সেই সময়ের শিল্পী-কবিদের সংগ্রামী সৃষ্টিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *বলাকা* (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থের কবিতায়ও তার ঝাঁজ উপলব্ধি করা যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতায়, বিশেষ করে *পুনশ্চ*

(১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় সাধারণ মানুষের জীবনের চালচিত্র। ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে থাকা ব্রিটিশ ভারতের বাংলাভাষী অন্য কবিদের মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবনে সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ কবিতা রচনার ধরনে পরিবর্তন ঘটেছে। কখনো চেতনাগত রূপান্তরের কারণে, কখনো তা ঘটেছে সময়ের চাহিদা মেটানোর জন্য। আমৃত্যু তিনি নিজের সামর্থ্যকে অতিক্রম করে গেছেন সৃষ্টির বিচিত্রপথে সাধনা করে। তবে তিনি কখনো যুগের দাবি থেকে পিছিয়ে পড়েননি। রবীন্দ্র-উত্তর বলে দাবিদার ত্রিশের দশকের 'আধুনিক' কবিরা রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অনাধুনিক বা সেকেলে বলে বাতিল করতে চেয়েছেন। কিন্তু সতত রূপান্তরশীল রবীন্দ্রপ্রতিভা ওই সব সমালোচকের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ক্রম-উত্তরণের ধারায় নিয়োজিত থেকেছেন। এ সময় তাঁর কবিতার নির্মাণকৌশল যেমন আধুনিক হয়ে ওঠে, তেমনি তাঁর কবিতার বিষয়ও হয়ে ওঠে সাধারণ জীবন। তবে অনুকূল সময়ে 'আধুনিক' কবিদের কেউ কেউ আবার নিজেদের লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে 'দু-এক ছত্র সার্টিফিকেট পাবার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।' (সমর; ১৯৭৮: ৩০)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়সের ভারে শারীরিকভাবে অসুস্থ হন যে-সময়টায়, ঠিক সেই সময়েই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ক্রমশ মুখোমুখি অগ্রসর হচ্ছিল। এই আন্তর্জাতিক সংকট শঙ্কিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। যুদ্ধ শুরু হলে আঞ্চলিক ও বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে পড়বে, এ ধারণা লালন করতেন তিনি। সেই সময় শঙ্কাকুল ক্লান্ত শরীর অতি অবসন্ন মন নিয়ে কবি *প্রান্তিক* (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ রচনা করেন। এতে সন্নিবদ্ধ হয় কবির ক্ষোভ, হতাশা ও আহ্বান। তাই তিনি সমাজবদল ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পেশাজীবীর কথা না বললেও সাধারণ মানুষের প্রতি সংগ্রামের ডাক দেন। ফলে তাঁর বেশ কিছু কবিতায় ঠাঁই পায় সাধারণ মানুষ। যেমন:

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।
(রবীন্দ্রনাথ; ২০১১: ১২০)

শ্রমজীবী মানুষ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির অংশ। সমাজের সবচেয়ে সাধারণ সারির মানুষও তারাই। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পেশাজীবীর কথা না বললেও সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণির

কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারা সমাজে যে অবহেলিত, কোথাও মর্যাদাশীল নয়, সেটা *সেঁজুতি* (১৯৩৮) কাব্যের কবিতার শব্দে ধারণ করেছেন তিনি; 'সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,/ সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই' বলে :

দিন নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালো মন্দের কোনো জঞ্জাল ;
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।

(রবীন্দ্রনাথ; ২০১১: ১৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ দশকের কবিতায় সরাসরি শ্রমজীবন এসেছে। নতুন এ কাব্যরীতিতে প্রোথিত হয় কবির নতুন জীবনবোধ। বলা যায়, এসব কবিতার ধারাবাহিকতায় এ-কাব্যগ্রন্থের "নতুনকাল"-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনির্দিষ্টভাবে চাষি ও জেলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নেতৃত্বের মোড়লিপনার সমাপ্তি আশা করেছেন তিনি। যেমন :

গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে।
হারত যে তার ঘুচত পাড়ায় বাস,
ভিটেয় চলত চাষ।...
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনি,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।
শান্ত প্রভাতকালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে।...

(রবীন্দ্রনাথ; ২০১১: ১৩৯)

সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থের বহুল পঠিত "পরিচয়" কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন করে নিজেকে চেনানোর যে চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাজের সাধারণ বা শ্রমজীবী মানুষের আত্মপরিচয়। এ-কবিতায় তিনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বেশির ভাগ মানুষের একজন প্রতিনিধি হওয়ার আকুতি ব্যক্ত করেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার, তাদের একজন হওয়ার তুমুল তৃষ্ণা না থাকলে তিনি কোনোভাবেই বলতে পারতেন না :

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

(রবীন্দ্রনাথ; ২০১১: ১৪৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ দশকে সাধারণ মানুষ ও সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। তিনি যত জীবনসায়াহ্নের দিকে পৌঁছেছেন, সাধারণ বা খেটে খাওয়া মানুষ সম্পর্কে তাঁর অনুধাবন-অভিজ্ঞতায় নতুনত্ব এসেছে। শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে ধারণার এই পরিবর্তনের কথা অকপটে স্বীকার করতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি বলেছেন :

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।...
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।...
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

(রবীন্দ্রনাথ; ২০১১ : ৪২)

১৯৪১ সালে প্রকাশিত *জন্মদিনে* কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতায় (কবিতাটি 'ঐকতান' নামেও পরিচিত) দেখা যাচ্ছে শ্রমজীবী, বিশেষ করে কৃষকের প্রতি কবির অসীম দরদ। চাষিকে তিনি কবি বলেছেন। কবি মনে করেছেন, তাদের কাছে শেখার আছে অনেক কিছু। কারণ, চাষির যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাঁতির যে প্রায়োগিক জ্ঞান, সেই জ্ঞান তো অন্য কোনো পেশাজীবীর নেই। তাই বাস্তবতার নিরিখে কবি উপলব্ধি করছেন, তিনি কবিতা লিখছেন, কিন্তু তার শিল্পসক্ষমতার প্রভাব তো সবার কাছে পৌঁছে না। কিন্তু কৃষকের সৃষ্ট 'শিল্পের' অংশীজন সবাই। পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান

চর্চার আরও ক্ষেত্র আছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য আবশ্যকীয় এবং মানবজীবনে চলার পথে অপরিহার্য। কৃষকের জ্ঞানও তেমনি অপরিহার্য। সুতরাং, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে' কবি অকপটে নিজের সেই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলেছেন :

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।...
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

(রবীন্দ্রনাথ; ২০১১: ৬৫)

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *পত্রপুট* কাব্যের দীর্ঘ এক কবিতায় শ্রমজীবী অর্থাৎ সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে কবি নিজেকে শামিল করেছেন। তিনি নিজেকে তাদের সমকক্ষ ভেবেছেন, তাদের বঞ্চনা ও অধিকারহীনতাকে উপলব্ধি করেছেন। সমাজ বা সমাজের উঁচুস্তরের বাসিন্দাদের জীবন সচল থাকে যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রমে-ঘামে, তাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সব কবিতা রচনাকালে উপমহাদেশের রাজনীতি ছিল তুমুলভাবে বিভাজিত। রাষ্ট্র ছিল পরাধীন—ব্রিটিশদের অন্যতম উপনিবেশ। এর মধ্যে সবচেয়ে বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার ছিল এই শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা মূলত প্রতিমাশিল্পী। ধর্মীয় বিভাজনকে তুচ্ছ করে, ধর্ম-ব্যবসায়ীদের স্বরূপ উন্মোচন করে মানবতাকে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছেন কবি :

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে...
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

(রবীন্দ্রনাথ; ১৯৮৩: ৩৭২)

রবীন্দ্র-কাব্যের এই ধারা বিস্তৃত আছে *জন্মদিনে* (১৯৪১) কাব্যের পূর্বপর্যন্ত। *পুনশ্চ*-র 'প্রথম পূজা'র বিষয় একদিকে একজন প্রতিমাশিল্পী, যিনি সুবিধাবঞ্চিত একটা গোত্রের প্রতিনিধি এবং সমাজে ব্রাত্য ও অবহেলিত; অন্যদিকে সমাজের উঁচুস্তরের একজন প্রতিনিধি, যিনি সমাজপতি ও সমাজের নিয়ন্ত্রক। অবিকল্প সেই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মাধবের ভূমিকা ছাড়া পূজামণ্ডপ নির্মাণ সম্ভব নয়। অথচ দেবতাকে পূজা করার কিংবা তা দর্শনের অধিকার নেই 'মাধবের' গোত্রভুক্ত মানুষদের। তাই চোখ বেঁধে করতে হয় প্রতিমানির্মাণের কাজ। কাজ শেষ হলে প্রতিমাশিল্পীর জীবনের যবনিকাপাত ঘটান 'রাজা'। এভাবেই সমাজে চলেছে নিম্নশ্রেণির প্রতি বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন। এ-কাব্যেরই আরেকটি কবিতা "ছেলেটা"। এক দুরন্ত এবং সবকিছুতে আগ্রহী ও উৎসুক এক বালকের কথা বলতে গিয়ে জেলেদের নৌকা ও রাখালদের গরু চরানোর প্রসঙ্গ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেটির সব সময় 'কী আছে দেখিই-না' ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

রবীন্দ্র-কবিতায় এমন স্পষ্ট মানবিক বোধ এবং নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় ১৯৩০ সালে রাশিয়া সফরের পর থেকে। একই বছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য রিলিজিয়ন অব ম্যান' শিরোনামে হিবার্ট লেকচারের পরও তাঁর কবিতায় একধরনের বাঁকবদল ঘটে। কেননা, ওই বক্তৃতার মূল বিষয়ই ছিল মানবধর্ম। এরই ধারাবাহিকতায় *রথের রশি* (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) নাটকে নিম্নবর্গীয় মানুষের জয় দেখানো হয়। আর *পুনশ্চ*-তে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের প্রকৃত-স্বরূপ। *শেষসপ্তক* (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), *পত্রপুট* (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), *শ্যামলী* (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থেও এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল। এভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের ঋতু ও রীতি বদল নতুন নয়। তবে এবারের বদলটি কবিতার শরীর গঠনের দিক থেকে চোখে পড়ার মতো। বিষয়টি আধুনিক কাব্যানুরাগীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এ-বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন :

> স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে, কবি মনে করিতেছেন, এতদিন তিনি যাহাদের গান গাহিয়াছেন তাহারা বৃহত্তর জনসাধারণের পর্যায়ভুক্ত নয়, যে-রীতি ও ভাষায় গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন সে রীতি এবং ভাষাও জনগণের মুখের ভাষা ও কথার রীতি নয়। অথচ নূতন কাল ত তাহাদেরই। সুতরাং, আজ যদি কাহারও বুকের কথা কবিতায় গাঁথিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের কথাই বলিতে হইবে তাহাদেরই মুখের ভাষায় ও কথার রীতিতে। কাজেই এ-যুগের কবিতা হইবে সমস্ত কারুকৌশলে বর্জিত, নিরলংকার, বিরল সৌষ্ঠব, অযত্ন গঠিত, সহজ, সরল, আচারমুক্ত।...'পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী' এই চারিটি গ্রন্থে রীতির পরিবর্তন যে ঘটিয়াছে, এবং ঋতু পরিবর্তনও যে এই গ্রন্থ ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্ট, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। (নীহাররঞ্জন; ১৩৬৯: ১৯৯)

রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ে কাব্যবুনন ও বিষয়ের এই অভিনবত্ব তাঁকে যুগের আরও সমীপবর্তী করেছিল। ফলে জনগণের সাধারণ জীবন-যাত্রার কিংবা সাধারণ গৃহস্থপাড়ার ভাষা কেবল নয়, তাঁর মনন-কল্পনা আশ্রয় করেছে বৃহত্তর জনমানসেও, পরিবর্তিত সময়ের নতুন সমাজ-চেতনাকে। দৃষ্টিভঙ্গির এই অভিনবত্ব *পুনশ্চ*কে আলাদা মাত্রায় উন্নীত করেছে। (নীহাররঞ্জন; ১৩৬৯ : ১৯৮)

দুই

আবির্ভাবকাল থেকে সোচ্চার কণ্ঠ ছিল কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬)। কমিউনিস্ট না-হয়েও তাঁর হাতেই নির্মিত হয় কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদী চিন্তার বলয়-বহির্ভূত স্বকীয় এক সাম্যবাদী চেতনার কবিতা। দ্রোহ-চেতনা দিয়ে কাব্যাভিযাত্রা আরম্ভ করলেও মানবপ্রেম ও সাম্যবাদী চেতনাই নজরুলের সৃষ্টির মৌল চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলের মানুষের পরাধীন জীবন নিয়ে শাসককুলের বিরুদ্ধে যেমন তিনি সরব ছিলেন, তেমনি রাজনীতি, ধর্মীয় ভেদাভেদ, সমাজের উঁচু-নিচুর বৈষম্য, নারীপুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ সক্রিয় ছিল। তাঁর সৃষ্টির মূলে যে স্বনিরূপিত সাম্যবাদী মনোভাব, তার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) কাব্যের 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস'; *সাম্যবাদী* (১৯২৫) কাব্যের 'কুলি-মজুর', 'সাম্যবাদী', 'মানুষ', 'নারী', 'ঈশ্বর', *সর্বহারা* (১৯২৬) কাব্যের 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরের গান' প্রভৃতি কালজয়ী কবিতা।

রবীন্দ্রযুগের প্রবল প্রতাপের মধ্যেও নজরুলপ্রতিভা তার সামর্থ্য নিয়ে স্বতন্ত্র মহিমার উপস্থিত হয় বাংলা কবিতার মহাসড়কে। শুধু তা-ই নয়, নতুন কবি হিসেবে আবির্ভাবকালেই তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বয়সের বড় ব্যবধান সত্ত্বেও দুজন কবিই নিজেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়—বিশ ও ত্রিশের দশকে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন। অবশ্য পরে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লেখার ধাঁচ ও ধারারও পরিবর্তন ঘটেছে; পরিবর্তন ঘটেছে বিষয় ও নির্মাণকৌশলেরও। আবার এ সময় রবীন্দ্রযুগ-পরবর্তী লেখক গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত ত্রিশের দশকের কবিগণও আবির্ভূত হন। যাঁদের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তর-সামরিক পশ্চিমি-আধুনিকতা। আমাদের সময় ও সমাজ প্রস্তুত না থাকলেও পশ্চিমি সাহিত্য অধ্যয়নের সুবাদে তাঁরা সেই নঞর্থক আধুনিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে এ সময়ের বেশির ভাগ কবির কবিতায় স্বদেশী সমকাল ও সমাজকে খুঁজে পাওয়া ভার। অবশ্য তাঁদের সামনে বিকল্প খুব বেশি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের তাপে পুড়ে অঙ্গার হওয়ার চেয়ে তাঁরা বাংলা কবিতায় আধুনিকতা বা নতুনত্ব আনয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। ত্রিশের কবিদের এই

প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার গঠনশৈলীর ক্ষেত্রেও আধুনিকতা যুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ত্রিশের দশকের কবিতাসহ ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে আবির্ভূত কবিদের কবিতায় কৃষক ও শ্রমিকের জীবন কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে এসেছে, তার চুম্বক বিশ্লেষণই আমাদের এ-পর্বের উদ্দেশ্য। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবগুণেই শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। সমাজে চলমান বৈষম্য তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। রাষ্ট্র ও সমাজসৃষ্ট যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। মানুষের প্রতি অবিচার, অন্যায়ের নানা চিত্র তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এর মূলে ছিল সাম্যবাদী চেতনা। তিনি কার্ল মার্ক্সের সূত্রাবদ্ধ সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী অনেকে তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ মুজফ্ফর আহ্মদ (১৮৮৯-১৯৭৩) ছিলেন অন্যতম। মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন সেই তরুণ গোষ্ঠীর একজন, যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪), এস এ ডাঙ্গে প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সহচর—যাঁরা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির আগ্রহে ভারতীয় তরুণদের মধ্যে মার্ক্সীয় চেতনা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নজরুল মুজফ্ফর আহমদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলেন এবং তারই সুবাদে সাম্যবাদী চেতনাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তবে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের ঘনিষ্ঠজন হয়েও নজরুল ছিলেন রোমান্টিক। ফলে মার্ক্সের সাম্যবাদ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আরেক উপায় হিসেবে। (সুমিতা; ২০১৬: ৩১) হয়তো সে-কারণেই তাঁর সাম্যবাদ কেবল অর্থনৈতিক সমতার মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল না; তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। শৈশব থেকে লালিত তাঁর কবিপ্রতিভা বিকশিত হতে থাকে ব্রিটিশশাসিত ঔপনিবেশিক পরিবেশে। সমাজের উঁচু-নিচুর ভেদাভেদহীনতার পাশাপাশি তাঁর প্রত্যাশা ছিল ধর্মীয় সাম্য, নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এই সুবাদেই সম্ভব হয়েছিল *অগ্নি-বীণা*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*র মতো কাব্যগ্রন্থ। নজরুলের প্রতিবাদী কবিতা ও সাম্যবাদী চেতনার কবিতাবলি রচিত হয়েছিল ত্রিশের দশক শুরুর আগে। তিনি কৃষক, শ্রমিক বা কুলি-মজুর প্রভৃতি পেশাজীবীদের প্রতি, প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনের কবলে পড়ে বঞ্চিত মানুষের প্রতি অসীম দরদের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তাঁর ওই সময়ের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলের মানুষের পরাধীন জীবন নিয়ে শাসককুলের বিরুদ্ধে যেমন তিনি সরব ছিলেন, তেমনি রাজনীতি, ধর্মীয় ভেদাভেদ, সমাজের উঁচু-নিচুর বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ সক্রিয় ছিল। কবিতা লেখা এবং রাজনৈতিক সংস্রবের কারণে গোটা বিশের দশকে ব্রিটিশ শাসকের রোষানলে পড়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতা রচনায় মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে কারাবন্দী (১৯২৩) থাকতে হয়েছে তাঁকে। ত্রিশের দশকে অবশ্য

কাব্যচর্চার আপসহীন সেই ধারা আর অব্যাহত থাকেনি। বদলে যায় তাঁর কাব্যবুননের বিষয়-আশয়। অথচ ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকেও তাঁর মন ছিল কৃষক-শ্রমিকের জন্য নিবেদিত। এ-বছরের জানুয়ারিতে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি সাম্যবাদী চিন্তার সামাজিক প্রয়োগ ঘটাতে মাত্র বছরখানেক আগে তিনি গঠন করেছিলেন 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন প্রণালী' এবং প্রকাশ করেন *লাঙল* (১৯২৫) পত্রিকা। (আতাউর; ১৯৭৪: ২৪-২৫) জমি কর্ষণের জন্য কৃষকের প্রাচীনতম অবলম্বন 'লাঙল'। পত্রিকার নাম হিসেবে 'লাঙল'কে বেছে নেওয়ায় কৃষি, কৃষক তথা মাটির নিকটবর্তী পেশাজীবীর প্রতি কবির বিশেষ পক্ষপাতিত্বই পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ত্রিশের দশকের পর তাঁর সৃষ্টিজীবনের ঘটে বড় ধরনের বাঁকবদল। ফলে এ-সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের গানসহ গজল রচনা এবং অনুবাদ কাজে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন।

১৯৩০ সালের পর শুরু থেকে সেই প্রতিবাদ ও সাম্যবাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর একধরনের রূপান্তর লক্ষ করা যায়। এ-সময় একদিকে গান, আরেকদিকে কবিতা ছিল তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার প্রায় পুরোটা জুড়ে। এই 'দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মতো একই নজরুল বিভক্ত ছিলেন দু ভাগে—কবি নজরুল, আর সংগীতকার নজরুল। এতোদিন জীবন-নাট্যে তিনি কবিতার "সাজপোশাক" পরে কখনো বিদ্রোহী, কখনো প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন; এবারে পোশাক বদলে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন গীতিকার আর সুরকারের ভূমিকায়।' (মুরশিদ; ২০১৮: ২৬৬) সত্যিকার অর্থে কবির এই প্রবণতা শুরু হয় ১৯২৬ সাল থেকেই। সুনির্দিষ্ট করে বললে '১৯২৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত যে-রাজনীতি-পাগল নজরুলকে দেখতে পাই, ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে এসে সেই নজরুল চিরতরে যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে যান। তার জায়গায় দেখা দিলেন এক রোম্যান্টিক নজরুল।' (মুরশিদ; ২০১৮: ২৭৪) অথচ এই বছরের গোড়ার দিকেও তাঁর মন ছিল কৃষক-শ্রমিকের জন্য নিবেদিত। না হলে জানুয়ারিতে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিতেন না।

অন্যদিকে নজরুল তাঁর পুত্র বুলবুলের আকস্মিক মৃত্যুতে (৭ মে ১৯৩০) শোকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রশোক এত প্রবল যে, এরপর তিনি গভীর অধ্যাত্ম সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। যোগসাধনাও শুরু করেছিলেন তিনি। এ-সময়ে রচিত গানে অধ্যাত্ম-চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (মাহবুবুল; ২০১০: ১৬৪) পুত্রশোকে কাতর ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নজরুলের ছিল অর্থনৈতিক সংকটও। ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ের রচনাসমূহে সেই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার

প্রতিফলন ঘটে। তাই পুত্রশোকই হয়তো তাঁর সাহিত্যের প্রবণতা বদলে যাওয়ার অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক কবি জসীম্‌উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। পল্লিকবি নামে তাঁর অধিক পরিচিতি। বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহার্য অনুষঙ্গ, কৃষি, কৃষক, সাধারণ মানুষ, গ্রাম, প্রকৃতি প্রভৃতিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে কবিতা নির্মাণ করেছেন তিনি। বাংলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ও গ্রামীণ সংস্কৃতির আদ্যোপান্ত পাওয়া যায় তাঁর রচিত গান, গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত অবস্থায় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক হিসেবে।

ছাত্রজীবনে প্রকাশিত "কবর" কবিতার জন্য প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন জসীম্‌উদ্‌দীন। কাজী নজরুল ইসলামের মতো কবি জসীমউদ্‌দীনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা ও সৃষ্টিকর্মের পূর্ণ বিকশিত সময়ে বাংলা কবিতার মহাসসড়কে আবির্ভূত হন। কোনো গোষ্ঠী বা কোনো দলভুক্ত না হয়েও কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীন টিকে যান কাব্যবুনন কৌশলের স্বকীয়তা ও বিষয়-তাৎপর্যের জোরে।

জসীমউদ্‌দীনের সাফল্য আসে বাংলার আবহমান রূপ ও প্রকৃতিকে নতুন ভাষায় ধরে রাখার অসামান্য কৌশলে। এ-সময়েই রবীন্দ্র-প্রতিভাকে চ্যালেঞ্জ করে আবির্ভূত পাশ্চাত্য জ্ঞানে শিক্ষিত ত্রিশের কবিকূল হিসেবে প্রতিষ্ঠাকামী আধুনিক কবিরাও মুখর ছিলেন কবিতা রচনায়। ওই ডামাডোলে স্বতন্ত্রধারার কবি জসীমউদ্‌দীন টিকে যান দোর্দণ্ডপ্রতাপে। জসীমউদ্‌দীন তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কল্লোলের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) আসরে যোগ দিয়েও কবি তাঁর স্বকীয় গ্রামনির্ভর জীবনচেতনাকে আগলে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রাতিস্বিক কাব্যভাষায় ভাস্বর হয়ে ওঠে গ্রাম-জীবনভিত্তিক সাধারণ মানুষের কথা। (সুনীল; ১৯৮৩: ৮) ফলে 'রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের যে সাধনায় আধুনিক কবিরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গলদঘর্ম হয়েছেন, জসীমউদ্‌দীন তাতে প্রায় অনায়াস সাফল্য লাভ করেছিলেন।' (সুনীল; ১৯৮৩: ৯) অন্যভাবেও বলা যায়, ত্রিশের কবিদের সমবয়সী কবি পরিশীলিত জীবনচৈতন্যের অধিকারী হয়েও যে গ্রামের দিকে মুখ ফেরালেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। আরও উল্লেখযোগ্য যে, *কল্লোল* পত্রিকায় একাধিক কবিতা লিখলেও তিনি নাগরিক জটিলতা পরিহার করতে সক্ষম হলেন। (অনীক; ১৯৯৫: ৯) কিন্তু আধুনিক এই যুগ-জীবনে নগরায়ণের প্রসার ও আধুনিক জীবনানুষঙ্গ এক দুর্লঙ্ঘ্যনীয় জীবনবাস্তবতার নাম। তাই একুশ শতকের নতুন প্রজন্মের কাছে জসীমউদ্‌দীনের উপযোগিতা হয়তো অনেকাংশেই হ্রাস

পাচ্ছে। তবে যত দিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি টিকে থাকবে, তত দিন গ্রাম, গ্রামের সংস্কৃতি, গ্রামের আবহমান জীবন ও প্রাত্যহিকতাকে খুঁজতে গেলে জসীমউদ্‌দীনের কাব্য অবিকল্প অবলম্বন হয়ে চিরঞ্জীব থাকবে।

বিশের দশকে প্রকাশিত হয় জসীমউদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থ *রাখালী* (১৯২৭) ও *নক্‌সী-কাঁথার মাঠ* (১৯২৯) এবং ত্রিশের দশকে প্রকাশিত হয় *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৩) ও *রঙিলা নায়ের মাঝি* (১৯৩৫)। *রঙিলা নায়ের মাঝি* মূলত জসীমউদ্‌দীন রচিত ও সংগৃহীত গানের সংকলন। *সোজন বাদিয়ার ঘাট* মূলত কাহিনিকাব্য। এখানে শ্রমজীবনের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রামের কৃষিজীবীদের উপস্থিতি দেখা যায়। এ-কাব্য বুননের উদ্দেশ্যই সম্ভবত হিন্দু-মুসলিম চাষিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে চিত্রিত করা। প্রেম-কাহিনি হয়েও এটি বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান চাষি সমাজের এক নিখুঁত দলিল। (সুনীল; ১৯৮৩: ১৬৬) তাই এখানে কৃষক বা কৃষিজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষা কিংবা তাঁদের অধিকারের বিষয় চিহ্নিত করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না।

সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্যগ্রন্থের প্রধান চরিত্র সোজনকে বিশেষ পরিস্থিতিতে ভিন্ন পেশা বেছে নিতে হয়। নিজ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ‘কুঠার’ নিয়ে কাঠ ‘ফাড়িবার’ জন্য ঘর থেকে বের হতে হয়। পাওয়া যায় ‘বেদে’ জনগোষ্ঠীর কথাও: ‘মধুমতী নদী দিয়া,/ বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে কূলে ঢেউ আছাড়িয়া।’ (জসীমউদ্‌দীন; ১৯৬১: ১৬৩) এর বাইরে তেমন কোনো পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কবির বিশের দশকের রচনায় কৃষি, কৃষকের পাশাপাশি অন্যান্য পেশাজীবীর প্রসঙ্গ নানা অনুষঙ্গে চিত্রিত হলেও ত্রিশের দশকে রচিত *সোজন বাদিয়ার ঘাট* কাব্যে কৃষিজীবী বা কৃষক এবং বেদে সম্প্রদায়ের বাইরে তেমন কোনো শ্রমজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তিন

ত্রিশের দশকে আবির্ভূত নতুন কবিরা ভিন্ন জীবনাদর্শ ও কাব্যভাষা নিয়ে হাজির হন পাঠকের সামনে। এ-সময়ের কবিদের কবিতা বিশ্লেষণে দুটো ধারা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। একটি ইতস্তত দায়বদ্ধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, অন্যটি কলাকৈবল্যবাদী ধারা। দুটি ধারাই পাশ্চাত্য-প্রভাবিত। এ-পর্বের কবিতায় মূলত ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের ভাবধারার প্রভাব প্রকটভাবে প্রতীয়মান হয়। কারও কারও কবিতায় প্রতিফলিত হয় শব্দ-মাহাত্ম্যের মুগ্ধতা। এই সব প্রবণতা নিয়েই তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ‘আধুনিক কবি’ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সেই আধুনিকতার বেশকিছু

যুগচিহ্ন বা লক্ষণ বহন করে তাঁরা কবিতা রচনা করেন। বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতার সেই লক্ষণসমূহ নিয়ে সামগ্রিকভাবে বলেছেন, 'একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম, আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।' (বুদ্ধদেব; ১৯৬৩: আট) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি হলেও এসব ধারা বা লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন কবিতে স্পষ্টই লক্ষণীয়। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও একটা আলোড়ন তুলেছিলেন ত্রিশের কবিগণ। ত্রিশের প্রধান কবিকুল—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে পঞ্চপাণ্ডব নামে অভিহিত। এ সময়ের কবিদের সমসাময়িক প্রেমেন্দ্র মিত্রের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য।

ত্রিশের দশকের কবিদের মধ্যে কেবল জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতাতেই বাংলার মানুষ ও বাংলার প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায়। সহজেই বোঝা যায়, কবিতার শরীরে তিনি পশ্চিমী কাব্যকৌশলের প্রয়োগ ঘটালেও তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে বাংলার সমুদয় চিত্র। এখানেই এ-সময়ের কবিদের চেয়ে তাঁর ভিন্নতা। তার প্রাসঙ্গিক কারণ সম্ভবত এ রকম: জীবননান্দ দাশের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বেশির ভাগেরই শৈশব-কৈশোর-যৌবনকাল কেটেছে সেই সময়ের প্রধান নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। আর জীবনানন্দ দাশের বেড়ে ওঠা তৎকালীন পূর্ব বাংলার বরিশাল অঞ্চলে। সে-কারণেই 'গ্রামে ঘেরা ছোটো শহর বরিশালের বাসিন্দা জীবনানন্দ ছিলেন ব্যতিক্রম।' (অশ্রুকুমার; ২০০০: ৬০) তাঁর নিসর্গ-প্রকৃতি ও মাটিনিবিষ্ট মনন গঠনের প্রমাণ পাওয়া তাঁর কবিতা 'মাঠের গল্প'তে :

মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে—এমনি সে তাকায়েছে কত রাত—নাই লেখাজোখা।
মেঠো চাঁদ বলে:
আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে, ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে—চলে গেছে কবে!—
শস্য ফলিয়া গেছে তুমি কেন তবে

(জীবনানন্দ; ২০০২: ৬১-৬২)

কবিতাটির পরের অংশেই আছে 'প্রথম ফসল গেছে ঘরে/ হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে/ শুধু শিশিরের জল;/ অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে...ধানক্ষেতে—মাঠে।' (জীবনানন্দ; ২০০২: ৬২) সাধারণ পাঠকের কাছে বাংলার চির রূপময় নাম 'রূপসী বাংলা'র কবি হিসেবে পরিচিত জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতি ও রূপ বর্ণনায় যতটা আন্তরিক, ততটা মনোযোগী নন কৃষক বা শ্রমিকের সংগ্রামী জীবনের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলতে। কৃষকের বা শ্রমিকের প্রসঙ্গও কবি আলাদা করে কবিতার শরীরে গাঁথতে চাননি। তবে বাংলার প্রকৃতি, সমৃদ্ধি কিংবা রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে কৃষকের কথা। কৃষকের সংগ্রাম, কৃষকের দুঃখ-কষ্ট লাঘব কিংবা কৃষকের কল্যাণ কামনা করেছেন এমনটিও পাওয়া যায় না তাঁর কবিতায়। কবি নিজের কাব্যকৌশলকে সফল করতে গিয়েই কৃষক, হেমন্তের ফসল, ধানক্ষেত, চাষা প্রভৃতি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করেছেন। কৃষকের কর্মকাণ্ড যে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত, সে-বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। যেমন কবি 'কার্তিক মাসে চাঁদ' কবিতায় বলেছেন :

নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চার দিকে,
শস্যের ক্ষেত চেষে চেষে
গেছে চাষা চ'লে;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে
অনেক তবুও থাকে বাকি—
তুমি জানো—এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি!

(জীবনানন্দ; ২০০২: ৬৪)

জীবনানন্দ দাশ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) ও *রূপসী বাংলা* (রচনাকাল: ১৯৩৪; প্রকাশকাল: ১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থে কৃষক, কৃষি, ফসল, কৃষকের জন্য আনন্দময় ঋতু হেমন্ত, নবান্ন উৎসব প্রভৃতি অনুষঙ্গের ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন, তিনি আদ্যোপান্ত বাঙালি কবি। তা না হলে বাঙালির সমৃদ্ধি ও অর্জন সম্ভব হয় যে ধানক্ষেত, কৃষক, শস্যের ওপর নির্ভর করে, তার চিত্র এত অকৃত্রিমভাবে উঠে আসত না। মানবজীবনের প্রেম-বিরহ-বিচ্ছেদ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ তাঁর কবিতায় অনেক নেতিবাচক বিষয় স্থান পেলেও এ কথা সত্যি, 'কেবলমাত্র হেমন্তের অনুষঙ্গ অন্তত বাংলাদেশে কিছুতেই বিষণ্নতাবাচক নয়। হেমন্তের অনুষঙ্গে ফসল তোলার আশা-আনন্দই বাঙালি কৃষকের মন জড়িত।...আর গভীরতর অর্থে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে ক্রমশই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জীবনানন্দ মানুষের বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের কবি।' (সরোজ; ২০০৮: ১৫৬)

বহুল পঠিত 'বোধ' কবিতায় কৃষক, জেলে, মাঝি প্রভৃতি শ্রমজীবনের সঙ্গে লীন হয়ে নিজেকে আত্মত্যাগী মানবিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। 'চাষিদের জীবন',

'মেছোদের জীবন' যে কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, সেই উপলব্ধি পাওয়া যায় এ কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তির শরীরে :

হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানি নি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁষটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;

(জীবনানন্দ; ২০০২: ৭৯)

এই কবিতার চেয়ে ইতিবাচক ও আশাবাদ পরিলক্ষিত হয় 'অবসরের গান' কবিতায়। যদি উপযুক্ত শ্রমের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত ফসল ফলে, তবে 'ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ;/ রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।' (জীবনানন্দ; ২০০২: ৮১) *রূপসী বাংলা* কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কৃষিনির্ভর সমৃদ্ধশালী এক সমাজের কথা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তুলে এনেছেন কবি। কবি 'কার্তিকের নবান্ন', 'ক্ষেতে ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরীর ধান', 'কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত', 'কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালি ধান' প্রভৃতি শব বা শব্দবন্ধ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বাংলার সমৃদ্ধ অতীতকে সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা ভেবে হয়তো উদ্বেগ-আশঙ্কায় ম্লান হতে যাচ্ছিল কবির মানবিক অনুভূতি। উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, তালশাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ—ধোঁয়াভরা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব—অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত।

(জীবনানন্দ; ২০০২: ১৩৬)

ত্রিশের দশকের অস্থিতিশীল বিশ্ব পরিস্থিতির যে প্রভাব পড়েছিল এই বাংলায়, তারই যেন প্রতিরূপ স্থান পেয়েছে উপর্যুক্ত কাব্যভাষায়। এ-সময়ের সফল কবিদের একজন অমিয় চক্রবর্তীও (১৯০১-১৯৮৬)। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য। তাঁর কাব্যাদর্শ ছিল মানবতাবাদী। কেউ কেউ তাঁর কবিমানসকে ত্রিশের অন্য কবিদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত বলেছেন।

(দীপ্তি; ১৯৮৪: ২৭৫) জ্ঞান-পিপাসা মেটাতে গবেষণা ও পেশাগত কাজে বিশ্বভ্রমণ করেছেন তিনি; ছিলেন এক ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক। অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বের রূপ-রং-রস আহরণ করেছেন এবং বিশ্বনাগরিককে দেখেছেন অভিন্ন সংসারের বাসিন্দা হিসেবে। কখনো রাজনীতির অংশীদার হতে চাননি। কিন্তু গৃহের প্রতি ছিল তাঁর অভাবনীয় আকর্ষণ; ধূলিমলিন মৃত্তিকার প্রতিও ছিল দুর্নিবার মমতা। মাটির আকর্ষণই তাঁকে বারবার ঘরমুখো করেছে—মিলিয়ে দিয়েছে বিশ্বের সঙ্গে নিজের সংসার। (গৈরিকা; ২০০৫: ৬৯) তাই হয়তো সরাসরি কৃষক বা শ্রমজীবনকে তিনি শিল্প সৃষ্টি মাধ্যম হিসেবে ধারণ করেননি। তবুও ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *খসড়া* কাব্যে ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রতীকায়িত হতে দেখা যায় কৃষি, কৃষক ও ফসলের অনুষঙ্গ। যেমন :

আকাশের জল; আল-দেওয়া খণ্ড মাঠে
রৌদ্রবলয় ঘিরল একদা কাঁচা শস্য, সোনার থাল—
ভরা-পাকা ধান; হলুদ সর্ষে। কাজ, কত লোকের,
যুগের চেষ্টা জড়ানো আমার দুপুর-ভরা কাজ।
অকেজো মাসে গরু চরেছে মাঠে, দেখে বাঁকের
আলপথে লোক চলেছে, দূর মন্দিরের উঠেছে ধ্বজ।

(অমিয়; ১৯৫৫: ১৩)

বিভিন্ন ভাষার কাব্যরসে মুগ্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ছিলেন অত্যধিক কলাকৈবল্যবাদী। ফরাসি কবি মালার্মের মতো কবিতায় শব্দের আধিপত্যে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। প্রেম-মানবপ্রকৃতি ইত্যাদির রূপায়ণ তাঁর কবিতার মূল কথা। বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল। বাল্যশিক্ষা হয়েছিল কাশীতে—সংস্কৃত ও ইংরেজিতে। (সূত্রঃ বুদ্ধদেব; ২০১০: ৭) সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করলেও সাধারণ বা খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছে অল্প। কেননা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ওপর প্রভাব পড়েছিল তাঁর নানাবাড়ির আভিজাত্যের। সেখানে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে শহুরে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটেছিল। ভারতীয় নগর-সংস্কৃতি ও পশ্চিমী আভিজাত্যের জীবনাচার তাঁকে ঠিক সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ দেয়নি। তিনি চালচলন ও আচার-ব্যবহারে ছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার সঙ্গে নিজের সমন্বয়-প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন আন্তরিক। (সিদ্দিকা; ১৯৯২: ১৭) সে-কারণেই বাঙালির শ্রমজীবন তাঁকে তেমনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। কলকাতা নগরজীবনে অভ্যস্ত ছিলেন বলে কবি আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ও গ্রামীণ জীবন এবং কৃষি ও কৃষকীজবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই এই মন্তব্যও তাঁর ক্ষেত্রে যথার্থ, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের

আর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী।' (দীপ্তি; ১৯৮৪: ১৭৪) ফলে জীবনের শেষ পর্যন্ত কবি তাঁর কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারায় নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছেন।

আর বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) পূর্বাপর পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের মুগ্ধ ও অনুরাগী। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়ে তিনি পশ্চিমা ভাবাদর্শ-নির্ভর চেতনায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। জনতা বা জাগরণের বিপরীতে তিনিও প্রেম, নারী ও অনুরূপ বিষয় নিয়ে কবিতার প্রাকরণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হন। তাঁর বোদলেয়ার-প্রীতি কিংবদন্তিসম, বিষ্ণু দে-র যেমন রয়েছে এলিয়ট-মুগ্ধতা। ত্রিশের কবিতা-জগৎ শাসন করেছেন উপর্যুক্ত কবিরাই। এমনকি তাঁরাই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ কবিতার সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মেনে সমাজের কল্যাণভাবনাকে কবিতার উপজীব্য করে তুলেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় সমকালীন ও অব্যবহিত বিশ্বের ছায়াপাত ঘটলেও তিনি কবিতার সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করেননি। (মাহবুব; ১৯৯১: ১২৭) ফলে তাঁর কবিতায়ও কৃষক-শ্রমিক বা সমাজের বঞ্চিত মানুষ উপেক্ষিত রয়ে গেছে। তার যৌক্তিক কারণও রয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা না পোরোতেই মৃত্যুবরণ করেন তাঁর মাতা বিনয়কুমারী। শোকাভিভূত পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পিতার নৈকট্যপ্রাপ্তির সুযোগ থেকে কবি বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে তিনি বেড়ে ওঠেন মাতুলালয়ে। মাতা-পিতার স্নেহ-সান্নিধ্য ব্যতিরেকে তিনি বয়োপ্রাপ্ত হন মাতামহ ও মাতামহীর সান্নিধ্যে। মাতামহীর কাছেই পেয়েছেন মাতৃস্নেহ। তিনি মা ডেকেছেন মাতামহীকেই। বুদ্ধদেব বসুর শৈশব-কৈশোর-যৌবনকাল পূর্ববাংলায় অতিবাহিত হলেও তিনি সমাজের আর দশজনের মতো স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ফলে গ্রাম, কৃষি, কৃষকজীবন, শ্রমজীবন ঘেরা পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠলেও তা প্রত্যক্ষ করা কিংবা তার মাহাত্ম্য অনুধাবন করার সুযোগ হয়নি তাঁর। পড়াশোনা ও বইপুস্তকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। পাশাপাশি শিশুবেলা থেকেই তাঁর স্বভাব ও চেতনার মধ্যে একধরনের নৈঃসঙ্গ্য বোধ ও একাকিত্ব বোধ সদা জাগ্রত ছিল। (মাহবুব; ১৯৯১: ২)

কবিতায় নতুনত্ব সৃষ্টিতে ত্রিশের প্রত্যেক কবি নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তবু তাঁদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে লক্ষণীয় ছিল বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। কবিতার বুননকৌশলও ছিল আলাদা। তাই, ত্রিশের বেশির ভাগ কবির কৃষি বা

কৃষক ও শ্রমজীবনকে দেখার দৃষ্টি বদলে যাওয়ার মৌলিক কারণ ছিল। জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। এ-ক্ষেত্রে অশ্রুকুমার সিকদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এই কবিতার রচয়িতারা নগরের বাসিন্দা এবং নাগরিক পটভূমি তাঁদের কবিতায় নিত্য বিরাজমান।...একটু সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলা আধুনিক কবিতার এই নগর-মনস্কতাকে অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়। পাশ্চাত্য আধুনিকবাদী কবিতার নগরকেন্দ্রিকতার প্রভাব তো ছিলই। তার সঙ্গে হয়তো আরো বেশিভাবে ছিল এইসব কবিতার কবি যাঁরা, তাঁদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে। তাঁরা প্রায় সকলেই উঠে এসেছেন উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী উচ্চবর্ণের হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে।... আধুনিক বাঙালি কবিরা উঠে এসেছিলেন সেই সমাজ থেকে, যে-সমাজের সঙ্গে গ্রামজীবনের, কৃষির, ভূমির, প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিন্ন হয়ে গেছে চার-পাঁচ পুরুষ আগে। (অশ্রুকুমার; ২০০০: ৬০-৬২)

তাই উপর্যুক্ত দুই কবি সম্পর্কে বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ কলকাতার এবং বুদ্ধদেব বসু ঢাকার নগরজীবনের গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশ বেড়ে উঠেছিলেন। ফলে দুজনের প্রতিভাও বিকশিত হয়েছিল গ্রামীণ জনবিচ্ছিন্ন উন্মুল পরিমণ্ডলে। তাই কৃষক-শ্রমিকের জীবন তাঁদের যাপিত জীবন এবং কবিতাসৃজন-প্রয়াসকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। বলা যায়, এই কারণেই তাঁদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিক বা সমাজের বঞ্চিত মানুষ উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

অন্যদিকে বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হলেও তিনি কাব্যসূচনা করেন এলিয়ট-প্রভাবিত পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ এবং জটিল প্রাচ্য ও প্রতীচী পুরাণ-অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করে। পুরাণ ব্যবহারে তিনি গ্রিক ও ভারতীয়—দুই দিকেই সাবলীল ছিলেন। কবিজীবন নগরজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও কবিতাচর্চার দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক চেতনা ও সাহিত্যদর্শন তাঁকে কৃষক-শ্রমিকের প্রতি আন্তরিক করে তোলে। বিভাগপূর্বকালে প্রকাশিত তাঁর পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথম দুটো *উর্বসী ও আর্টেমিস* (১৯৩৩) ও *চোরাবালির* (১৯৩৭) মধ্যে নাগরিক যুগযন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত পরের তিন কাব্য *পূর্বলেখ* (১৯৪১), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৪৪), *সন্দীপের চর*-এ (১৯৪৭) তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, যার বিকাশ আগের কাব্যগুলোতে লক্ষণীয় ছিল না। প্রথম দুটি কাব্যে মুখ্যত এলিয়টের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলেও পরের কাব্যগুলোতে শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি, সাম্যবাদী সমাজরূপায়ণের ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের সংগ্রাম ও কবির আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। (অনীক; ১৯৯৫: ১১৮) বিষ্ণু দে মূলত ত্রিশের দশকের কবি হলেও চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্যাদর্শ ও উপস্থাপনার বদল ঘটে—স্পষ্টত পরিবর্তিত সাম্যবাদী ধারায়। ক্রমশ সরে

আসেন তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কাব্যকৌশল থেকে। এ-সময় কবিতায় কৃষি, কৃষক—উপরন্তু শ্রমজীবী মানুষই প্রাধান্য পেতে থাকে। কারণ, 'এ সময়-পরিসরে এবং সংশ্লিষ্ট কিছুটা পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত রাজনৈতিক পাশাখেলা, সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্যোগ বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ-মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত বিদ্বেষ বিরূপতা এবং সেই সঙ্গে বিপরীত চরিত্রের তেভাগা ও কৃষক আন্দোলন, শ্রমজীবী ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর সামাজিক প্রগতির পক্ষে আন্দোলন ও অবস্থান গ্রহণ *সন্দ্বীপের চর* কাব্যগ্রন্থের মূল সুর, বলা যেতে পারে প্রতিপাদ্য বিষয়।' (রফিক; ২০১০: ২৮) আমরা জানি, সমাজে উৎপাদনের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে, সচল রাখে যারা অর্থনীতির চাকা, তারাই জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে, জীবনের সমস্ত উদ্‌যাপন থেকে বঞ্চিত হয়। কবি বলেছেন :

> শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো সে অমান্য-উৎসবে
> আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল পেন্‌সনের ঘর
> চাষিরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
> তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
> ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

(বিষ্ণু; ১৯৫৫: ৬৯)

এই কবিভাষাই ত্রিশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অন্যান্য কবির চেয়ে বিষ্ণু দে-কে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তাঁর কাব্যচেতনার তারতম্য তৈরি হয়েছে কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রতি অসীম দরদ প্রদর্শনের জন্য। তাঁর কাব্যভাষা যেমন শ্রমজীবীদের অবলম্বন করে এগিয়েছে, তেমনি তিনি মনে করতেন, শ্রমজীবীরাই জগতের সভ্যতা, সকল সম্ভাবনা ও ইতিহাসের বিচিত্র পথ বিনির্মাণে অবদান রাখছে। (অনীক; ১৯৯৫: ১৩০) চাষি কিংবা শ্রমিকদের নিয়ে তাই কবির সংবেদনশীল উচ্চারণ: 'অগণন চাষী পলিমাটি চষে, কামার কাস্তে হাতুড়িতে কষে,/ রেলপথে আকাশে নদীতে বজ্রের গান পাতা।' (বিষ্ণু; ১৩৫৪: ২৮) শ্রেণিচেতনার সামগ্রিক চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি আলোকপাত করেছেন আদিবাসীদের প্রসঙ্গও। "সাঁওতাল কবিতা"য় তিনি বলেছেন :

> দুটি ছেলে
> তারা লাঙল চালায় লাঙল
> লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে।
> দুটি মেয়ে
> তারা জল তোলে দুইজনে
> জল তোলে ঐ ছোটো পাহাড়ের ঢালে।

(বিষ্ণু; ১৯৫৫: ৭০)

বাংলাদেশের সাঁওতালিরা নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদের একটি বড় অংশ। এরা শ্রমজীবী। এ কাব্যগ্রন্থে পেশিবহুল, মৃৎবিজয়ী মানুষের জীবনে প্রকৃতির চরিতার্থতা মেলে। সাঁওতাল কবিতা ও উঁরাও গানে রয়েছে শ্রমজীবনের সরল মুখশ্রী, ভালোবাসার সরল সৌন্দর্য। (আকতার কামাল; ২০১০ : ২৪৫)

কল্লোল গোষ্ঠীর সক্রিয় কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে (১৯০৪-১৯৮৮) ত্রিশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার একজন বলে গণ্য করা হলেও কাব্যপ্রবণতায় তিনি অন্যদের চেয়ে বেশ কিছুটা আলাদা ছিলেন। কারণ *প্রথমা* (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থেই তিনি স্পষ্টত জানান দেন, এই সভ্যতা শ্রমজীবন ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানা মতবাদকে সমীহ করলেও সেসব তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। সেসব মতবাদ তিনি গ্রহণ করেছেন উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে—গরিব ও শ্রমজীবী সমাজের প্রতি সহমর্মিতার মাধ্যমে। সেই স্বকীয়তার কারণেই তিনি নানা পেশাজীবীদের আপন মনে করেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা যায়, 'লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতা, যৌথ শক্তিতে আস্থা প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই প্রত্যয়গুলির পেছনে মার্ক্সবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বঞ্চিত মানুষ তাঁর আত্মার আত্মীয় এবং মানুষের যৌথ উত্থানে তাঁর প্রবল আস্থা। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্তরে সাবলীলভাবেই এক মানবিক ভাবনার অস্তিত্ব ছিল—সে ভাবনার টানেই তিনি মার্কসবাদের সাম্যবাদী ভাবনার শরিক হয়েছেন।' (গৈরিকা; ২০০৫: ৭২)

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তাই ভাই,
সময় যে হার নাই।...
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারে মুখের টানি গুণ।

(প্রেমেন্দ্র; ১৯৮৯: ৩)

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কেবল *প্রথমা* কাব্যের শুরুর কবিতাতেই নানা ইঙ্গিতে-সংকেতে শ্রমজীবনের কথা বলেছেন অসীম দরদে। প্রকৃতপক্ষে মানবতার মুক্তির ভাবনা থেকেই শিল্পিত করেছেন নিজের কবিতাবলিকে। সে-কারণে মহাসমরোত্তর সময়পর্বে নৈরাশ্য অনুভব করলেও তাকে অবিকল্প বলে মানতে চাননি। কবিতা যে আত্মমুক্তির সাধনা হতে পারে, এ সত্য যেমন তিনি জেনেছেন, তেমনি মনে করেছেন, তা মানবমুক্তির সাধনাও বটে। (ধ্রুবকুমার; ২০০৮: ২৪৮)

তাই যারা শ্রমে-ঘামে কালের ও কলের চাকা সচল রাখেন, তাঁদের জীবনের সংকটমুক্তির সমার্থক হিসেবে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। প্রথম মহাসমারোত্তর সাধারণ মানুষের জীবনের আশা-নিরাশা, অবক্ষয়-ক্ষোভ, স্বপ্নভঙ্গ—সবই কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর বড় কারণ হলো, অন্যান্য মেধাবী তরুণদের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কবিতায় মার্ক্সবাদী তত্ত্বে ও আদর্শে। (গৈরিকা; ২০০৫: ৭১)

তবে উপর্যুক্ত কবিদের সমকালেই জনবান্ধব ও শ্রমজীবন নিয়ে কবিতা লিখে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫)। তাঁর অমর সৃষ্টি "কাস্তে" কবিতা। কবিতাটি লেখা এবং প্রকাশ দুটিই হয়েছিল প্রতিকূল পরিবেশে; যা থেকে উত্তরণ সহজ ছিল না। সমকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কালজয়ী এ কবিতা রচিত হয় ১৯৩৬ সালে। এ সময় তিনি ছিলেন 'কমিউনিজম' চেতনায় উদ্বুদ্ধ। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "কাস্তে" কবিতাটি উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণীয়। কবিতাটিতে সমকালীন যুগজীবন ও ইতিহাসকে ধরে রাখা হয়েছে। কারণ, এ-কবিতা রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। রচনার বছর সাতেক পর পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর সংঘটিত হলেও বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ যে অগ্নিগর্ভ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নতুন যুগের ভাবনাচিন্তা করছিল, এ-কবিতা যেন সেই সংকটকাল মোকাবিলার অনুপ্রেরণা-ধ্বনি সংকেতিত করে তুলেছিল। (ধ্রুবকুমার; ২০০৮: ২৫৭) সময়ের বৈরিতার কারণে বেশির ভাগ প্রকাশক বা পত্রিকার সম্পাদকই এ-কবিতা ছাপানোর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এমনকি কবির নিজ দলের পত্রিকা *অগ্রগতি*তেও ছাপা হয়নি কবিতাটি। এক বছর পর, ১৯৩৮ সালে *আনন্দবাজার* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় কবি অরুণ মিত্রের তৎপরতায় কবিতাটি ছাপা হয়। (দিনেশ; ১৯৫৯: 'কবি-পরিচয়') কবিতাটির শব্দচয়ন, ভাষার তীক্ষ্ণতা ছিল নতুন ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। যেমন :

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!...

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

(দিনেশ; ১৯৫৯: ২১)

কবিতাটির নাম থেকে শুরু করে প্রতিটি শব্দের ব্যবহারই যেন কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষকে নিবেদিত। যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ থাকে। কিন্তু বলির শিকার হয় সাধারণ মানুষ। সে-জন্যই বোধ হয় দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, 'চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী/ তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে/ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে, মাটির—মাটির যুগ উর্ধ্বে।' (দিনেশ; ১৯৫৯: ২১) ত্রিশের কবিদের মধ্যে আর কারও কবিতায় এতটা স্পষ্ট করে শ্রমজীবী মানুষের কথার প্রতিফলন ঘটেনি। কৃষকের প্রাত্যহিক এবং অন্যতম অপরিহার্য অনুষঙ্গ কাস্তেকে কবিতার আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে গড়ে তোলাটা সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে কোনো একটি মাত্র কবিতার নামে কবির নাম চিহ্নিত হওয়া বিরল দৃষ্টান্ত। সেই তালিকায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য খ্যাতিমান, তেমনি 'কাস্তে'র জন্য পরিচিত কবি দিনেশ দাস। কবিতা রচনার পর কেউ প্রকাশ করতে চাননি বলে অভিমানে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। (দিনেশ; ১৯৫৯: 'কবি-পরিচয়') দিনেশ দাস ছিলেন প্রগতিবাদী রাজনীতির অনন্য সাধক। সাধনার অংশ হিসেবে প্রকাশিত এ রচনা বাংলা কবিতার এক অনবদ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। কবি প্রায় রাতারাতি মেহনতী মানুষের জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। "কাস্তে" কবিতায় শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ শ্রমজীবী কৃষকের ফসল কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনীয়। যে চাঁদ এত কাল কবিতার জগতে প্রেম ও নান্দনিক লাবণ্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তাকে কবি খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার বা প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বামপন্থী মতবাদের আরেক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য পূর্ণিমার চাঁদকে 'ঝলসানো রুটির' সঙ্গে তুলনা করে কালজয়ীর স্বীকৃতি পেয়েছেন।

দিনেশ দাসের কবি-মানস ও চিন্তার নানা বিবর্তনের চিহ্ন বহন করে তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত প্রতিবাদী চেতনা, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শ্রমিক-সর্বহারার প্রতি সমর্থন, তথা মানবিক প্রত্যয় তাঁকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। সে-কারণেই সামাজিক অসাম্য, শ্রেণি-সংঘাত, শোষণ, বিপন্নতা প্রভৃতি সমাজমনস্ক-চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কবিতায় উঠে আসে। (আহমেদ; ২০০৭: ১০৩) "কাস্তে"র এই উদ্যমই চল্লিশের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), সুকান্ত ভট্টাচার্যসহ (১৯২৬-১৯৪৭) সে সময়ের প্রগতিবাদী কবিতায় চর্চিত হয়েছে। এ-পর্বের কনিষ্ঠ কবি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষে গদ্যভাষায় সুবিধাবাদী আপসবাদী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত বিশেষত এলিট শ্রেণিকে কাটাছেঁড়া করেছেন—যাদের এককথায় বলা হয় 'ভদ্রলোক শ্রেণি'।

চার

মধ্যবিত্তের পোড়খাওয়া কবি কিংবা মার্ক্সবাদী কবি হিসেবে সমর সেনের অধিক পরিচিতি। নিজে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের একজন হয়ে, কীভাবে কৃষক-শ্রমিক তথা শ্রেণিহীন সমাজের জন্য রাজনীতি করবেন—এ নিয়ে দ্বিধা ছিল তাঁর! অথচ মার্ক্সবাদ তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে ছিল। একদিকে মধ্যবিত্ত জীবনে বসবাস করা, অন্যদিকে শ্রেণিচ্যুত না হয়ে বিপ্লবী জীবনের রাজনীতি কীভাবে করা সম্ভব—মধ্যবিত্ত হিসেবে এটাই ছিল তাঁর সংকট। এ ভাবনা থেকেই মধ্যবিত্ত রয়ে গেলেও চেতনায় সাম্যবাদী সমাজের পিপাসাকে ধারণ করে রচনা করেছেন শিল্পিত কবিতাসমূহ। ত্রিশের দশকের শেষের দিকে সমর সেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলে সক্রিয় রাজনীতির দিকেও ঝুঁকে পড়েন। নিবিড়ভাবে মার্ক্সবাদের অধ্যয়ন এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে সমর সেন স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জীবন থেকে আদ্যোপান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিবৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে হবে। আর শ্রেণিচ্যুত হয়ে গ্রহণ করতে হবে শ্রমিক শ্রেণির জীবনপদ্ধতি। কিন্তু এটা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। (মাহবুবুল; ২০০৫: ১১৬) যেহেতু মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত সমর সেন জীবনাচরণ পাল্টাতে চাননি, তাই সরাসরি দলীয় বা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হননি। আবার আত্মকরুণা ও নীতিহীন মধ্যবিত্তের চরিত্র দ্বারা তাঁর কাব্য আক্রান্ত হয়নি। বরাবরই তিনি মধ্যবিত্তের প্রতি অন্তহীন ঘৃণা, ধিক্কার ও বিদ্রূপ জানিয়েছেন। তাঁর কবিতায় সমাজনীতি ও রাজনীতি স্পষ্টভাবে প্রবেশ করে এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ যখন তাঁকে সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি ঝুঁকতে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, তখনো তিনি এ-বিষয়ে সচেতন থেকেছেন। (সূত্র: অনিল; ১৯৮৭: ৯) তাই সাম্যবাদী রাজনীতির আদর্শকে ধারণ করে তিনি কবিতার চর্চা করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ‘নাগরিক জীবনের খণ্ড-খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো-কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।’ (বুদ্ধদেব; ১৯৯৭: ৬১) তবে তিনি যে সাম্যবাদী—এই পরিচয় স্পষ্ট হতে আরম্ভ হয় তাঁর ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের সময়সীমায় রচিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *গ্রহণ*-এ। এখানে তিনি ‘মরা গঙ্গায় স্নানের আগে’ ভাবেন, ‘মরা সমুদ্রে মরণ আসে না,/ নোনা জলে শরীর ভাসে।’ (সমর; ২০১২: ৬৩) সময়টা ছিল অস্থির। ব্রিটিশ শাসনের আগ্রাসী নীতির কারণে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। নাগরিক মানুষজন ক্রমশ হয়ে উঠছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বার্থপর।

১৯৩৫ সালে নতুন ভারতশাসন আইন করে ব্রিটিশরাজ। ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে আরম্ভ হওয়া দ্বিতীয় মহাসমর বাংলার রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ সময় ভারতীয় জনগণকে শোষণের নিষ্ঠুর নীতির নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়। কট্টরপন্থী ও প্রচণ্ড ভারতবিরোধী ইংরেজ উইনস্টন চার্চিলের (১৮৭৪-১৯৬৫) নেতৃত্বাধীন সরকার এই যুদ্ধপরিস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। যুদ্ধের রসদ জোগানের জন্য নির্মিত কলকারখানা ও অফিসসমূহে শ্রমিক শ্রেণির একটা বড় অংশ সব সময় অনিশ্চিত অবস্থায় তীব্রতম শোষণের মুখোমুখি হয়। গ্রাম-শহর একাকার হয়ে যায় খাদ্যশস্যের সংকটে। অগণিত খেটে খাওয়া মানুষ শহরমুখী হতে বাধ্য হয়। ফলে গোটা বাংলা আস্তে আস্তে পর্যবসিত হয় ভয়াবহ খাদ্যসংকটে। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে থাকে স্বল্প আয়ের লোকজন। (বৃন্দাবন; ২০০৭: ৮০) সম্ভবত সেই সময়েই সমর সেন রচনা করেন 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি', যেখানে প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তিস্বার্থের চরম সংকীর্ণতা। নাগরিক জীবনের স্বভাব, অভাব ও অসংগতির বিদ্রূপাত্মক চিত্রায়ণ ঘটেছে এ কবিতায়। কবিতাটি কিছু অংশ নিম্নরূপ :

> কতদিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশি বাজে;
> পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসে শব্দ।...
> নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি
> তবু মরল চরম কথাটি এই বলে মানি
> ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেকে না,
> সবার উপরে আমিই সত্য
> তার উপরে নেই।
>
> (সমর; ২০১২: ৫৭)

মার্ক্সবাদ সব সময় ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধিতা করে সামগ্রিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু স্বার্থপরতার অমানবিক উদাহরণ হয়ে উঠেছিল চল্লিশের রাজনীতি ও সামাজিক বাস্তবতা। ফলে শ্রমজীবনকে কেন্দ্র করে অতিবাহিত জীবন কেমন ছিল তা প্রকাশেও প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছেন সমর সেন। সে-কারণেই কবি যেন দুর্ভিক্ষের আগমনধ্বনি শুনিয়ে দেন :

> ইন্দ্রের ভ্রূকুটি কুটিল গম্ভীর আকাশে
> বৈশাখের মৈনাক মেঘ নিঃশব্দে আসে;...
> রুক্ষ মাঠে গ্রীষ্মের কিষাণের গান।
> এখানে অসহায় দিন
> দূর শ্মশানের গন্ধে, শেষহীন শব্দের পাশে
> পদক্ষেপে স্তব্ধ।
>
> (সমর; ২০১২: ৬৪)

এই 'আসন্ন রাত্রির' যেন প্রহর গুনছেন কবি। কারণ এই দীর্ঘ রাত বাংলার মানুষের বুকে চেপে বসতে চলেছে ঘন কালো আঁধার রূপে; যার মারণান্তিক নাম দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে তেতাল্লিশের মন্বন্তর হিসেবে যার সমধিক পরিচয়। মন্বন্তরের মতো সংকট যে তখন ঘনায়মান, তার ইঙ্গিতবাহী শৈল্পিক ও রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন কবি। তিনি কবিতার ওপর ভর করে স্মৃতি রোমন্থন আর ইঙ্গিত দিচ্ছেন সমৃদ্ধ অতীত আজ বিলীয়মান। তাতেই বোঝা যায় কেমন চলছে কৃষক ও শ্রমিকের দিনকাল। শুধু তা-ই নয়, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের :

বাঙলার বাইরে কঠিন মাঠে
একদিন শুনেছি চাষীর গান;
মালগুজারী কৈসে লেওগে
ঝান্ডা মেরি জিন্দাবাদ।...
কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ কর,
জমিদার, বণিক বরবাদ
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
(সমর; ২০১২: ৬৮)

মধ্যবিত্তের ধরাবাঁধা জীবনে অভ্যস্ত কবি মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হওয়ার ফলে নাগরিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে ক্রমশ শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি দিতে চান। তাই কবিতায় তাদের প্রাধান্য দেওয়ার মানসে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। সেই সূত্রেই তিনি সভ্যতা বিনির্মাণের কারিগরদের বঞ্চনাকে উপলব্ধি করেন, যা কবিতার শব্দচয়নে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করছে, সে বিষয়ও স্থান পেয়েছে উপর্যুক্ত কবিতার দ্বিতীয় অংশে :

তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।
(সমর; ২০১২: ৭০)

দ্বিতীয় মহাসমর যখন চলমান, আলোর জন্য অনাবিল অস্থিরতা থেকেই সমর সেন অন্ধকারময় জীবনের বিবিধ বিপর্যয়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে স্বভাবজাতভাবে তাঁর এ ক্ষোভের প্রকাশ কখনো

খুব তীব্র হয়নি—শৈল্পিক মানদণ্ডকে কখনো ক্ষুণ্ণ করেনি। তিনি রচনা করেননি স্লোগানধর্মী কবিতা। কিন্তু কবিতায় কৃষক-শ্রমিক বা দিনমজুরের প্রসঙ্গ যখনই এসেছে, তখনই তিনি প্রয়োগ করেছেন তীক্ষ্ণ, মর্মান্তিক, লক্ষ্যভেদী বিদ্রূপাত্মক ভাষা। তবে তার মধ্যেও অধিকারবঞ্চিত মানুষের অবয়ব নির্মাণের জন্য একধরনের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। কবিতা-জীবনের প্রারম্ভিককালে নাগরিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যেমন হতাশায় পর্যবসিত হয়েছিল কবির চিন্তার কেন্দ্র, এখানে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন :

এ কঠিন কঙ্কাল দেহে একবার প্রাণ দাও,
হে কাল, হে মহাকাল!
নানাভাবে কসরৎ দেখায়, মোটরে মজা লোটে;
এদিকে স্থান নেই, স্থান নেই রব,
ছোট এ ফ্যাক্টরী।
ধানক্ষেত জীর্ণপ্রায়
অগণন ধোঁয়ার ফণা, চিমনিতে চিরেছে আকাশ
তারি আশেপাশে ট্রাম বাস বিমর্ষ মানুষের ভিড়ে
কারা যেন পথে পথে নিঃশব্দে ঘোরে;
অবশ্য কন্দর্পকান্তি নয়,
তবু সাবলীল আত্মীয়তার শূন্য হৃদয় ভরে,
দুহাতে সাফ করে যত জটিল জঞ্জাল।
(সমর; ২০১২: ৭৩)

কবি ভেবেছেন, যাদের কারণে সংকটে পড়েছে শ্যামল বাংলার খাদ্যের জোগানদাতারা, তারা সমবেত হবে ফসলশূন্যতার প্রতিবাদ জানাতে। নাগরিক পরিবেশে মানুষের জীবন আর গ্রামীণ মানুষের যাপিত জীবনের যে বড় পার্থক্য, সেটা খুঁজতে কবির সাম্যবাদী চেতনার প্রধান সহায় শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনজীবন। গণমানুষ স্বাভাবিকভাবেই নতুন ভোরের স্বপ্নে বিভোর থাকে এবং শোষিত ও শ্রমজীবী এই মানুষগুলো একটা নতুন ভোরের স্বপ্নে মিলিত হয়:

শহর ছেড়ে চলি অনেক দূরের গ্রামে।...
জীর্ণ বলদে চষা মাঠে সোনালী ফসল ফলে না,
দিনে দিনে পশ্চিমের যুদ্ধ শক্তিশেল হানে।
তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েত, সরবে হাঁকে,
'লাঙল যার জমি তার?'
পড়ন্ত রোদে অনেক বুড়ো চাষা বাইরে ব'সে
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাপার দেখে,
বৈশাখী দিন আসন্ন, তারাও জানে।
(সমর; ২০১২: ৮৫)

সামাজিক ও ঐতিহাসিক বন্ধ্যা অবস্থা সহজেই ধরা পড়ে সমর সেনের কবিতায়। তিনি উপলব্ধি করছিলেন ব্রিটিশদের উপনিবেশে আমাদের অস্তিত্ব কেমন বিপন্ন। এ থেকে উত্তরণের প্রতিজ্ঞায় ভেতরে ভেতরে তিনি ভাবেন, বৈশাখী দিন আসন্ন। (সরোজ; ২০০৮: ২১৮) শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণির মাত্রাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও গদ্যভাষার ব্যবহারে তিনি চিত্রিত করেছেন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। সেটা করতে পারার কারণ হলো, অন্যান্য সময়ের তুলনায় ১৯৪০-১৯৪২ কালপর্বের কবিতায় তিনি সাম্যবাদী আদর্শ ও রাজনীতির কথা সরাসরি প্রকাশ করেছেন। সমাজ ও সমকাল তাঁর কবিমানসে যে অধিকতর প্রভাব ফেলেছে, এ সময়ের কবিতায় ব্যবহৃত 'কানা গরু, মরা মাঠ, শূন্য গোলাঘর' প্রভৃতি চিত্রায়ণ তার প্রমাণ। (মাহবুবুল; ২০০৫: ১২২)

> একদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম শবজীবীর আশ্রয়,
> শস্যহীন মাঠে পোড়া, বারুদের স্বাদে
> মুষ্টিমেয় মানুষ ফসলের উচ্ছিষ্ট খোঁজে
> শূন্যতার মৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে কালোয়াতি দেখায়
> জয়গর্বে কামান গরজায়।
> তিলে তিলে গড়া কারখানার ভগ্নাংশ মাত্র
> শহরে জাগে, বিগত দিনের জঞ্জাল
>
> (সমর; ২০১২: ৮৭)

মহাযুদ্ধের বারুদের তীব্রতাকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে গেঁথে দিতে চাইলেও সমর সেন রাজনীতিকে সাহিত্য পদবাচ্য হিসেবে নিজের সৃষ্টির সঙ্গে আনতে চাননি। (বৃন্দাবন; ২০০৭: ১৫০) তাই কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তায় সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি চান 'বৈশাখী দিন আসন্ন' বলে। সমর সেন 'কিন্তু কেরানী হৃৎপিণ্ডের শবযাত্রায় প্রতিধ্বনি দূর করতে জোর গলায় বসন্ত আসবার ঘোষণায় বা সফলতায় পৌঁছে যাননি।' (জহর; ১৯৯৮: ২৯৮) মুক্তি চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মুক্তি বা বৈশাখী দিন আসবে কি না, তা তাঁর জানা নেই। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ সোমেন চন্দের খুনের ঘটনায় গঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসমাজের সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন সমর সেন। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশই সমর সেনের কাব্যমানস গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। (গৈরিকা; ২০০৫: ১২৪)

১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলা হলে ফ্যাসিস্ট ইমারত ভেঙে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। এদিকে কলকাতার রাস্তা দখলে নেয় শ্রমজীবী ও সোচ্চার সাধারণ মানুষ। (বাপ্পাদিত্য; ২০১৭: ৬৬) এভাবে কবি শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল মানুষকে শোষণ-ত্রাসনে তৎপর সাম্রাজ্যবাদী শোষক, মহাজন-মজুতদার, বুর্জোয়া আমলা রাজনীতিক এমনকি

দ্বিচারী মধ্যবিত্তের কৃত্রিম বেশ তিনি উন্মোচন করেছেন। (অনীক; ১৯৯৫: ১৬৫) আবার শ্রমজীবনের প্রাত্যহিকতার প্রকৃত স্বরূপও তুলে ধরেছেন। সভ্যতার উল্টোপিঠে সজাগ দৃষ্টি রেখে তিনি স্বচ্ছন্দে বলে চলেন :

হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে
কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়—শাণিত হাতিয়ার!
মাঝে মাঝে বালুচর, কাদাখোঁচা জলে নামে,
ধানক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ,
হাতুড়ি বাজে কামারশালে,
সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে।

(সমর; ২০১২: ১০২)

কৃষক ও শ্রমিক-শক্তির সামবায়িক উত্থানে নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তনের ইঙ্গিত 'সবুজ আগুন জ্বলে' শব্দবন্ধ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (বাসন্তীকুমার; ২০১৫: ৩৮৪) এভাবেই সমর সেন শ্রমজীবীদের শ্রমক্লান্ত জীবন ও বঞ্চিত অবস্থার খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা যে কৃষক-শ্রমিক, সমাজে-রাষ্ট্রে তাদেরই মর্যাদা যেন সুদূরপরাহত। (অনীক; ১৯৯৫: ১৬৪) দিনেশ দাস ও সমর সেনের হাত ধরে বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

পাঁচ

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত দ্বিতীয় মহাসমর পৃথিবীর বুকে যে ক্ষত নিয়ে আবির্ভূত হয়, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন করে একজন কাজী নজরুল ইসলামকে উপনিবেশবিরোধী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল, তেমনি এ সময় আবির্ভূত হন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন কবিগণ। দ্বিতীয় মহাসমর ভারতবর্ষসহ গোটা পৃথিবীতে মানবসৃষ্ট দুর্যোগের এক কাল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই সময় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সশস্ত্র আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ, আগস্ট আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনায় ভারত ছিল অগ্নিগর্ভ। মহামন্বন্তর, গণ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সময়ের সর্বাধিক প্রভাববিস্তারী ঘটনা। (ভীষ্মদেব; ২০০৪: ১৫)

একই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে সামাজিক পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। কারণ, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও তাঁর পরামর্শদাতারা ভারতের যাবতীয় সম্পদকে জাপান ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। (মধুশ্রী; ২০১৭: ১)

সেই সংকটকে ভারতের ওপর শাস্তি হিসেবে চাপাতে যুদ্ধ চলাকালে মজুতদার, অতি মুনাফাখোরদের সহযোগিতায় সরকার কৃত্রিম খাদ্যসংকটের সৃষ্টি করে। ফলে ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ বাঙালিকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পঞ্চাশের মনন্বর বা তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ বলে পরিচিত এই কঠিন সময়ই চল্লিশের কবিদের সমাজঘনিষ্ঠ মননে গড়ে উঠতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। এই কবিদের কেউ কেউ ছিলেন সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তাঁদের বেশির ভাগ কবিই ছিলেন মার্ক্সবাদে দীক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ শাসকদের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কারণে শ্রমজীবীরাই ছিলেন সমাজের সুবিধাবঞ্চিত কিংবা নিপীড়িত শ্রেণি। ফলে কবিদের কাব্যের বিষয় ও উপাদান হিসেবে ওই শ্রেণিই প্রাধান্য পায়।

চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শন সরবে যেন ঘোষণা দিয়ে আবির্ভূত হয়। এর আগে ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধের আগমনধ্বনি ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয় মানবিক সংকট ও হতাশা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নতুন প্রত্যাশা হিসেবে এসেছিল মার্ক্সীয় সাম্যবাদের মানবিক প্রত্যয়। (আহমেদ; ২০০৭: ১৬২) এ সময় দামাল দশক বলে খ্যাত চল্লিশের কবিতা এবং এর পরবর্তী সময়ে প্রবাহিত অভ্রান্ত চেতনাই বাংলা কবিতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। দিনেশ দাস, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় ত্রিশের দশক থেকেই এর প্রারম্ভিক কাজ সেরে ফেলেছিলেন। সমকালীন হলেও এ-কথা সত্যি, সুভাষের এ পথ মসৃণ করে দিয়েছিলেন সমর সেন। দিনেশ দাসের 'কাস্তে'র প্রভাব পড়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়। কারণ, এ সময় কবিতা প্রবলভাবে রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। একদিকে ব্রিটিশদের নানা নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড, এর বিপরীতে সংঘবদ্ধ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন; অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাসমর গোটা বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও সমস্যাসংকুল করে তোলে। সেই সংকট থেকে উত্তরণে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং তা অবজ্ঞা করায় সংকট আরও ঘনীভূত হয়। একপর্যায়ে খাদ্যসংকট রোগশোকবাহিত মড়কে রূপান্তরিত হয়, যা দ্রুত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সরাসরি সাম্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সক্রিয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে সাম্যবাদী চেতনার কবিতার চর্চা করেন। তাঁর আগে অবশ্য নজরুল সাম্যবাদের দিকপাল হিসেবে আবির্ভূত হয়ে অগ্নিবীণা বাজিয়ে গেছেন। তাই *পদাতিক*-এর মধ্য দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কবিতায় আবির্ভাব ছিল একটি বড় ইতিবাচক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। (অশ্রুকুমার; ১৩৮১: ২২৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শকে লালন করতেন, তাঁর কবিতায় সেই প্রভাবও পাওয়া যেত, কিন্তু তিনি কখনো গণ্ডিবদ্ধ ছিলেন না।

তাঁর লেখায় প্রধান উপজীব্য হয়ে এসেছে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ। এর মধ্য দিয়েই তিনি কবিতাকে জনমানসে পৌঁছে দেওয়ার দায় পরিশোধ করতেন। (তরুণ; ২০১২: ২৩৫) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, ফ্যাসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে মানবিক ও নৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তা মোকাবিলায় যে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তারই নতুন সম্ভাবনা ও আশার আলো হিসেবে রচিত হয়েছিল সাম্যবাদী ধারার কবিতা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য কর্মী হিসেবে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাম্যবাদী দর্শন ও জীবনচেতনা অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দুই কাব্য *পদাতিক* (১৯৪০) ও *চিরকুটে* (১৯৫০)।

বিশ্ববাসীর সামনে তখন দুটি পথ খোলা ছিল। এক. ফ্যাসিবাদীদের আচরণ মেনে সমাজ-সভ্যতার বিপর্যস্ত পরিণতি মেনে নেওয়া। দুই. বৈষম্যহীন বিশ্ব গঠনে আন্দোলনে শামিল হওয়া। (মাহবুবুল; ২০০৫: ১৮১) সেই সময় অন্যান্য কবির মধ্যে সাম্যবাদী চেতনার ছাপ বিরাজমান থাকলেও এ চেতনার প্রত্যয় ও প্রেরণা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় উদ্দীপিত বাণী হিসেবে আশ্রয় পেয়েছে। কারণ, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কবিতার শক্তির মূল তাঁর আদর্শিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর অসংশয়িত প্রতীতি হলো জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে যথার্থ উচ্চারণ করা। শোষিত রিক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর আদর্শিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাস তাঁর অভিন্ন।' (মাহবুবুল; ২০০৫: ১৮২) চল্লিশের দশকের কবিতার প্রধান উপজীব্য যে সামাজিক দায়বোধ, তা-ই মূলত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান অবলম্বন। যে-কারণে বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছেন 'মে-দিনের কবিতা'। এ কবিতা মনে করিয়ে দেয় তাঁর শব্দ ব্যবহারের স্বকীয়তা ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রত্যয়ের কথা। কবিতার শরীর গঠনের প্রধান উপাদান যে শব্দ, সেই শব্দকে তিনি ছন্দোবদ্ধ কবিতায় গেঁথে দিয়েছেন সত্যিকারের কারিগরের মতো। কবিতাটি তারই অনন্য দৃষ্টান্ত। (ধ্রুবকুমার; ২০০৮: ২৮২) ফলে তিনি 'স্বদেশ ও মানবতার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা থেকে বিশ্বাস করেন, জনগণের কবিকেও শামিল হতে হবে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং স্বদেশ ও বিশ্ব পরিসরে।' (মাহবুবুল; ২০০৫: ১৮৩) তিনি হয়েছিলেনও তা-ই। ১৯৪৩ সালের মে মাসে মুম্বাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে তিনি যোগ দিয়েছিলেন দলের প্রতিনিধি হয়ে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬—এই পর্ব তাঁর হয়ে ওঠার সর্বোত্তম সময়। কেননা, এ-সময় তিনি পার্টিতে নিরন্তর কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেন। (মাহবুবুল; ২০০৫: ১৭৪) তাই তাঁর লেখায় ও মনোভাবে শ্রমজীবনের প্রসঙ্গ আসাটা স্বাভাবিক। অথচ তার আগেই মননজাত স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি ভিন্ন হয়ে গেছে। ফুল যে বাঙালির ভাবালুতাকে

গ্রাস করে ফেলে, সেই ভাবালুতাই আবার মানুষকে সৃষ্টিহীন-সংগ্রামহীন করে গড়ে তোলে। তাই ফুল নিয়ে বাংলা কবিতার একধরনের ভাববিলাস এবং মোহগ্রস্ত প্রশস্তি থেকে কবি যেন নিজেকে দূরে রাখতেন। তিনি মনে করলেন, শুভেচ্ছা-চর্চার হাত থেকে মুক্ত হয়ে ফুরলর বরং অনুভবের সত্যে পৌঁছানো অপরিহার্য। (জহর; ১৯৯৮: ৩২৫) তাই তিনি লিখলেন একেবারে হৃদয় মোচড়ানো এক ভাষায় :

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

(সুভাষ; ২০০৮: ১৫)

চাঁদের সৌন্দর্য কেবল বুর্জোয়া শ্রেণির জন্য, যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জীবন-জীবিকা টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করে, তাদের জন্য সৌন্দর্যের উপভোগ বিলাসিতার শামিল। কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই শ্রমজীবী মানুষকে নিয়েই কবি এগোতে চান এবং বলেন, 'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি' (সুভাষ; ২০০৮: ১৬)।

আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি?
ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী!
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।

(সুভাষ; ২০০৮: ১৬)

শুধু তা-ই নয়, তাঁর ক্ষেত্রে এটাও সত্য, 'তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই...একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে একটি বাঙালি ছেলে যে বয়ঃসন্ধি সময়েও প্রেমের কবিতা লিখলে না। (বুদ্ধদেব; ১৯৯৭: ৮১) কারণ, কবিতা যে সামাজিক দায় নিতে পারে, কবিতা যে সাম্যবাদী আন্দোলনের শৈল্পিক অস্ত্র হতে পারে, কবিতা যে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিতে পারে, তাদের দাবি আদায়ের স্লোগান হতে পারে, শোষিত শ্রেণির মনের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে—সর্বোপরি মানুষকে জাগানোর ক্ষেত্রে অন্যতম

মন্ত্রণা হতে পারে—কাজী নজরুলের ইসলামের পর আবারও তার প্রাবাল্য দেখা গেল চল্লিশের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। অবশ্য সুভাষ ও নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। কারণ, নজরুলের সাম্যবাদের উৎস যেখানে ভাববাদী মানবতাবাদ, সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও চিন্তার আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে। এরও কারণ হিসেবে বলা যায়, সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙালি কবি, যিনি প্রত্যক্ষভাবে আদর্শিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যখন রবীন্দ্রযুগে অবশিষ্ট রোমান্টিকতার শেষপ্রান্তে থাকা বাংলা কবিতার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত বাতাস, মৃত্যু-দামামায় সংকেতিত হচ্ছে মহাসমরের ধ্বনি, উত্তাল হয়ে উঠছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মন্বন্তরের প্লাবন তখন যেন আছড়ে পড়ছে মানবপ্রজন্মের প্রথাসিদ্ধ ঐক্যবদ্ধ দেয়ালের ওপর। (সন্দীপ; ২০১২: ৮১)

সুতরাং সাধারণ, বিশেষ করে শ্রমজীবীদের হয়ে কথা বলার, নিজেদের তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের একজন মনে করে কবিতা রচনার অভাবনীয় পন্থা অবলম্বন করেন চল্লিশের কবিরা। তাই ত্রিশের আধুনিকতাকে পেরিয়ে চল্লিশের সাম্যবাদী ও জনসম্পৃক্ত কবিতার ধারাই পরে জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্য ধারা হিসেবে পাঠক কর্তৃক আদৃত হয়। কবি সুভাষ মুখোপধ্যায় এ-ধারারই অন্যতম প্রধান কবি। চল্লিশের দশকে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। এর মধ্যে *পদাতিক*-এর কবিতাবলি রচিত হয়েছে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে, *চিরকুট*-এর কবিতাবলি ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে এবং *অগ্নিকোণ*-এর কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে। এর মধ্যে চল্লিশের দশকে প্রকাশিত হয় দুটি কাব্য—*পদাতিক* (১৯৪০) ও *চিরকুট* (১৯৫০)। এ কাব্যগ্রন্থ দুটির বেশির ভাগ কবিতার মধ্যে সাম্যবাদী চেতনা পরিস্ফুট, যেখানে তিনি শ্রমজীবনের চিত্র, বিশেষত তাদের দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণার প্রসঙ্গ স্পষ্ট করে বলেছেন। যেমন :

উপবাসী রাত অক্ষম অভিনেতা।
হৃদয় হাঙর-যক্ষ্মাই ঠোকরাবে।
ফসলের দিন সামনে, কঠিনচেতা—
অবৈতনিক বেড়েই তা টের পাবে।

(সুভাষ; ২০০৮: ২১)

অন্যান্য কবির কবিতায় যেমন উপাদান হিসেবে কৃষক বা শ্রমিকের প্রসঙ্গ এসেছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তেমন নয়। তাঁর কবিতায় তাঁদের প্রসঙ্গ আসে সংগ্রামের চেতনা থেকে, ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে অধিকার আদায়ের মিছিলে শ্রমজীবীদের পক্ষে বিপ্লব ঘটানোর অতলান্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকে। যেমন :

মৌমাছির মতো বসে কতিপয় নক্ষত্র নাগর
নিশাচর ফুর্তির চূড়ায়।
উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে।
(সুভাষ; ২০০৮: ২২)

কবিতা ও রাজনীতি এবং জীবনসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম যখন একাকার হয়ে যায়, তখন শিল্পীসত্তা ও সংগ্রামী-সত্তা অভিন্ন রূপ লাভ করে। ফলে অন্যান্য কবির কবিতায় শ্রমজীবন যেখানে আসে প্রসঙ্গ হয়ে, সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আসে অপরিহার্য পটভূমি ও উপাদান হিসেবে। যেন শ্রমিকেরা মুক্তিবিহীন থাকলে তাঁর মানবজীবন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। যে-কারণে পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের শ্রেণিকেই তিনি মুক্তিসংগ্রামের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। ফলে তাদের মাধ্যমেই রুদ্ধপ্রাণ মানবের মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন, 'একলা নই, মিলিত হাত/ আজ আঘাত হানবে।/ মুক্তিদাতা মজুর চাষা—/ নতুন আশা সামনে।' (সুভাষ; ২০০৮: ২৯) কারণ, তাদের অবস্থা করুণ। তারা সুবিধাবঞ্চিত কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হতে তাদের দোষ নেই। তারা ক্ষুধার্ত কিন্তু অসচেতন নন। আসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই চেতনার মূলে ছিল আদর্শিক বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়। সংশয়হীন স্বকীয় আদর্শ এবং শোষিত ও বঞ্চিত জনমানুষের আদর্শিক বিশ্বাস আর তাঁর বিশ্বাস অভিন্ন। তাই তাঁর কবিতা অসংখ্য পাঠককে এই বিশ্বাসের সঙ্গে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। সেই শ্রমজীবীদের জীবনসংগ্রাম ও অধিকারের সংগ্রামকে তিনি দেখছেন এভাবে :

মাঠে ঘাটে কপাল ফাটে
দৃষ্টি চলে যত দূর
খাল শুক্‌নো, বিল শুক্‌নো
চোখের কোলে সমুদ্দুর।...

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন।
(সুভাষ; ২০০৮: ৩১)

কৃষক, শ্রমিক ও অসচ্ছল নাগরিকদের নিকটাত্মীয় ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কবিতায় তাঁদের প্রতিদিনকার প্রয়োজন ও সংকটের কথা নানা অর্থ ও শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে। তিনি বুঝে ফেলেছিলেন :

> পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যের একটা বিশেষ লক্ষণীয় দিক হচ্ছে ধনিক শ্রেণির সঙ্গে শোষিত-নির্যাতিত-রিক্ত মানুষের দ্বন্দ্ব বৈরিতাপূর্ণ। এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি আসন্ন—এই বিশ্বাস থেকে সব সাম্যবাদীর মতো তিনিও ভেবেছিলেন, অচিরেই পুঁজিবাদের পতন হবে এবং শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনগণ গঠন করবে শ্রেণীহীন সমতা ভিত্তিক এক মুক্ত সমাজ। পরিবর্তন সূচিত হবে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। মেহনতী মানুষের বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে দমন করার জন্য পুঁজিবাদী দুঃশাসন চরম নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিলে তার প্রতিরোধে অজস্র রক্ত ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসবে বিপ্লবের সাফল্য। (মাহবুবুল; ২০০৫: ১৮৮)

এ জন্যই স্পষ্ট করে কবি বলেন, 'হাতুড়ি বিদ্যুৎপতি! বিস্ফোরক স্ফুলিঙ্গেরা গম্বুজে লাগুক।' কিংবা 'যাদের রক্তে উড়ছে আকাশে/ মিলের ধোঁয়া,/ মুষ্টিমেয় খেয়ালেই এই/ ভরা ভুবনে/ তাদের ভোলা।' (সুভাষ; ২০০৮: ২৬)

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতির কারণে উদ্ভূত সামাজিক সংকটের ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতি আর জীবনকে অবিচ্ছেদ্য মনে করতেন। ভাবতেন, শ্রমিকের উদরের ক্ষুধা নিবারণ করে জীবনকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হবে, যখন স্বপ্নের মতো করে সামাজিক প্রাপ্তিবঞ্চিত মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠবে। সে-কারণে তিনি সামাজিক সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা, দারিদ্র্য দূরীভূত করতে রাজনীতিকে জীবনমুখী করার বিকল্প নেই। (তারেক; ২০১০: ৩৩) তাঁর রাজনীতি ছিল সমাজের মূলস্রোতের বাইরে থাকা সেই শ্রমজীবীদের কল্যাণে, যাদের প্রত্যক্ষ কর্মতৎপরতায় সমাজ-সভ্যতার উৎপাদন কার্যক্রম সচল থাকে। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে অনন্য-সাধারণ জীবনমুখী শিল্প।

ছয়

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী সাম্যবাদী চেতনার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) আবির্ভাব ছিল ধূমকেতুর মতো। বাংলা কাব্যজগতে তাঁদের পরে আবির্ভূত হলেও চেতনা ও আদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন দিনেশ দাস, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুসারী। তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠজন, যাঁর কাছে তিনি পেয়েছেন প্রশ্রয় ও স্বীকৃতি। আবার এও সত্য, সুকান্তের অকালপ্রয়াণের পর তিনিই 'কিশোর কবি' (সুকান্ত; ২০০২: ১৭) আখ্যা দিয়ে তাঁর ললাটে এক চিরকালীন

বিশেষণ-চিহ্ন নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। বিরল ও ব্যতিক্রমী প্রতিভার অধিকারী এ-কবিকে বাংলা কবিতার ইতিহাসে অসমবয়সী[১] হিসেবেও গণ্য করা হয়। কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ও প্রয়াণকালের ব্যবধান মাত্র ছয় বছরের। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির প্রভাব চিরকালীন। স্বল্পকালের জীবনের অধিকারী হলেও পরিপূর্ণ এক কবিজীবন ছিল তাঁর। স্বভাবজাতভাবে সাহিত্য-সমালোচকগণ অনেক সময় জ্যেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের অবদানের জন্য তাঁদের নানা অভিধায় অভিষিক্ত করে থাকেন, তেমনি অনুজদেরও বয়স বিবেচনায় নিয়ে তাদের নানা শব্দে বিশেষায়িত করে থাকেন। কিন্তু কবিত্ব সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় সাধিত হয় বলে কবির কবিত্বশক্তিকে বয়সসীমার ছাঁচে বেঁধে তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করা সমীচীন নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সুকান্ত-প্রতিভাকে অনেক সময় বয়সসীমায় বাঁধার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। সুকান্ত মাত্র একুশ বছরের মতো ক্ষুদ্র বয়স-সীমায় যেসব সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সৃজনশীল ও মননশীল কাজের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, দীর্ঘ জীবনপ্রাপ্ত অনেক কবি-সাহিত্যিকের তুলনায় তা দৃষ্টান্তযোগ্য।

ব্যক্তিজীবন, কবিজীবন, সাম্যবাদী রাজনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ কর্মীর জীবন সমন্বিত হয়ে উঠেছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনাচরণে। চল্লিশের দশকের মানবসৃষ্ট সেই মহা মন্বন্তর এবং মানবতার চরম বিপর্যয়ের কালে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি অল্পবয়সী সফল কবি সুকান্ত। বিবেকের তাড়নায় মানুষের জাগরণ ঘটাতে তিনি যুক্ত হন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে, কিশোরদের সংগঠিত করতে সম্পৃক্ত হন কিশোর বাহিনীতে, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে সক্রিয় অবদান রাখেন জনরক্ষা সমিতিতে। সাংগঠনিক এই নিষ্ঠা ও দক্ষতার গুণে তিনি মাত্র সতেরো বছর বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেন। একই সময়ে তিনি ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘে যোগ দেন এবং এর মুখপত্র হিসেবে খ্যাত *আকাল* সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলা কবিতার সাম্যবাদী ধারার সর্বশেষ মৌলিক কবি হিসেবে তাঁর বিচিত্র প্রয়াস ও সৃষ্টি, বিশেষ করে কৃষি ও শ্রমজীবনকে তাঁর অনবদ্য রচনায় অঙ্গীভূত করা যেকোনো সময়ের সংকটাপন্ন মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক। কারণ, তিনিই একমাত্র কবি, যিনি 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল' বলে জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছেন এবং 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—' বলে নিজের প্রতিজ্ঞা ও সুনির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা ব্যক্ত করেছেন। এ জন্যই তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তাদের অধিকার আদায়ের অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পেরেছেন, 'নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' (সুকান্ত; ২০০২: ২৫) এ আত্মবিশ্বাসের কারণ কবি

নিজেই। কবিপ্রতিভায় বয়সের তুলনায় পরিপক্ব ছিলেন তিনি, ছিলেন জীবনচেতনায় অগ্রগামী। তাই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর একটা বাস্তব ধারণা তৈরি হয়েছিল আগে থেকেই। না হলে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কাব্যের ভুবনে অভিযাত্রা শুরু করতে পারতেন না। ১৯৪০ সালের দিকে যখন প্রথাগত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে কৃষক ও শ্রমিকেরা স্বাধীন সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকে এক নতুন স্পন্দনের আহ্বান শুনতে পান তিনি (সুকান্ত; ২০০২: ১৬)। এই কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের বঞ্চনা-দুর্দশা, তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রভাবে বাস্তুহারা মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট, লাখ লাখ মানুষের করুণ মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা তাঁকে সামাজিক দায়বদ্ধ কবি হিসেবে অঙ্গীকারবদ্ধ করে তোলে।

এই অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ের পথই তাঁর অন্বিষ্ট। এজন্যেই, 'জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কলুষিত সমাজকে জঞ্জালমুক্ত করে সুস্থ, সুন্দর পৃথিবী রচনার মহৎ জীবনাদর্শে সুকান্ত উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন কৈশোরে। রাজনীতি ও কবিতায় সেই আদর্শকেই তিনি অনুসরণ করেছেন এবং নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে।' (মাহবুবুল; ২০০৫: ২৬১) ১৯৪২ সালের প্রথমার্ধে তাঁর কাছে সব সময় রাজনীতি আর কবিতাচর্চা ছিল অভিন্ন চেতনার সাধনা। দুটো ক্ষেত্রেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর অকৃত্রিম সাধনা করে গেছেন। রাজনীতির জগতে এসেই ছাত্র আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির কাজে মনোনিবেশ করেন সুকান্ত। সেই সঙ্গে ছিল কবিতাকে সমাজমনস্ক করার ভীষণ তাগিদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রভাবে সৃষ্ট ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর যখন মানবসভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে আবির্ভূত হয়, তখনই কবি ও কর্মী হিসেবে সুকান্তের বিকাশ ও সমাদরের সূত্রপাত।

সুকান্তের রাজনীতি-নিষ্ঠা ও কবিতা-সৃজন হাতধরাধরি করে চলেছে এবং দুটো ক্ষেত্রেই লক্ষ্য ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই কখনো মাঠের রাজনীতি, কখনো-বা কবিতার মাধ্যমে তিনি নিজের দায়িত্বপালন করেছেন। কৃষি ও কৃষককে অবলম্বন করে রচনা করেছেন এমন সব কবিতা—নতুন প্রজন্মের পাঠক ও সমাজচিন্তকদের কাছে যা ইতিহাসের সত্যের চেয়ে বড় সত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের শিকার খাদ্যহীন, সহায়হীন মানুষের মতোই তিনি অকপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে বলে যান:

> আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
> প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
> আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
> আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,

আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

(সুকান্ত; ২০০২: ২৭)

১৩৫০ বঙ্গাব্দ বা তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কারণ ছিল বহুবিধ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার সময় চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন দুর্ভিক্ষের একটা কারণ, তেমনি স্থানীয় অসৎ কালোবাজারি, মজুতদারদের অনৈতিকভাবে খাদ্যমজুতের ফলে সৃষ্টি হওয়া কৃত্রিম সংকটও একটা কারণ। আরেকটা কারণ, সংকটময় পরিস্থিতির তথ্য জানা সত্ত্বেও সংকট মোকাবিলায় কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলসহ ইংরেজ প্রশাসনের লোকজনের অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকা। ইউরোপ-আমেরিকার কয়েকটি দেশ খাদ্য-সহযোগিতা পাঠাতে চাইলেও সেটা প্রত্যাখ্যান করে একধরনের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল চার্চিল প্রশাসন। মূলত ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে জাপান আক্রমণ করে। এর তিন মাস পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় প্রশাসনে চার্চিলের মন্ত্রিসভা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তারা চাল বা অন্যান্য খাদ্যপণ্য বহনকরাী জলযান বাংলার সমুদ্র উপকূল থেকে সরিয়ে ফেলেন। সমুদ্রপথে শত্রুসেনার মোকাবিলা করতে ইংরেজদের এই সিদ্ধান্তও দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত করে। এ ছাড়া চার্চিল ছিলেন কট্টর ভারতবিরোধী ইংরেজ। ষড়যন্ত্র করে পঞ্চাশের মন্বন্তরে ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ বাঙালিকে করুণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অমানবিক সিদ্ধান্ত বাংলাকে খাদ্য সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে। বিপরীত দিকে যুদ্ধপরবর্তীকালে ভারতের জন্য পাওয়া কোটি কোটি টন খাদ্য-সামগ্রী দিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপে গড়ে তোলা হয় মজুত-ভান্ডার। (মধুশ্রী; ২০১৭: ২০) এই বিষয়গুলো সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতন কোনো লেখকের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে-জন্যই হয়তো সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন :

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?...
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।

(সুকান্ত; ২০০২: ৫৫)

চল্লিশের দশকের শুরু থেকে ভারতে প্রবলভাবে বেগবান হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তখন ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার। আর

দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া বাংলাবাসীর মুক্তির জন্য সুকান্তের মতো তৃণমূল-সম্পৃক্ত কবিরা অনুভব করলেন এমন আন্দোলন তখনই সফল হবে, যখন এতে ছিন্নমূল মানুষ, সুবিধাবঞ্চিত কৃষক ও দীন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ বাড়বে। (সরোজমোহন; ২০০৬: ১৫) এই অনুভবময়তা থেকেই সুকান্ত দুর্ভিক্ষমুক্ত করতে কৃষিজীবীদের একতাবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই—এমন প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন "ফসলের ডাক: ১৩৫১" কবিতায় :

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সমানে, ঝাঁপ দেব তাতে।...
আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্যপ্রখর—
যে কাস্তে ঝল্‌সাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।
যে কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারালো।
জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে,
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভান্ডারে;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
(সুকান্ত; ২০০২: ৫৯)

সুকান্ত 'জনতার ডাক' না বলে বলেছেন 'ফসলের ডাক'। মানুষকে জাগ্রত করতে এমন অভিনব উপায় অবলম্বন করেছেন তিনি। কৃষক-শ্রমিক তাঁর কবিতায় এসেছে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে। সাম্যবাদী এই কবি চেয়েছেন সাধারণ মানুষের অবস্থানের পরিবর্তনের পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত শ্রমজীবীদের জীবনমানের পরিবর্তন। শুধু পরিবর্তন নয়, কবি চেয়েছেন অধিকার আদায়ে তাঁদের যূথবদ্ধতা। তাই কবিতাবলিতে তিনি গেঁথেছেন এমন সব অনবদ্য শব্দ, যাদের শরীর গঠিত হয়েছে মাটি-মানুষের আবেগ ও চেতনার অনুষঙ্গে। সমাজের এই শ্রেণির মানুষ দুর্ভিক্ষের কালে যেমন সবচেয়ে ভুক্তভোগী ছিল, তেমনি এই সত্যও কবির উপলব্ধিজাত যে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে সমাজে কখনো সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে না, সমাজের সত্যিকারের অগ্রগতি কখনো হবে না। যে-কারণে তিনি গেয়েছেন "কৃষকের গান" :

এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
ঘনায় ভাঙন দুই চোখে
ধ্বংসস্রোত জনতা জীবনে;
আমার প্রতিজ্ঞা গ'ড়ে তোলে

ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শক্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ।

(সুকান্ত; ২০০২: ৬০)

ক্ষুধাহীন, দারিদ্র্যহীন, শোষণহীন এক সমাজের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন সুকান্ত। রাজনীতি-সচেতনতা কবিতা নির্মাণের প্রধান অবলম্বন হলেও নাগরিক-জীবন নয়, বরং তাঁর সমস্ত সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব ছিল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অথচ উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত মানুষের প্রতি। ১৯৪৪ সালের দিকে মন্বন্তরের দাপট হ্রাস পেলেও তিনি বিরাজমান খাদ্য ও মানবিক সংকট থেকে জনমানুষের স্থায়ী মুক্তি চান। তিনি প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকে সংকট পেরিয়ে একধরনের জয়যাত্রার স্বপ্ন দেখেন কবি—আবার কৃষকের গোলা ভরে উঠবে সোনালি ধানে, কৃষকের ঘরে আসবে সুসময়। তাদের জীবনে আসবে আনন্দময় নবান্ন। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত সময়ের স্মৃতি বিস্মৃত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না—কবির পক্ষেও না। তবু পৌষপার্বণে কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে গ্রামীণ জনপদ। কৃষকের নিজের সম্পদ বলে যা কিছু ছিল, তার সবই ফিরে আসবে আপন বৈশিষ্ট্যে। তবু কবি অত্যন্ত সচেতন হারানো স্বজনদের সম্পর্কে। ভবিষ্যতে ধান হয়তো ফলবে। মাঠে মাঠে কৃষকের আনন্দ হয়তো ফিরবে। কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া স্বজনদের তিনি ভুলবেন কীভাবে? তাই কৃষকের প্রকৃত আত্মার আত্মীয় কবি লেখেন “এই নবান্নে” :

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায় :
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,...
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে : কোথায় আপনজন?

(সুকান্ত; ২০০২: ৬১)

বিদ্রোহ-সংগ্রাম-আন্দোলন যা-ই বলা হোক না কেন, সুকান্তের কাব্যের প্রধান উপাদান কৃষি ও কৃষক এবং কায়িক শ্রম বিক্রি করা সাধারণ শ্রমিক। কেবল কায়িক শ্রম দিয়ে সভ্যতার অর্থনৈতিক

চাকা সচল রাখে যারা, তারাই সুকান্তকাব্যের প্রধান আত্মীয়। বিপ্লব-বিদ্রোহ-জনসম্পৃক্ততা নিয়ে কবির ভাবনা এবং কবিতায় তার প্রয়োগ হয়েছে সার্থকভাবে।

আসলে তাঁর মধ্যে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ছিল না। জনতার সংগ্রামকে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সুকান্ত নিজের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনে যেমন, তেমনি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ছিলেন অনমনীয়। সেখানে কোনো আপসের চিন্তা তাঁর চেতনায় ছিল না। (সূত্র: বদরুদ্দীন; ২০০২: ১৮) হয়তো সে-কারণেই লিখতে পেরেছেন "দুর্মর"-এর মতো কবিতা এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে পেরেছেন ঐক্যবদ্ধ শ্রেণিসংগ্রামে কৃষকের অধিকার আদায়ে 'রক্তে রঙিন ধান'-এর কথা। কেননা, 'সুকান্তের কবিতায় প্রতিষ্ঠিত যে প্রত্যয়, তার মৌলিক প্রেরণা শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত বন্দিনী দেশমাতৃকার মুক্তির অভীপ্সা এবং সমাজ দেশ ও রাজনীতির প্রতি আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি।' (ভীষ্মদেব; ২০০৪: ১৫৬) কবি ঘোষণা করেন :

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।...
এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালী নয়কো, রক্তে রঙিন ধান
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

(সুকান্ত; ২০০২: ১২৭)

উপর্যুক্ত কবিতায় অবিভক্ত ভারতের বৃহৎ বাংলাদেশের পরিচয় উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। তাঁর অস্তিত্ব ও 'চৈতন্যে অস্তিত্বশীল ছিল যে গর্বিত বাংলাদেশ—তার বৃহত্তর অংশজুড়ে ছিল নদীমেখলা দুই বাংলার ভূগোল ও ভুবন। যে-কারণে কবিতাটির শুরুতে তিনি বলেছেন, 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন/ হঠাৎ বাংলাদেশ।' উত্তরের হিমালয় থেকে দক্ষিণের সুন্দরবন পর্যন্ত সরলরৈখিক ভূপথ অন্যদিকে পশ্চিমাগত পদ্মার পূর্বমুখী উচ্ছ্বাস নিয়ে সুকান্তের গর্বিত বাংলাদেশের পরিচয়।...একদিকে অটল হিমালয় অন্যদিকে আরণ্যক সুন্দরবন আর প্রমত্তা পদ্মার আশ্রয় ও পরিচর্যায় গড়ে উঠেছে সুকান্তের চেতনাশ্রিত "বাংলাদেশের প্রাণ"।' (ভীষ্মদেব; ২০০৪: ১৫৬) এই প্রাণশক্তির কারণেই হয়তো জনতার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল কবির। সেই আত্মবিশ্বাস ও অকৃত্রিম চেতনার অধিকারী কবি

নিজের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে আমৃত্যু ছিলেন সংগ্রামী। কবির প্রত্যাশা, সংগ্রামী শ্রমজীবীরা তাদের অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখতে জরা-মৃত্যু-সংকট উপেক্ষা করে একদিন গাইবে 'মৃত্যুজয়ী' গান :

বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে
মুহূর্মুহূ রক্তপাতে স্বধর্ম সূচনা;
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়।...
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ—
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান।।

(সুকান্ত; ২০০২: ৫৮)

কেবল খাদ্যসংকট নয়, বস্ত্রসংকটের প্রসঙ্গও এসেছে সুকান্তের কবিতায়। শাসক ও শোষক শ্রেণির হিংসানলে পুড়ে কৃষক-শ্রমিক খাদ্য-সংকটে ভুগেছে, সর্বস্ব হারিয়েছে, হয়েছে বাস্তুচ্যুত। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদার কোনো একটি চাহিদা পূরণেরও নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে ঋতু পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনাচরণ বা পোশাক পরিচ্ছদে যে সামান্য পরিবর্তন আনতে হয়, সেই উপায়ও ছিল না খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের। সেই অধিকারবঞ্চিত মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে কবি লিখেছেন 'প্রার্থী' কবিতা। চিত্রকল্পের স্পষ্টতায় বস্ত্রহীন শীতার্ত মানুষের কষ্ট যেন চোখের সামনে হাজির হয় আবেগাপ্লুত আর্তি নিয়ে। সেই আর্তি প্রকাশিত হয়েছে সূর্যের কাছে, যে সূর্য শক্তির অনিঃশেষ উৎস। আসলে সূর্য নয়, যেন স্রষ্টার কাছে ব্যক্ত হয়েছে নিদারুণ করুণ আর্তি। 'দেশলাই' কাঠির মতো শীতপীড়িত মানুষকে যেন 'একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত' হতে উৎসাহ দিয়েছেন কবি :

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!

(সুকান্ত; ২০০২: ৩১)

পথের ধারে ছিন্নমূল মানুষের শীত নিবারণের এমন প্রচেষ্টা এখনো চোখে পড়ে। তাদের প্রতি আত্মীয়ের টান অনুভব করেছেন বলেই কবি বলতে পেরেছিলেন, 'তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে

পেয়ে/ একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে/ পরিণত হব!' (সুকান্ত; ২০০২: ৩১)

মানুষের জন্য নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে রোগে-শোকে ভুগেও যথাযথ চিকিৎসা নেওয়ার ফুসরত পাননি সুকান্ত। রোগমুক্তির চেয়ে দায়িত্বকেই বড় করে দেখেছেন তিনি। ফলে ১৯৪৭ সালের এপ্রিলের শুরুতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে—স্বাস্থ্যের ভয়াবহ অবনতির কারণে। সেখানে যাওয়ার সময় তাঁর বালিশের নিচে পাওয়া যায় কালজয়ী কবিতা 'হে মহাজীবন'। কবিতাটিতে জ্যঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিফলন লক্ষণীয়। মানুষের অস্তিত্বই যদি টিকে না থাকে, তবে সৌন্দর্য উপভোগ তাঁর কাছে বিলাসিতার শামিল। সেই সময়ের ভুখানাঙা মানুষের কথা চিন্তা করে, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে তিনি যেমন একাধিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, তেমনি যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন ক্ষুরধার লেখনী হাতে তুলে নিয়ে। জীবনের শেষ কবিতা "হে মহাজীবন"-এ ধরা পড়েছে তেমনই বিষয় :

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিতা-ঝঙ্কার মুছে পাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।।
(সুকান্ত; ২০০২: ৬৩)

মৃত্যুর (১২ মে ১৯৪৭) আগপর্যন্ত আজন্ম প্রতিশ্রুতিশীল-সাম্যবাদী এ কবির রাজনৈতিক প্রত্যয় ও ভাবনাজুড়ে ছিল বাংলার কৃষক-শ্রমিকসহ বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের প্রয়াস। তাঁর কবিতা চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে জনসমাজকে উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে। (অশোককুমার; ২০০২: ২৬১)

সাত

চল্লিশের দশকের এক প্রতিশ্রুতিশীল কবির নাম রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৮)। দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য যে রাজনৈতিক মতাদর্শকে ধারণ করে কবিতাচর্চা করেছেন, অভিন্ন আদর্শকে লালন করে তিনিও কাব্যচর্চা করে গেছেন। কিন্তু সমকালীন

সাহিত্য-সাময়িকীতে তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হলেও তিনি রয়ে গেছেন সাধারণ পাঠক-সমালোচকদের আড়ালে। বিশেষ আদর্শবাদী সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে সৃজনশীলতা কখনো কখনো স্তিমিত হয়ে পড়ে, অন্যান্য কর্ম-নিষ্ঠার কারণে। ফলে কবিতাসত্তার চেয়ে কর্মিসত্তা বেশি প্রাধান্য পেয়ে যায়। কবি রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। তবে তাঁর কালের প্রায় সব পত্রিকায় কবি হিসেবে সমাদৃত হলেও পরবর্তী সময়ে বাংলা কবিতার সংকলনগুলোতে তিনি সংকলক-সম্পাদকদের কাছে উপেক্ষিত থেকে গেছেন। এর সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি যেসব পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন, সেই সময় সেসব পত্রিকার ছিল সুপরিচিতি এবং প্রভাবশালী হিসেবে খ্যাতি। পত্রিকাগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *বিচিত্রা*, *শান্তি*, *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *পরিচয়*, *মাহে নও*, *সওগাত*, *দেশ*, *স্বাধীনতা* প্রভৃতি। (সূত্র: ভীষ্মদেব; ২০১২: ০৮)

চল্লিশের কবিতার মূল চেতনাকে ধারণ করে শ্রমজীবীদের স্বার্থ ও সমাজপরিবর্তনের সংগ্রামে লিপ্ত থেকে কবি রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী বেশ কিছু জনপ্রিয় কবিতারও জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু কবিতার পাশাপাশি তিনি অন্য মানবিক কর্মকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে 'সাহিত্যপত্র সম্পাদনা, লোক হিতকরী, উদ্যম, রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন আর খণ্ডকালীন সৃজন ও মূল্যায়ন-প্রয়াস—এই চতুর্মুখী কর্মধারায় বিভক্ত হয়েই চল্লিশের দশক এবং উত্তরকালের জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। তাঁর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ চতুর্মুখের কোনোটিই গৌণ নয়, সবকটিরই অভিমুখ মানবিক দায়বদ্ধতার দিকে, জীবন-জগৎ ও মানুষের কেন্দ্রে।' (সূত্র: ভীষ্মদেব: ২০১২: ৭) ফলে রোমান্টিকতার চেয়ে শ্রেণিচেতনার বাস্তবতা তাঁকে বেশি আলোড়িত করেছে। এমনকি প্রেমের কবিতাতে কখনো কখনো এসেছে সমাজচৈতন্যের সুর। কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ পেশাজীবীর মন থেকে শ্রেণিচেতনার পাশাপাশি তাঁদের ভাগ্যবিড়ম্বনা থেকে মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখেছেন স্থায়ী স্বাবলম্বী-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাই সক্ষম হয়েছেন 'কৃষক ছেলে' নামে কবিতা রচনা করতে।

একজন কৃষকের সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রেই কৃষক। তার জীবন ও জীবিকার পথ মসৃণ নয়। তাই সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখতেও ভীষণ কুণ্ঠিত। বংশপরম্পরায় এমন নাজুক দশা কবি মানতে চান না। কবিতাটিতে কৃষকের চিরকালীন দুরবস্থা, বঞ্চনার কথা নানা অনুষঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। কবির উপলব্ধি, অস্তগামী সূর্যের মতো ক্ষয়িষ্ণু তেজের হলেও কৃষক-সমাজে উত্তরাধিকারীগণ এক দিন কাঙ্ক্ষিত উৎসবে মিলিত হবে এবং তারা প্রাপ্তির আনন্দে জীবনের নতুনত্ব খুঁজে পাবে।

মাঠের প্রান্তে কিশোর বালক স্তিমিত দীপের শিখা
আঁকিয়াছে মুখ ক্ষীণ আলোকের লিখা।
নব সৃষ্টির ইতিহাস তার ধূলায় গিয়াছে মরে
হেরিলাম শত শূন্যের খেলা তার জীবনের ঘরে।
অবনত দেহভার
বহন করিয়া চলিছে বহ্নি বেদনার অনিবার।

(রথীন্দ্রকান্ত; ২০১২: ১৭)

বেদনার পর যদি সংশয়ের কালো মেঘ কেটে যায়, তবে তুমুল আনন্দের বার্তা আসে জীবনে। সেই আনন্দের ব্যাকুলতা থাকে না, তৃপ্তিতে পূর্ণ পায়। সেই আনন্দ থেকে আর কেউ বঞ্চিত হতে চায় না কেউ। তিনি শামিল হতে চান কাঙ্ক্ষিত সেই সাফল্য-সময়ে। তাই একই কবিতায় স্বগোক্তির মতো করে তিনি বলেন :

মাঠের প্রান্তে হেরিনু বালক
হেরিলাম নাকো হাসি
বিষ দিয়ে কেরে হরিল সে সুধারাশি?...
মহা ভবিষ্যে কোথা সেই শুভক্ষণ
কৃষক ছেলের হাসি উৎসবে আসিবে আমন্ত্রণ।
আমারে সেথায় টেনে
নিয়ে যাও সেই শুভ ভবিষ্যে ক্ষণিকের রথ এনে।

(রথীন্দ্রকান্ত; ২০১২: ১৭)

এরই সূত্র ধরে কবি প্রকৃত মানুষের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। কারণ, দ্বিতীয় 'মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যখন মহামন্বন্তর, তখনই সত্যিকার অর্থে ঘটক চৌধুরীর প্রকৃত কবিসত্তার জাগরণ সম্পন্ন হয়েছে...একাকার হয়ে গেছে তখন জীবন ও প্রেম, নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতা।' (সূত্র: ভীষ্মদেব; ২০১২: ০৯) বিশ্বযুদ্ধকালেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'অভ্যুদয়'। যুদ্ধ-মহামারি শেষে মানুষকে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন। নবজীবনের অভ্যুদয়ই যেন সকল অগ্রগতি মূল সূত্র। কারণ, 'আলোকিত নতুন আকাশ।' তাঁর এই মানুষ অবশ্য কায়িকশ্রমে উজ্জীবিত সাধারণ মানুষ। যেমন:

জনতার কল্লোল জাগে অনিরুদ্ধ গতি
ধূলি উড়ে ঘূর্ণিবেগে, অদৃশ্য অতীত;
নব জীবনের স্বপ্ন পৃথিবীর চোখে।
তাই আজ সত্য হোক্-তার জয়গান
পাক্ বরণ-সম্মান

দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষের জয়
নব জীবনের অভ্যুদয়।
(রথীন্দ্রকান্ত; ২০১২: ৩৮)

কবির এই 'নব জীবনের অভ্যুদয়' পূর্ণতা পাবে তখনই, যখন জনদাবি উচ্চকিত হবে বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিতে। শ্রমজীবনের বলিষ্ঠ দাবির কাছে নতজানু হবে সমস্ত শোষকের শির। কবির প্রত্যাশা, অচিরেই সে লক্ষ্য পূরণ হবে। কারণ, তিনি স্বপ্ন দেখেন, 'কৃষকের চোখ থেকে স্বপনেরা ঝাঁকে ঝাঁকে জমে/ মৃত্তিকারে করে নেবে জয়,/ যন্ত্রের উদ্ধত শির নত হবে সহস্রের কাছে,/ তার আগে কণ্ঠ থেকে কথার আগুন/ নিভিবে না কোনো ঝড়ে, কোনো বন্যা বেগে।' (রথীন্দ্রকান্ত; ২০১২: ৪১) কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতাদর্শের কবি হওয়ায় কবিতাকে তিনি বিপ্লব, আশাবাদ, জাগরণ ইত্যাদি সংকেতে প্রতীকায়িত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে কবিমনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে সামষ্টিক চেতনাগত ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। ফলে শ্রমজীবনের স্বত্বাধিকারীদের অধিকারের প্রতি সোচ্চার হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি গোটা সমাজের পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছেন। সমাজকে তিনি দেখেছেন ঐক্যবদ্ধ কৃষক বা শ্রমিকের জীবনের কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরের অবলম্বন হিসেবে। সেই রূপান্তরের রং লাল। কারণ বিনা বিপ্লবে কিংবা রক্তপাতহীনভাবে শোষকের কাছ থেকে অধিকার আদায় করা যায় না। তাই তিনি যে ভোরের স্বপ্ন দেখছেন, সেটিও রক্তিম। কবির ভাষায় :

লাল প্রভাতের শুভ দীপ্তি
নামে মাঠে, কৃষকের চোখে নেমে
দিয়ে যায় স্পর্শ;
ধূলিতে আলোর গান জাগ্রত প্রহরের,
পূর্বাচলের লাল সমুদ্র থেকে নামে রক্তিম বন্যা।...
জয় যাত্রার ধ্বজা ওড়ে দিক্ দিগন্তে
পূর্বাচলের লাল কল্লোলে বিজয়ের বার্তা।
(রথীন্দ্রকান্ত; ২০১২: ৪৯)

কবি রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরীর চল্লিশের দশকে রচিত কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ তাদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসেবে এবং স্বভাবজাত কবিতার চর্চার অংশ হিসেবে—সর্বোপরি রাজনীতি ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এসেছে। তাই বলা যায়, 'রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী কবিতানিহিত বিশ্বাসকে যাপিত জীবনের ধর্মে একীভূত করে রেখেছিলেন; তাঁর কবিতাবলি, তাই, তাঁর জীবনীপাঠেরই পরাপাঠ হয়ে উঠেছে। জীবন ও কবিতার এই মেলবন্ধন তাঁর কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের অভিমুখকেই উজ্জ্বল করেছে।' (সূত্র: ভীষ্মদেব; ২০১২: ১১)

আট

চল্লিশের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)। প্রথম মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৯১৯) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর কাব্যের সূচনাপর্ব সম্পন্ন হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার কলকাতায়। দেশভাগের পর, ১৯৫০ সালে তিনি পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন। ১৯৩৬ সালে কেবল কবি হওয়ার অন্তর্গত তাড়নায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন কলকাতার উদ্দেশে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য-শিল্প চর্চা করার জন্য প্রধান অনুকূল পরিবেশ তখন কলকাতা নগরকে ঘিরেই আবর্তিত। ঘর ছেড়ে সেখানে স্থায়ী হয়ে সাংবাদিকতা ও লেখালেখিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রচিত এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত কবিতা নিয়ে ১৯৪৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রি শেষ* প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ তাঁর কলকাতায় যাওয়ার পরই রচিত। কিন্তু যেহেতু তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল কেটেছে জন্মভূমি পিরোজপুরের শঙ্করপাশায়, তাই এ-কাব্যগ্রন্থে তাঁর ফেলে আসা সময় ও জীবনের ছাপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তিনি যে সময়ে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিলেন, সেই সময়টি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যায়। ফলে তখন ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের মনে রাজনৈতিক উত্তাপ বিরাজমান। রাজনীতি সচেতন মানুষ যেকোনো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি চায়। তাই তাঁর কবিতাও হয়ে উঠেছে রাজনীতি সচেতন। জীবিকার তাগিদ এবং লেখক হওয়ার তাড়নায় তৎকালীন বড় শহর কলকাতায় অবস্থানকালে কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটলেও উপাদান হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন পূর্ব বাংলার মাটি ও মানুষকে। কবিতার শব্দ-সন্নিবেশ এবং বিষয় নির্বাচনে বরাবরই তিনি ছিলেন শেকড়সন্ধানী। তাই তাঁর সম্পর্কে এ বক্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> আহসান হাবীবের মধ্যেও সমাজ-সচেতন মনোভঙ্গীর পরিচয় সেই যুগে স্পষ্ট। শব্দে ততটা নয়–যতটা বক্তব্যে।...একটা স্বপ্নের মত আচ্ছন্নতা আছে তাঁর শব্দ প্রয়োগে এবং ছন্দ নির্মাণে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যেটা, সে হচ্ছে, আমি সাধারণ মানুষের কথা বলব, যে সাধারণ মানুষ পথে কাজ করে, ইট খোলায় কাজ করে অথবা নদীর তীরে নৌকায় যখন আলকাতরা লাগানো হচ্ছে এই আলকাতরা লাগানো দেখছে এবং নিজের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা গণনা করছে। (সূত্র: সরদার; ১৯৬৯ : ২৮)

প্রকৃত স্বজন ও শেকড়কে কবিতার অন্তর্গত ভাবনায় রেখে আহসান হাবীব শিল্পিত পথে এগিয়ে গেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিজের অতীত, চেতনাগত নিসর্গ, খুব কাছের পেশাজীবীগণ, যুগ যুগ ধরে বঞ্চনাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া শ্রমজীবীরা নানা অনুষঙ্গে তাঁর কবিতায় ঠাঁই পেয়েছে। অতি আপন মৃত্তিকা, মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষ ও নিসর্গও তাঁর কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে

উঠেছে। পাশাপাশি সমাজচেতনা ও রাজনীতি সচেতনতা তাঁর কবিতার অবয়ব গঠনে রেখেছে অনবদ্য ভূমিকা। এই ধারা তাঁর কাব্যভুবনকে ধাপে ধাপে সমৃদ্ধশালী করেছে। তাই নিজেকে খুঁজে ফেরা, শেকড়কে অনুসন্ধান করা, স্মৃতিকাতরতা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত মানুষের মুক্তি প্রত্যাশা প্রভৃতি ক্রমশ তাঁর কবিতার অন্যতম প্রবণতা হয়ে ওঠে। তাই আহসান হাবীবের কবিপ্রতিভার বিকাশ ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে নিচের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> আহসান হাবীবের প্রধান কবি-কর্মে ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ (এখানে শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ) স্বদেশ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে আপন চরিত্রে চিত্রিত হতে পেরেছে, এবং এটাই আহসান হাবীবের কবিকৃতি সম্পর্কে প্রধান কথা। এই নিচুস্বরে কথা, তাৎপর্যময় কথা বলা তার কাব্যমানসিকতার স্বভাবধর্ম বলে মনে করি। তাঁর কবিতার চরিত্রধর্মে সমাজচেতনার সঙ্গে রোমান্টিকতার এক ধরনের সমন্বয় ঘটেছিল এবং সেখানে সমাজচেতনা ও মানবিক চেতনা খুব ঘনিষ্ঠ সমঝোতায় পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে গেছে। তার কাব্যবোধ এই দুইয়েরই অনুশাসন মেনে চলেছে।' (ভূমিকা; *আহসান হাবীব রচনাবলী*; ১৯৯৫: ষোলো)

তবে শুরু থেকেই যে আহসান হাবীবের কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে, তা নয়। প্রথম কাব্যে মাত্র একটি কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে। কবিতার নাম "সৈনিক"। প্রত্যেক শ্রমজীবীর জীবনই সংগ্রামের, যুদ্ধের। জীবনব্যাপী লড়াই করতে হয় তাদের। যারা জীবনযুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তারাই আহসান হাবীবের সৈনিক। শ্রমিকের নিত্যদিনের সংগ্রামের এ-বিষয়টিই কবিতাটিতে সেভাবেই শিল্পিত করেছেন কবি। যেমন :

তোমরা রাখো না মনে. মোরা কভু ভুলি না সাইরেন,
দুগ্ধপোষ্য শিশুসম আমাদের লুকিয়ে রাখেন
আমাদের গৃহিণীরা—কখন সাইরেন বাজে, ভয়!
জেটিতে জাহাজ ছাড়ে, মোরা ভাবি হয়েছে সময়।...
মাসান্তের মাসোহারা অর্ধেক বিলিয়ে দেই
একটি বস্ত্রের বিনিময়ে,...
পরদিন দুপুরে তো মেলে পুরস্কার!...
বাড়ি নিয়ে একসের বারো জনে খাই,
খানিক ঘুমাই।
আবার আসবে সন্ধ্যা—
আবার প্রতীক্ষা আর আবার দেহের রক্ত
বিন্দু বিন্দু ক্ষয়;
একি যুদ্ধ নয়!

(আহসান হাবীব; ১৯৯৫: ৩৪)

আহসান হাবীবের পরবর্তী কাব্যসমূহে সাধারণ মানুষ, তাদের জীবনের নানামুখী সংগ্রাম, মানুষের মৌলিক চাহিদা, বাঙালির ঐতিহ্য, দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিমানুষের হারানো দিনের আনন্দ-বেদনা, শৈশবের স্মৃতি, নস্টালজিয়া প্রভৃতি বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। অনেকের মতে, তিনি কবিজীবনের সাফল্যচূড়া স্পর্শ করেন অন্তিমপর্বের *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। তবে এভাবেও বলা যায়, আহসান হাবীব তাঁর ক্যব্যজীবনের প্রায় শুরু থেকেই যে চেতনাকে মনেপ্রাণে ধারণ করেছেন, ক্রমান্বয়ে তার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন সময়ানুসারে বিভিন্ন কাব্যের কবিতায়। তার সফলতম রূপ ধরা পড়েছে *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০) কাব্যে। এ-কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় এসেছে শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ। শুধু প্রসঙ্গ নয়, বেশ কিছু নামের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীদের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণিচরিত্রও তুলে এনেছেন কবি। অবশ্য তাঁদের জীবনমান পরিবর্তন, কিংবা তাঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামে কাতর হয়ে তিনি তাঁদের প্রসঙ্গ এনেছেন, তা নয়। বরং তাঁদের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন তিনি নিজের শেকড়ের গভীর সম্পর্ক বোঝাতে এবং নস্টালজিক উপাদানের সফল প্রয়োগের কৌশল হিসেবে।

কর্মসূত্রে এবং জীবিকার তাগিদে নগর জীবনের অধিবাসী হলেও কবির শেকড় প্রোথিত ছিল আজন্মলালিত পিরোজপুরের শঙ্করপাশার সবুজ বাসভূমে। যেখানে ভুবন কামার, খালিক নিকিরি আর জমিলার মায়েরা সারা বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে যেসব প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল—মানুষের সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটেই বলা যায়, তা এক শিল্পিত পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। পাথুরে জীবন ঘষে ঘষে মানুষ যেমন আলোর সন্ধান পেয়েছিল, কবিও যেন নানা টানাপোড়েন শেষে পেয়েছেন কাঙ্ক্ষিত কাব্যফসলের খোঁজ। যে কারণে কবি-আত্মার শেকড় এখানে স্বাদেশিক বোধের মাহাত্ম্য ছাড়িয়ে বৈশ্বিক কলেবরে প্রসারিত হয়েছে। ভুবন কামার, লক্ষ্মণ মুচি, আলেফ মুনশী, মতি সওদাগরের যে অবস্থান কবি নির্ণয় করেছেন, তাতে তারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সর্বজনীন জীবন-সংগ্রামী মানুষ হিসেবেই এ কাব্যে স্থান লাভ করেছে। কবির পুনঃআবিষ্কৃত এই চরিত্রগুলো অনেকটা গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রের মতো। এখানে তারা হয়ে উঠেছে গদ্য কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ রূপক।

গনগনে আগুন ধোঁয়া এবং বৃষ্টিপতনের উৎসব
এই সব নিয়ে
দু'পাশে রৌদ্রভুক সবুজ আর হলুদ সর্ষেক্ষেত কখনো
কোনোদিন আলেফ মুনশীর মেয়ে সখিনার মুখ
আর তার ভাত-বড়শির করুণ ফাৎনায় চোখ রেখে
খালেক নিকিরির নৌকো সিমলার খাল পার হ'য়ে যায়।

ভুবন কামারের কারখানা
লক্ষ্মণ মুচির একচালা আর
মতি সওদাগরের মুদিখানা ছাড়িয়ে
তার নৌকো যখন লালাবাবুর হাট বরাবর
খালেকের হাতে তখন সরু আর মোটা মোটা দু'টি শনের রশি
স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট আবেশে কাঁপতে থাকে,
(আহসান হাবীব; ১৯৯৫: ২৪৮-২৪৯)

আহসান হাবীবের শ্রমজীবী মানুষ আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা সুকান্ত ভট্টচার্যের শ্রমজীবী মানুষ এক নয়। তাঁরা শ্রমজীবীদের সংগ্রামী জীবন ও বঞ্চনার অবসান চেয়েছেন—তাদের জাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু আহসান হাবীবের কবিতায় শ্রমজীবী মানুষ এসেছে কবিতার অতি প্রয়োজনে—বেশির ভাগ সময় রূপক কিংবা উপমান চিত্র-চরিত্র ও চিত্রকল্প হিসেবে।

নয়

চল্লিশের দশকের জটিল রাজনীতি-প্রভাবিত সময়েও যে বিশিষ্ট কবি কেবল খোলাফায়ে রাশেদিনের মতো করে বাঙালি মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন বিভোর ছিলেন, তিনি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)। ভাষার ব্যবহারের দিক থেকে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হলেও কবিতার বিষয় হিসেবে তিনি যা বেছে নিয়েছেন, তা সর্বজনীন নয়। তাঁর কবিতায় মানুষ বলতে ইসলামের অনুসারীদের কথা বলা হয়েছে। তিনি তেমন মানুষদের জন্যই পাকিস্তান নামক একটি ধর্মরাষ্ট্রের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানবতাবাদী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বামপন্থাকে অন্যতম দর্শন মনে করতেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের আদর্শের কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সবকিছু বিবেচনার একধরনের প্রচেষ্টা ছিল প্রবল। সে-কারণে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেও নজরুল যেখানে দল-মত-নির্বিশেষে .জাতীয় জাগরণের কবি, সেখানে ফররুখ আহমদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ধর্মবাদী বা পাকিস্তানবাদী কবি হিসেবে। ধর্মভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নে নিজের ভেতরে ধারণ করা রোমান্টিকতাই তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয়। ফলে সমাজের সাধারণ মানুষ বা শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে আসেনি। কেননা, তিনি ছিলেন 'মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী কবি। পাকিস্তানবাদ, ইসলামিক আদর্শ এবং আরব ইরানের ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত। আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর কবিতা এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।' (সূত্র: শামসুজ্জামান;

২০০১: ৩৩১) এসব সত্ত্বেও *সাতসাগরের মাঝি* তাঁর জীবনের সেরা সৃষ্টি। আধুনিক কাব্যসৃজন-কৌশল, সমকালীন বিষয় নির্বাচন, কাব্যের গাঁথুনি, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারের নৈপুণ্য বাংলা কাব্যেও নতুনত্ব এনেছিল। তবে এ কাব্যগ্রন্থের 'লাশ' কবিতা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কবিতায় শ্রমজীবন-প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। মূলত ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের চিত্র তাঁকে রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে এনছিল। এ-কবিতায় সামান্য হলেও শ্রমিকের প্রসঙ্গ এসেছে। আশ্চর্যজনকভাবে কবিতাটিতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যময় ব্যবহারের চেয়ে কেবল প্রচলিত বাংলা শব্দের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গ তিনি :

এ কোন্ সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে
করে পরিহাস?
কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে...
কার হাত অনায়াসে শিশু কণ্ঠে হেনে যায় চুরি
কোন্ সভ্যতার?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য সুর জেগে ওঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?
কোন্ সভ্যতার?

(ফররুখ; ২০০৯: ৬৫)

চল্লিশের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ কবি সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২)। সারাজীবন তিনি বহুমাত্রিক সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন। একাধারে অধ্যাপক, সমালোচক, অনুবাদক, প্রশাসক, মন্ত্রক—বিচিত্র কর্মযজ্ঞে সৃষ্টিশীল ছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি চল্লিশের দশকের কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। চল্লিশের দশকের টালমাটাল রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কবি-সাহিত্যিকেরা তখন মননগতভাবে ছিলেন দ্বিধাবিভক্ত। কারণ, পাকিস্তান আন্দোলন সেই সময়ের মুসলমান সাহিত্যিকদের একধরনের নতুন স্বপ্নে বিভোর করে রেখেছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন ফররুখ আহমদ। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'কাব্যজীবনের শুরুতে সৈয়দ আলী আহসান এ পথেরই পথিক ছিলেন। চল্লিশের দশকের সম্ভাবনাময় কবি হিসাবে তিনি এ ধারার কবিতা লিখেই খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কবিতাগুলো একত্র করে কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেননি।' (ভূমিকা: মোহাম্মদ আজম; *নির্বাচিত কবিতা*; ২০১৬: আট) অনেক পরে তাঁর কবিতাগুলো কাব্যগ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। কিন্তু তাতে পাকিস্তানবাদী আরবি-

ফারসি মিশ্রিত কবিতাবলির স্থান হয়নি। তবে ওই সব কবিতা পূর্বে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হওয়ার কারণে সেগুলো পাঠকমনে রয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর ওই পরিচিতি রয়ে গেছে। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বিশ্বের উন্নত বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণের সুবাদে তাঁর কাব্যসৃষ্টির ধারায় পরিবর্তন ঘটে বলে ধারণা করা হয়। তাই ১৯৫৯ সালের প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অনেক আকাশ* সেইসব কবিতা ও প্রবণতা থেকে মুক্ত। বাংলাদেশের সাহিত্যে পশ্চিমা প্রভাবিত আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরু বলা যায়। কারণ, '১৯৫৬ সালের পর থেকে তিনি ব্যাপকভাবে বিদেশ-ভ্রমণ করেন। এ সময় প্রধানত ইংরেজি আর ফরাসি-জর্মন কবিতার সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল।...বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর বহু কবিতায় স্থান পেয়েছে।' (ভূমিকা: মোহাম্মদ আজম; *নির্বাচিত কবিতা*; ২০১৬: আট) ব্যক্তি ও কর্মজীবনের প্রভাব পড়েছে তাঁর কবিতাসৃষ্টিতে। এই সব নিয়ে তাঁর কবিসত্তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় দেশ কিংবা দেশের মানুষ অথবা সাধারণ মানুষের কোনো অবস্থার চিত্রই পাওয়া যায় না। তাই আমাদের অন্বিষ্ট শ্রমজীবন তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া ভার। কারণ, ত্রিশের কবিদের মতোই তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তবে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *উচ্চারণ*-এর একটি কবিতায় কৃষিজীবী মানুষের শ্রমনিষ্ঠ ফসল ধানের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে কেবল কবিতার শরীর সমৃদ্ধ করতে—কোনো শ্রমিক বা সাধারণ মানুষের পক্ষাবলম্বন তাতে ফুটে ওঠেনি। সংখ্যাসহ কবিতাটির নাম "উচ্চারণ: ৮৪"। সেখানে তিনি উচ্চারণ করেছেন : 'তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি আসবো।/ ধান-কাটার শেষ মাঠের শূন্যতার মধ্যে/ অপেক্ষা কোরো,/ গ্রীষ্মের তাপের মধ্যে অপেক্ষা কোরো।' (সৈয়দ আলী আহসান; ২০১৬: ৭৩) *আমার প্রতিদিনের শব্দ* কাব্যগ্রন্থের "দেশে ফেরার পর" কবিতায় রয়েছে জমিচাষ ও শস্যের প্রসঙ্গ: 'আমি চলে যাব কিন্তু আমার ছেলে/ নতুন করে ভূমি কর্ষণ করবে—/ নতুন রক্তের তাপ তার শরীরে, সে/ আমার ভবিষ্যৎ/...জীবনকে দেখেছি মৃত্যুর শাখায়/ একটি ফলের মতো—/ পাহাড়ে, সমতটে, শস্যভূমিতে আগুন।' (সৈয়দ আলী আহসান; ২০১৬: ৭৮-৭৯) একইভাবে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত *সমুদ্রেই যাব* কাব্যগ্রন্থের "প্রতিবাদের শব্দ" 'ধানক্ষেত', 'গম' 'নৌকা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তিনি যে কোনো শ্রমজীবনকে তুলে ধরতে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, তেমনাটা নিশ্চিত করে বলা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে কবিতার চরণে স্মৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি খানিকটা কাতরতা ফুটে উঠেছে। যেমন: 'বাতাস না পেলে নদীতে নৌকা চলতে চায় না,/ বাতাস না পেলে আগুন জ্বলে ওঠে না,/... নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যাদের সঙ্গে/ গতি-ত্রস্তে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো,/ ধনক্ষেতের মধে পথ খুঁজতে গিয়ে/ পায়ের পাতা রক্তাক্ত

হয়েছিলো/...সিক্ত মাটিতে গমের অঙ্কুরে ছিলো/ আমাদের আশ্বাস—/ কিন্তু সেদিনকার সম্মিলিত জীবন-স্বাদ/ আজ অস্বীকারের আবর্তের মধ্যে।' (সৈয়দ আলী আহসান; ২০১৬: ৯৪-৯৬) সৈয়দ আলী আহসান বাংলা কবিতার মননশীল কবিদের একজন। তাই তাঁর কাব্যরস ভিন্ন স্বাদের; এর রচনাকৌশলও ভিন্ন।

উপর্যুক্ত কবিতা বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, কৃষক ও শ্রমজীবনকে প্রাধান্য দিয়ে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন, এমন কবির সংখ্যায় সব সময়ই হাতেগোনা। তবে সমাজের উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এই শ্রেণিকে নিয়ে আধুনিক ও সমাজমনস্ক বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে যাঁরা ভেবেছেন, সৃজনপ্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট থেকেছেন, তাঁদের কবিতায় তারা গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে যাত্রা শুরু করা সেই সব প্রতিশ্রুতিশীল কবির কবিতাই বিশ্লেষণভুক্ত হবে।

টীকা

---

১ 'অসমবয়সী' শব্দটি 'কিশোর কবি' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর মতো এত কম বয়সে বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবির প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। তিনি স্বল্পায়ু হয়েও যে সৃষ্টিপ্রতিভা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেছেন, ৭০-৮০ বছরের পূর্ণ জীবন পেয়েও অনেকে তা করতে পারেননি। কিন্তু 'কিশোর কবি' বলে যে বিশেষণ তাঁর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে, তা তাঁকে কবিতার পাঠকদের কাছে অপরিপক্ব কবি হিসেবে পরিগণিত করে থাকে। ফলে সচরাচর গভীর মনোনিবেশ ছাড়াই তাঁর কবিতা পাঠ করা হয়। আসলে তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনার মান ও গভীরতা কোনো অংশেই প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো কবির চেয়ে কম নয়। সেই পরিপক্বতা ছিল বলেই অনেক বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের মুখপত্র *আকাল* সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ওপর।

সহায়ক পঞ্জি

আকরগ্রন্থ

আহমদ রফিক [সম্পা.] (১৯৯৫)। *আহসান হাবীব রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জসীমউদ্‌দীন (১৯৬১)। *সূচয়নী*। পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ (২০০২)। *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র*। জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা

দীনেশ দাস (১৯৮৩)। *দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার [সম্পা.] (১৯৮৯)। *বিষ্ণু দে কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৮৯)। *কবিতা সমগ্র*। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বদরুদ্দীন উমর [ভূমিকা] (২০০২)। *সুকান্ত সমগ্র*। চারুলিপি, ঢাকা

বিষ্ণু দে (১৩৫৪)। *সন্দ্বীপের চর*। দি বুকম্যান, কলকাতা

—(১৯৫৫)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। নাভানা, কলকাতা

বিহারীলাল চক্রবর্তী (২০০০)। *বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু [সম্পা.] (২০১০)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যসংগ্রহ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী [সম্পা.] (২০১২)। *অভ্যুদয়*, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী। মেগনাম ওপাস, ঢাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯৪২)। *মধুসূদন রচনাবলী*। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

মোহাম্মদ আজম [সম্পা.] (২০১৬)। *নির্বাচিত কবিতা : সৈয়দ আলী আহসান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (১১ খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

—(২০১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (১৩ খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

—(১৯৮০)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

—(১৯৮৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সমর সেন (২০১২)। *সমর সেনের কবিতা*। সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২০০৮)। *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

—(১৯৯৫)। *জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ*, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী

অশোক ভট্টাচার্য (১৩৬৫)। *কবি সুকান্ত*। সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা

অশোককুমার মিশ্র (২০০২)। *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা* (১৯০১-২০০০)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার (১৩৮১)। *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

—(২০০০)। *চোখের দুটি তারা*। প্যাপিরাস, কলকাতা

আতাউর রহমান (১৯৭৪)। *নজরুল কাব্যসমীক্ষা*। মুক্তধারা, ঢাকা

আহমদ রফিক (২০১০)। *বিষ্ণু দে : কবি ও কবিতা*। বিভাস, ঢাকা

আহমেদ মাওলা (২০০৭)। *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গৌরিকা ঘোষ (২০০৫)। *স্বাধীনতা ও পরবর্তী বাংলা কবিতা*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

গোলাম মুরশিদ (২০১৮)। *বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল-জীবনী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

জহর সেনমজুমদার (১৯৯৮)। *বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০১২)। *বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ*। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা

তারেক রেজা (২০১০)। *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৮৪)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৮)। *কবি এবং কবিতার বিষয়-আশয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৫)। *আধুনিক কবিতার রূপরেখা*। প্রকাশ ভবন, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৭)। *কালের পুতুল*। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা

বৃন্দাবন কর্মকার (২০০৭)। *সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০১০)। *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

—(২০১৯)। *রবীন্দ্রকবিতার বাতায়ন*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০০৪)। *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় (২০১৭)। *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*। সেতু প্রকাশনী, কলকাতা

মাহবুব সাদিক (১৯৯১)। *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুবুল হক (২০০৫)। *তিনজন আধুনিক কবি: সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য*। নয়াউদ্যোগ, কলকাতা

—(২০১০)। *নজরুল তারিখ অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুস্তাফা পান্না (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সমর সেন (১৯৭৮)। *বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৮)। *বাংলা কবিতার কালান্তর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র (২০০৬)। *সুকান্তের জীবন ও কাব্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সিদ্দিকা মাহমুদা (১৯৯২)। *সুধীন্দ্রনাথ: কবি ও কাব্য*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৩)। *জসীমউদ্‌দীন: কবিমানস ও কাব্যসাধনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১৬)। *আধুনিক কবিতার চালচিত্র*। সাহিত্যলোক, কলকাতা

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাপ্পাদিত্য জানা [সম্পা.] (২০১৭)। *আন্দোলন ঘটনা ও কবিতা*। অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু [সম্পা.] (১৯৬৩)। *আধুনিক কবিতা*। এম, সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শামসুজ্জমান [সম্পা.] (২০০১)। *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সন্দীপ দত্ত [সম্পা.] (২০১২)। *সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য*। র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা

সংকলন ও সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯)। 'পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা'। *আমাদের সাহিত্য* [সম্পা. সরদার ফজলুল করিম]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সাহিত্য-সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭)। 'সমর সেন প্রসঙ্গে'। 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা' [সম্পা. পুলক চন্দ]। *অনুষ্টুপ* [অনিল আচার্য সম্পা.]। কলকাতা

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন : উপাদান ও সৃজনবৈশিষ্ট্য

সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর থেকে বাংলা কবিতার মহাসড়কে 'বাংলাদেশের কবি' বলে পৃথক কবিস্বভাবের আবির্ভাব এবং 'বাংলাদেশের কবিতা' বলে নতুন কবিতা-প্রতিমার আগমন ঘটে। হাজার বছরের ঐতিহ্যের স্রোতে ধাবমান বাংলা কবিতার ধারা থেকে উৎসারিত হলেও এ-কবিতার শরীরে প্রতিফলিত রূপ, রস, শব্দ, চিত্রকল্প, স্বপ্ন, সম্ভাবনা—সবই নতুন। এর প্রধান কারণ ভৌগোলিক সীমানার নতুনত্ব এবং কবিদের অবস্থানগত পরিবর্তন। ফলে কবিদের বিচক্ষণতা এবং তাঁদের নতুন স্বপ্নে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাই বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই বাংলাদেশের কবিতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো: বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তখন থেকেই এই ভূখণ্ডের মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভক্তি (১৯৪৭) বলেই একাত্তরে বিজয়ের আগে এই ভূখণ্ডের মানুষ পাকিস্তানের অধীন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক ছিল। তারও আগে ছিল অবিভক্ত ভারত তথা ব্রিটিশ নাগরিক। এভাবে পেছন ফিরে তাকালে এ দেশের মানুষ নাগরিকত্ব নিয়ে নানা জটিল হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এ দেশের মানুষের ভাষাভিত্তিক পরিচয় খোঁজ করলে দেখা যায়, হাজার বছর পেছনে গেলেও এ অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচয় অভিন্ন থাকে। অর্থাৎ যখন আমাদের স্বাধীন ভূখণ্ড ছিল না, তখনো আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলেছি, বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছি, বাংলা ভাষাতেই আমাদের সংস্কৃতি চর্চা করে স্বকীয়তা অর্জন করেছি।

তাই বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মাত্র অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও বাংলা ভাষী এবং বাঙালির পথচলার ইতিহাস কয়েক শতাব্দী পরিব্যাপ্ত। অবিভক্ত বাংলার বেশির ভাগ মানুষের (অন্য ভাষাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীও ছিল অনেক আগে থেকেই, আছে এখনো) জাতিগত পরিচয় বাঙালি, তাদের ভাষার নাম বাংলা। এই ভূখণ্ড জবরদখলের শিকার হয়েছে বারবার। ক্ষমতার পালাবদলের শিকার হয়েছে পৃথিবীর নানা সাম্রাজ্যবাদী জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা। সে-কারণে বাঙালি তার অস্তিত্ববিকাশে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে, বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, অস্তিত্ব-সংকটে পড়েছে, কিন্তু বিলীন হয়ে যায়নি। তাই নাগরিকত্বের নানা মোড়কে বাঁধা পড়লেও বাঙালি তার অগ্রযাত্রা অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির দৈশিক সীমানা বলতে মোটাদাগে বোঝাত পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়, চল্লিশের দশকের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় উৎপাদক বড় হয়ে দেখা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির কবিতায় স্বপ্ন-সংকট-সম্ভাবনা ছিল প্রায়

অভিন্ন। তখন সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র ছিল কলকাতা। পূর্ববঙ্গের লেখক-শিল্পী-কবিদের মধ্যে অনেকেই তখন জীবন-জীবিকা ও স্বপ্নবুননের অভীপ্সায় কলকাতার বাসিন্দা। শিল্পী জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-১৯৭৬) থেকে শুরু করে কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) পর্যন্ত সকলের মধ্যেই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির অভীপ্সা। আর পত্রিকা হিসেবে *সওগাত* থেকে *ইত্তেহাদ*—সবাই এবং সব তখন ঔপনেবিশক শাসনের কবল থেকে মুক্তি খুঁজছিল। এই সব শিল্পী-কবিতাকর্মীর মধ্যে সংকটের উপলব্ধি ও স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথ একই রকম হলেও স্থানকালগত শেকড়ের ভিন্নতা ছিল স্পষ্ট।

যেহেতু ধর্ম-বিভাজিত রাজনীতির সূত্রে হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয় সবাইকেই, সেহেতু হাজার বছরের অভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায় স্থায়ী রাষ্ট্রিক সীমানা-দেয়াল (১৪ আগস্ট ১৯৪৭)। ফলে পূর্ববঙ্গের কলকাতাবাসী কবি-লেখক-শিল্পীদের নাগরিকত্বের বদল ঘটে। তাঁরা স্থায়ী হন খণ্ডিত হওয়া নিজস্ব ভূখণ্ডে। ১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন এই ভূখণ্ডের কবি-শিল্পীদের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা দান করে। এই স্বকীয়তাতেই ধরা পড়ে নতুন সংকটের চিত্র, নতুন স্বপ্নের বার্তা, নতুন শত্রুর পরিচয়, নতুন সম্ভাবনার মন্ত্র। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ভাস্বর এই সব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ কবিতাই বাংলাদেশের কবিতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যুদয়ের আগে বাংলাদেশের মানুষ ও সংস্কৃতির প্রচ্ছায়ায় ২১ বছরের সাহিত্যসাধনায় মৌলিকত্ব নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশের কবিতা। ফলে সাতচল্লিশের দেশভাগের কাল-পরিসর থেকেই বাংলাদেশের কবি ও কবিতার (সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও) জগতে সমমনা বেশ কয়েকজন তরুণের আবির্ভাব ঘটে সাহিত্যের এ-নতুন আঙিনায়। তাঁদের সৃষ্টিতে নতুন প্রতিশ্রুতি, নতুন বিশ্বাস, কবিতার নতুন ভাষা নির্মাণ, নতুন চিত্রকল্প—সবকিছুর নতুনত্ব গোটা বাংলা কবিতার মহাসড়ককে এক অন্য রকম আধুনিকতায় উন্নীত করে। এই ধারার কবিতায় বড়ো হয়ে ওঠে সমাজ ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দায়বদ্ধতা। ত্রিশের কবিদের আত্মকেন্দ্রিক উপস্থাপনা যেমন চল্লিশে এসে সমর-সুভাষ-সুকান্ত প্রমুখের হাতে সমাজ-সচেতন ধারায় পরিবর্তিত ও মুখরিত হয়, তেমনি সাতচল্লিশ-পরবর্তী বা পঞ্চাশের বাংলাদেশের কবিগণ যেন সেখান থেকেই শুরু করেন—তাঁদের চেয়েও মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ ও সমাজঘনিষ্ঠ হয়ে—দেশাত্মবোধের মৌলিক প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এই কবিগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি প্রতিজ্ঞায় অবিচল, তাঁদের এ কাব্যভাষা নতুনত্বে উজ্জ্বল। উপস্থাপনা ও শব্দচয়নেও তাঁরা আধুনিক। তাঁদের ভাষা মুখের ভাষার নিকটবর্তী। অনেক ক্ষেত্রে

নাগরিক মধ্যবিত্তের কথোপকথনের অনুষঙ্গী; সংঘবদ্ধভাবে না হলেও অভিন্ন লক্ষ্যে বাংলাদেশের কবিতার যে জয়যাত্রা এই পঞ্চাশের প্রজন্ম শুরু করেন, তারই প্রকাশিত রূপ পাওয়া যায় আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কবিতা সংকলন *নতুন কবিতা* এবং ১৯৫৩ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে। দুটি সংকলনের প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন। তবে এই দুই সংকলনে স্থান পাওয়া কবিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরবর্তী পাঁচ দশক বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। বলা যায়, তাঁরা রাজত্বও করে গেছেন।

এই দুই সংকলনের কবিরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে ফজলে লোহানী সম্পাদিত *অগত্যা* পত্রিকাকে ঘিরে তখনকার সম্ভাবনাময় তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা সাহিত্যচর্চার পথে নিজেদের সমৃদ্ধ করছিলেন। নিয়মিত নতুন পাঠ, আড্ডা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তরুণেরা নিজেদের পথ খুঁজছিলেন। *নতুন কবিতা* সংকলনে তেরোজন কবির কয়েকটি করে কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয়ের ভাষ্য, 'সংকলনের অনেক কবিতা নানা সাময়িকীতে পূর্ব্বেই প্রকাশ পেয়েছে।' (আশ্‌রাফ ও রশীদ; ১৯৫০: ছয়) ১৯৫০ সালে *নতুন কবিতার* আগে বাংলাদেশের কবিদের কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি। যেহেতু এ রকম সংকলন 'নতুন দেশে' প্রথম, তা-ই সম্পাদকদ্বয়ের কণ্ঠে ছিল বুকভরা আশা। তাঁরা এ-সংকলনের মধ্য দিয়ে একটা নতুন যুগের আরম্ভ করছেন বলে একধরনের শ্লাঘাও অনুভব করেছেন। এ-কবিদের সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন :

> এগিয়ে চলার ছন্দে তাঁরা আজ সুবিন্যস্ত। বিশেষতঃ কবিতার রাজ্যে এই বিরাট প্রাণস্পন্দন ও আলোড়নকে "বাংলা কাব্যে রেঁণেসা-যুগ" বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বাংলা সাহিত্যে রেঁণেসা-যুগ বলে কোনো যুগ নেই। সুতরাং আমরা বিনাদ্বিধায় এ কথার ব্যবহার করতে পারি। এই "রেঁণেসা-যুগের" সামান্য আভাস বহণ করছে বর্ত্তমান-সংকলন। (আশ্‌রাফ ও রশীদ; ১৯৫০: ছয়)

এ-সংকলনের যাঁদের কবিতা স্থান পেয়েছিল, তাঁরা হলেন হাবীবুর রহমান (১৯২১-১৯৭৬), মুফাখ্‌খারুল ইসলাম (১৯২১-২০০৭), মনোজ রায় চৌধুরী (১৯২২-?), চৌধুরী ওসমান (১৯২২-১৯৮৬), আশ্‌রাফ সিদ্দিকী (১৯২৬-২০২০), আবদুর রশীদ খান (১৯২৭), মযহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০০৩), মোহাম্মদ মামুন (১৯২৭-?), জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩১-২০০৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০)। এই কবিগণকে নিয়ে সম্পাদকদের যে উচ্চাশা বা 'রেঁণেসা'র স্বপ্ন ছিল, তা অনেকাংশেই ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ এ-

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তেরোজন কবির সবাই বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আজাদ ও হাসান হাফিজুর রহমান ছাড়া কবি হিসেবে আর কেউ প্রতিষ্ঠা পাননি। নতুন দেশ, নতুন স্বপ্ন, কবিতার ভাষায় নতুনত্ব খোঁজা, তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রভৃতি নানা দিক পর্যালোচনা করলে সংকলনটি বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে ফেরা ইসলামি চেতনার স্বরূপ-সন্ধান আর চল্লিশের কবিতার ভিন্নপথ নির্মাতা ফররুখ আহমদের ইসলামি রেনেসাঁসের রূপায়ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নই এ-সংকলন প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানকে তাঁরা মুসলমানদের স্বপ্নভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, তাঁদের অনেকের কবিতা ফররুখ আহমদের কবিতার মতো রোমান্টিকতায় পূর্ণ; শব্দচয়নেও ছিল অনুকরণ। সমকাল বিচারে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দীর্ঘ পথপরিক্রমায় লক্ষণীয়, সেই চেতনা আর প্রসারিত হয়নি—মানুষ সেটাকে গ্রহণ করেনি। কারণ, তাঁদের কবিতায় আরোপিত বিশ্বাসকে পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন দেশের প্রয়োজন কেন ছিল, কেনই-বা দেশভাগকে 'স্বাধীনতা' বলা হলো, তার সুনির্দিষ্ট অনুষঙ্গ তাদের কবিতায় অদৃশ্য। কিন্তু তাদের কবিতায় একধরনের ধর্মাশ্রয়ী ঘোরের উপস্থিতি দৃশ্যমান। যে-ভূখণ্ডের বেশির ভাগ মানুষ ছিল কৃষিজীবী, শহুরে বা নগরজীবনে কেবল অভ্যস্ত উঠতি তরুণদেরও বেশির ভাগেরই উঠে আসা কৃষক পরিবার থেকে, তাঁদের কবিতায় সেই সাধারণ বা বঞ্চিত কিংবা শোষিত মানুষের স্বপ্ন-বঞ্চনা-আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ আসবে, সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ কবির কবিতায় ব্যক্তিগত স্বপ্ন-সাধের চিত্রায়ণ ঘটেছে। মাত্র দুজন কবির কবিতায় এসেছে আমাদের অন্বিষ্ট শ্রমজীবনের প্রসঙ্গ। তাঁরা হলেন মুফাখ্খারুল ইসলাম ও মযহারুল ইসলাম । তাঁদের তিনটি করে কবিতা ছাপা হয় এ-সংকলনে। এর মধ্যে একটি করে কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁদের কবিতায় কিছুটা শেকড়ের সন্ধানও পাওয়া যায়। 'স্বাধীন' দেশেও তাদের জীবনের প্রতিকূলতাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উল্লেখিত সংকলনে তেরোজন কবির মধ্যে দুজন কবিই যেন সত্যিকার অর্থে নিজের দেশ এবং জীবনযুদ্ধে লড়াইরত মানুষের কথা ভেবেছেন। অথচ তাঁরা পরে কবিসত্তাকে খুব বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেননি। তাই "আকস্মিক" কবিতায় হঠাৎ করেই মুফাখ্খারুল ইসলাম আবিষ্ট হন নতুন এক উপলব্ধিতে। তিনি প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেন সমাজে উঁচুতলার দিকে, যদি কৃষক আর ধান না ফলায়, তারা শোষকের জন্য যদি খাদ্য সরবরাহ না করে—যদি সচকিত হয়ে ওঠে নিজেদের

অধিকারের চেতনায়, তারপরও কি শোষকেরা তাদের শোষণকার্য চালাতেই থাকবে? তাঁর কবিতা যেন নতুন ভাষা খোঁজার আন্তরিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের পক্ষাবলম্বন করেছেন :

আজিকে চকিতে যদি বিক্ষুব্ধ কাজল মাটি ঠেলি'
ধানের মঞ্জরীবদ্ধ প্রাণ না গজায়ে
মাঠে মাঠে তীরের সুতীক্ষ্ণ ফলারাশি
চাপা রোষ বিস্ফোরণে
শীর্ষে শীর্ষে লেলিহান রক্ততৃষ্ণা দেয় সে উন্মেলি'?
আর, ওই ভারবাহী কুব্জপৃষ্ঠ চাষী...
শ্রেণীবিশেষের তরে আজ নাহি ফলায়ে ফসল
শোষকের মেদচর্ব্বি বৃদ্ধি আর করিতে না চায়
বল্লমের তীক্ষ্ণশীর্ষে ভ'রে তোলে স্বীয় মর্ম্মমূল
ঝলকি, নতুন দিনে ফুটায়ে জালিম-বক্ষে হুল।

(সূত্র: আশ্রাফ ও রশীদ; ১৯৫০: পনেরো)

কৃষকের বঞ্চনা ও বেদনাকে মর্মমূলে ধারণ করে তিনি সমাজের উঁচুতলার কিংবা ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষকে সতর্ক করেছেন। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, তখনকার রাজনৈতিক অবস্থাদি বিবেচনা করে বঞ্চিত কৃষক বা শ্রমিক যদি তাদের খাদ্য সরবরাহর স্থগিত করে কিংবা সেবাদান থেকে নিজেদের বিরত রাখে, যদি 'আকস্মিক'ভাবে তেমন একটা উত্থান ঘটে, 'তবে কি তোমরা আজ মানিবে বিস্ময়?' আর মযহারুল ইসলাম দেশবিভাগের ফলে 'স্বাধীনতা'কে অভ্যর্থনা জানাতে চাইছেন "নমস্কার" কবিতার মধ্য দিয়ে। মূলত সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রত্যাশিত প্রকৃত স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এনে স্বাগত জানাতে চেয়েছেন এভাবে: 'দুর্গত মানুষের বন্ধু হে আমার,/ তোমারে নোতুন করে জানাই এবার/ হৃদয়ের রাঙা নমস্কার।' (সূত্র: আশ্রাফ ও রশীদ; ১৯৫০: তিপ্পান্ন) এই 'রাঙা নমস্কার' শব্দযুগলের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করলেও তিনি সামাজিক দৃষ্টিতে সবকিছুকে দেখার চেষ্টা করেছেন; আবেগে গা ভাসিয়ে দেননি। কবি ভুলে যাননি স্বাধীনতার প্রকৃত মর্মবাণী। কারণ দীর্ঘ যুগের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ফলে শোষিত বা ক্ষুধিত, নির্যাতিত মানুষের মনে বিরাজমান আকাঙ্ক্ষার যে তৃষ্ণা জমাট বেঁধেছে, তাকে তুলনা করেছেন ঝড়ের সঙ্গে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা তখনো টাটকা। মানুষ আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারেনি ব্রিটিশদের ওপর। কিন্তু প্রাপ্ত সেই স্বাধীনতা সমাজের সাধারণ মানুষের বিপরীতে গড়ে ওঠা বিভেদের দেয়াল ভেঙে দিক, কবি সেটাও চেয়েছেন। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এ কবিতায় :

আমার মনে ঝড় ক্ষুধার জ্বালায়
ধুঁকে মরে কোন এক আকাশ কোণায়,
ক্ষুধিতের দীর্ঘশ্বাসে গড়া সেই ঝড়—
বঞ্চিতের ব্যথা নিয়ে গড়া সেই ঝড়,...
ভেঙে দিক, ভেঙে দিক বিভেদের কঠিন প্রাচীর,
ভেঙে দিক ভুলে-গড়া মেরুদণ্ড এই পৃথিবীর।
মুষ্টিমেয় মানুষের সুখের পৃথিবী যদি হয়
ভেঙে দাও সে পৃথিবী—সে পৃথিবী করে দাও লয়।

(সূত্র: আশ্‌রাফ ও রশীদ; ১৯৫০: তিপ্পান্ন)

এই কবিতার শেষে কবি উল্লেখ করেছেন বঞ্চনা ভোগ করে আসা মানুষগুলোর শ্রেণিপেশাকে। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যেন স্বাধীনতার স্বাদ সবাই পেতে পারে, সেই প্রত্যাশা কবির। তিনি জীবনসংগ্রামে লিপ্ত বেশির ভাগ মানুষের চাহিদার যে ঝড়, তাকে বলেছেন 'তোমারে নোতুন করে জানাতে ঝড়ের নমস্কার।' সেই ঝড়ের কবলে পড়ুক প্রচলিত সমাজকাঠামো, ভেঙে গিয়ে নতুন একটা পৃথিবী গড়ে উঠুক, সেই আশায় তিনি বলেন :

আমাদের কাফেলায় কোটী কোটী মানুষের ভিড়,
জেলেদের, মুচিদের, কৃষকের, মজুরের ভিড়,
ক্ষুধিতের, বঞ্চিতের, লাঞ্ছিতের, শোষিতের ভিড়,
এইখানে তুমি এসে মোদের কি দেবেনা অভয়!...
এসো এসো দুর্গত মানুষের বন্ধু হে আমার,
তোমারে নোতুন করে সবে মিলে জানাই এবার
কোটী কোটী জনতার বেদনায় রাঙা নমস্কার

(সূত্র: আশ্‌রাফ ও রশীদ, ১৯৫০: চুয়ান্ন)

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে প্রকাশিত এই সংকলনের কাব্যমূল্যের তুলনায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই বলা যায়, 'নতুন সমাজের প্রতিনিধিদের' এই 'কবিতার ভাষা, আঙ্গিক অথবা বক্তব্য হয়তো নতুন ছিলো না—কিন্তু যে-নতুন আবেগে ঐ সমাজ শিহরিত—তার আলোড়ন নতুন কবিতার নবীন কবিদের অপরিণত কবিকর্মেও আভাসিত। এইখানেই নতুন কবিতার মূল্য।' (হেনা; ২০০১: ৩৯৮) তবু সামগ্রিক কাব্যপ্রচেষ্টায় বলতেই হয়, এ-সময়ের কবিরা নতুন কাব্যভাষা সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এরপর কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলন। মূলত এই সংকলনই বাংলাদেশের কবিতার নতুন প্রজন্মের যাত্রা-স্মারক হয়ে রয়েছে। কারণ এ-সংকলনের

কবিতায় প্রথমবার বাংলাদেশের কবিদের নিজস্ব বাক-ভঙ্গি, স্বকীয় শব্দচয়ন, মৌলিক ভাষাবিন্যাস, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের প্রতিফলন ঘটে।

কবি-সাহিত্যিকগণ হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষ। সমাজের অন্য দশজনের মতো রক্তমাংসের মানুষ হলেও তাঁদের মধ্যে ভর করে একধরনের দূরদর্শিতা। যা সমাজের অন্যদের চেয়ে তাঁকে চেতনাগত দিক থেকে এগিয়ে রাখে। ধরে নেওয়া যায়, সে-কারণেই যেখানে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সবকিছুর হিসাব করা হয় একাত্তরের বিজয়ের পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে, সেখানে বাংলাদেশের কবিতার হিসাব করতে হয় তারও দুই দশক আগে থেকে। মূলত দেশবিভাগের পর নতুন রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক যে নগরজীবন গড়ে ওঠে, সেখানেও কবিতা কিছু দায়িত্ব নিয়েছিল; যার শুরুটা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কারণ *নতুন কবিতা* আর *একুশে ফেব্রুয়ারী*র মধ্যবর্তীকাল ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য সংকটাকীর্ণ। এ-সংকট এসেছিল একাধারে অর্থনীতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। পৃথিবীতে এমন সংকট খুব কম জাতিকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। ফলে যে বাঙালি মুসলমানের আন্দোলনের ফসল দেশভাগের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তান, সেই পাকিস্তান তাদের পূর্বাংশের ওপর চেপে বসে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। ফলে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে মোহভঙ্গ হওয়া বাঙালি নতুন চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই ঐক্যের সম্মিলিত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে বাঙালির মননে ও সৃজনে। সেই সৃজনপ্রয়াসের প্রথম ফসল *একুশে ফেব্রুয়ারী*। এ-সংকলনের কবিরাই পরবর্তী পাঁচ-ছয় দশক বাংলাদেশের কবি ও কবিতাকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। এ-সংকলনে গরিমা আজও অমলিন। নতুন কাব্যভাষা, নতুন ভাবনাবিন্যাসের পাশাপাশি সংকলনটিতে ছিল নতুন স্বদেশ-চেতনা। অবশ্য তা পাকিস্তান নয়—বাংলাদেশ। রাজনৈতিকভাবে এই স্বদেশ-চেতনাই জনসাধারণকে পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মোহনায় উপনীত করেছে। কাব্যচর্চার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই সংকলনে যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই উত্তরকালে বাংলাদেশের কবিতার মেজাজকে ক্রমশ উচ্চতর স্থানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

এ-সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছিল এগারোজনের এগারোটি কবিতা। পাশাপাশি ছিল একটি পেইন্টিং, একটি প্রবন্ধ, পাঁচটি গল্প, একুশের নক্সা নামে দুটি গদ্য রচনা এবং একুশের ইতিহাস শীর্ষক একুশের ঘটনাবলি। *নতুন কবিতা*র শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর—এই চারজন কবি এ-সংকলনেও স্থান পেয়ে

যান। এ ছাড়া এই সংকলনে লিখেছিলেন আবদুল গনি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬), ফজলে লোহানী (১৯২৯-১৯৮৫), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০), আতাউর রহমান (১৯২৫-১৯৯৯), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), , জামালুদ্দিন (?-?)। এ ছাড়া এ সংকলনে স্থান পায় ‘একুশের গান’ নামে দুটি রচনা। এগুলো মূলত কবিতা। রচনা করেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৬-২০২২) ও তোফাজ্জাল হোসেন (১৯৩৫-২০১৫)। সংকলনটির বিশেষত্ব হলো এর সব রচনা সৃষ্টি হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। তাই সবার কবিতার মধ্যে নানাভাবে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে, একুশের চেতনা ও নিজস্ব ক্ষোভ-বেদনার অনুভূতি কাব্যময় হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক কবি নিজস্ব ভাষা ব্যবহারে এখানে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ তৎকালীন কবিতায় না আসাটা দুর্বলতা নয়। তখনকার বেশির ভাগ তরুণই যেমন ছিলেন কোনো-না-কোনোভাবে কৃষিজীবী পরিবারের সদস্য কিংবা কৃষক পরিবারের সন্তান, আবার অন্যদিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, এ-আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক বা শ্রমজীবীদের সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। তবে এটা ঠিক ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁরাও স্থায়ীভাবে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না। সবাই ভাগ্যান্বেষণে নগরের বাসিন্দা হয়েছিলেন। আর আন্দোলন যে কেবল ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের জন্য, তা নয়। বরং অন্যান্য অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আন্দোলন-ক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছিল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাই পূর্ববর্তী সংকলনের মতোই এ-সংকলনের মধ্যেও কৃষক বা শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়নি। আমাদের অন্বিষ্ট প্রসঙ্গ এসেছে মাত্র তিনজন কবির কবিতায়। তাঁরা হলেন ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও হাসান হাফিজুর রহমান।

ফজলে লোহানীর কবিতার উপলব্ধি অনেকটা সর্বজনীন। একুশের চেতনা কেবল নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে নয়, তার প্রভাব পড়েছিল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। গণমাধ্যমের প্রচারের সুবাদে এ-আন্দোলন আস্তে আস্তে সাড়া জাগিয়েছিল ছাত্র-কৃষক-গৃহিণী-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেও। ফলে মানুষ নিজেদের পেশাগত জায়গা থেকে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। নতুন ও স্বপ্নের ‘স্বাধীন দেশ’ পাকিস্তানের ছাত্রদের ওপর হামলে পড়তে পারে, তা তারা ভাবতে পারেনি। ঠিক তেমন বিষয়ই যেন উঠে এসেছে ফজলে লোহানীর কবিতায় :

> একুশে রাতে আঁধার নামে সব শহরের গলিঘুঁচিতে,
> গাঁয়ের বাঁকা পথগুলোতে,
> রেল কলোনীতে, কেরাণীর ঘরে, কিষাণের ঘরে।
> ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
> আঁধার নেমেছে।...

কামারের ঘরে হাপর থেমেছে,
কাস্তে থেমেছে, কোদাল থেমেছে,
রেলইঞ্জিনে সিটি থেকে গেছে।
(সূত্র: হাসান; ১৯৫৩: ৩৪)

সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার এক বছর পর। এ-সময়ের মধ্যে জনমানস সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। সব শ্রেণিপেশার মানুষ যেন 'নিজেদের' সন্তান হারানোর ব্যথায় কাতর ছিল। তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় রাজধানী শহরে সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তরুণের বুকে গুলি চালিয়ে হত্যার ঘটনা ছিল অভাবিত। তাই কবি বলেছেন :

মৃত্যুকে যারা ভয় করেনি,
মৃত্যু তাদের বরণ করেছে,
এ খবর গিয়ে গাঁয়ে পৌঁছেছে
সবার মুখেই বজ্র শপথ
: হাতুড়ী আমরা নামিয়ে নিলাম
কাস্তে-কোদাল থামিয়ে দিলাম
কাঁচা শহীদের স্মৃতির ভারে।
(সূত্রঃ হাসান; ১৯৫৩: ৩৫)

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা "স্মৃতিস্তম্ভ" একুশের চেতনার পাশাপাশি সাক্ষী হয়ে আছে আরেক জীবন্ত ইতিহাসের। একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ঘটনার শহিদদের স্মরণে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতভর প্রথম শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয় কয়েকজন ভাষাসংগ্রামীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক' স্লোগান সেঁটে দেওয়া হয় সেই স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে সারা দিন ঢাকার সমস্ত শ্রেণিপেশার মানুষের ঢল নামে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে গড়ে তোলা শহিদ মিনারে। সেখানে শামিল হয়েছিল পুরান ঢাকার হোসেনী দালান এলাকার ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাকারী লোকজনও। (সূত্র: আনিসুজ্জামান; ২০১৬: ৪৭) পাকিস্তান সরকার তাদের নিজস্ব বাহিনী দিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয় সেই ঐতিহাসিক প্রথম শহিদ মিনারটি। এর প্রতিবাদে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লেখেন, 'স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো/ চারকোটি পরিবার/ খাড়া রয়েছি তো।' "স্মৃতিস্তম্ভ" শিরোনামের এ-কবিতায় তিনি খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবীদের কথাও :

হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান

গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।

(সূত্র: হাসান; ১৯৫৩: ৩৭)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহে এসেছে ইতিহাসের এই সত্যও, এই চার কোটি পরিবার হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডের তৃণমূলের সংগ্রামী জনমানুষ, যাদের অস্তিত্ব বিলীন করতে পারেনি কখনো কোনো শাসক, কোনো বহিরাগত শত্রু। এই সংগ্রামী ইতিহাসে ইঙ্গিত রয়েছে কিছু রূপক-সাংকেতিক শব্দের বন্ধনে: ইটের পরিবর্তে বসানো হয়েছে অসাধারণ শব্দপ্রতীক; যেমন 'হীরের মুকুট' (মোগল সম্রাট), 'নীল পরোয়ানা' (ইংরেজ শাসক ও নীলকরদের অত্যাচার), 'খোলা তলোয়ার', 'খুরের ঝটিকা' ('বহিরাগত লুটেরা হানাদার যারা লুণ্ঠন শেষে পালিয়েছে') ইত্যাদি। কেননা তাদের প্রতিহত করেছে 'সরল' 'জনতা', যারা 'গুণ' টানে, 'হাঁপর' চালায় আর 'হাতিয়ার' তুলে ধরে। পরোক্ষ বিশ্লেষণে ভাষা-আন্দোলনের তাজা আবেগ নিয়ে রচিত এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধেরও অন্যতম সূচক কবিতা। (হুদা; বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকম: ২০১৩)

কবিতায় উল্লেখিত এই শ্রেণিপেশার মানুষের উপস্থাপন কেবল একুশের চেতনা কিংবা প্রথম শহিদ মিনার স্থাপনের প্রসঙ্গকেই উসকে দেয়নি, কবিতাটি যে বাংলাদেশের কবিতা হিসেবে অনন্য, সেই সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে ওই চেতনার কারণে। এই চেতনাই কবিতার শক্তি হয়ে সমাজকে প্রভাবিত করে। এই চেতনাই ছিল একুশের মূল আদর্শ। কারণ :

> একুশ মানে তো কেবল একটি একটি দিন কিংবা তারিখ নয়। একটি আকাঙ্ক্ষার—একটি সংগ্রামের একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার উৎসমুখের বিস্ফোরণ। ওই বিস্ফোরণের পূর্ববর্তী ইতিহাসের যোগসূত্র যেমন রয়েছে ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সাথে, তেমনি এর পরবর্তী ইতিহাস গৌরবদীপ্ত হয়ে আছে রাজনৈতিক সংগ্রামে।...ভাষাকেই দাঁড় করাতে হয়েছিল বসন ফ্যাক্টর হিসাবে। প্রশ্নটা ছিল এই বাঙালিত্বের অস্তিত্বটাকেই টিকিয়ে রাখার—বিকশিত করার। বাইরের প্রয়োজনটাকে অন্তরের চাওয়ার সাথে মেলানো সম্ভব হয়েছিল বলেই এতটা পথ সে হেঁটে এসেছে। এখনও হাঁটতে পারছে। আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে একুশের কবিতায়। শোষণ শৃঙ্খল-নিপীড়ন থেকে মুক্তির নানা অনুষঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে আবেগের সততায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র গগনচুম্বী হয়েছে প্রাণোন্মাদনায় আর এভাবেই কবিতা হয়েছে সত্যাগ্রহের হাতিয়ার। (মতিন; ২০০১: ১৩০-১৩১)

আর 'এই সত্যাগ্রহের হাতিয়ার' হিসেবেই বাংলা কবিতা স্বতন্ত্র ভাষাভঙ্গি লাভ করে; যা বাংলাদেশের কবিতা হিসেবে মর্যাদা পেয়ে যায়। তারই অনন্য দৃষ্টান্ত আলাউদ্দিন আল আজাদের বহুপঠিত ও জনশ্রুত কবিতা "স্মৃতিস্তম্ভ"। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনের সম্পাদক কবি হাসান

হাফিজুর রহমানের কবিতাটিও নিজস্ব শব্দচয়ন, ভাষাভঙ্গি, উপস্থাপন কৌশলের কারণে স্বকীয়তায় অনন্য। ভাষা আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত কবির মনে স্বজন হারানোর বেদনা। যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের জন্মদাত্রী মাকে 'আম্মা' সম্বোধন করে বলেছেন, "আম্মা, তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?...সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার—কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম।" এ তরুণদের চেতনাই যে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে, নতুন প্রজন্মকে উদ্ভাসিত করবে স্বকীয় সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের চেতনায়, কবি তার ভাবী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নতুন বীজ বা ধানের চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করে। এ-প্রসঙ্গেই তাঁর কবিতায় এসেছে কৃষিজীবীদের জীবনের কথা :

> কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
> রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়...
> শ্রমিক তার শিল্পের প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
> যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
> সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,
> একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
> লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
> শিখাগুলো দেখি,
>
> (হাসান; ১৯৫৩: ৪৯)

কবিতাটি লেখা হয় ১৯৫২ সালের মার্চ বা এপ্রিলের দিকে। হাসান হাফিজুর রহমান নিজেই স্মৃতিচারণা করেছেন কবিতাটি নিয়ে : 'জুন মাসে কুমিল্লা সাহিত্যসম্মেলনে প্রথম জনসম্মুখে পাঠ করি। আমার সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনেই সেটা প্রথম ছাপা হয়।...কবিতাটি রচনা করি স্বাভাবিক প্রেরণায়। তখন সবারই আবেগ ছিলো। ভাষা আন্দোলন তো ছিল public sentiment-এর ব্যাপার, তার সাথে ব্যক্তিগত অনুভূতির সংযুক্তির ফলশ্রুতিই হলো 'অমর একুশে'।' (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ২৩-২৪)

একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলনের ভূমিকা বা প্রভাব ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সর্বজনীন আন্দোলনের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। স্বকীয়তার জন্য এই সংকলনের গুরুত্ব কখনো শেষ হবে না। তাই এ বিষয়ে বলা যায় :

> 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র যেটি নিজস্বতা, সেটি বস্তুত এই আন্দোলনেরও বৈশিষ্ট্য; শুধু তাই নয়, এই আন্দোলন যেমন ভবিষ্যৎ সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপরে ছায়াপাত করেছিলো, এই সঙ্কলনও তেমনি বাংলাদেশের পরবর্তী কাব্যপ্রয়াসের ওপর। এই সময়েই দেখি নবীন সমাজ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্যে দাবি তুলছে, আর নবীন কবিতা এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয়

ছুঁৎমার্গ অগ্রাহ্য করে চিরায়ত শিল্পের আদর্শের দিকে। প্রথমে যা ছিলো একটি ক্ষুদ্র আন্দোলন—আহত মধ্যবিত্তের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে তা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে সময় লেগেছে দুই বছর। ১৯৫৪ সালের রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট প্রধানত ঐ ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের প্রতিরোধ। (হেনা; ২০০১: ৩৯৯)

এরপর প্রাদেশিক নির্বাচনে 'পুরোনো মধ্যবিত্ত শক্তি' অবধারিতভাবে পরাজিত হয়। শুধু একটি ঘটনা নয়। তাদের এমন পরাজয় অব্যাহত থাকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। এর শেকড় প্রোথিত একুশের চেতনায়। কারণ, 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুবনে একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রভাবসঞ্চারী কোন অনুষঙ্গ নেই। একুশ তার প্রাতিস্বিক-চৈতন্য নিয়ে বাঙালি জাতির সামনে বাতিঘরের আলোক স্তম্ভের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একুশের চেতনাস্রোতে অবগাহন করেই পূর্ববাংলার নতুন প্রবংশের প্রগতিশীল কবিকূলের জন্ম।' (সূত্র: নীতীশ; ১৯৮৯: ১৪৩) *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনের মধ্য দিয়ে সেই কবিকুলের অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিল। তাঁদের কবিতায় যেমন বাংলাদেশের কবিতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তেমনি দেশ, মাটি, নিজস্ব সংস্কৃতি ও মানুষ স্থান করে নিয়েছিল। এর প্রসারিত ও ধারাবাহিক রূপায়ণ আমরা লক্ষ করি পরবর্তী সময়ে এককভাবে রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহে। যেহেতু পঞ্চাশের প্রজন্মই বাংলাদেশের কবিতার মেজাজ ও শৈলী গড়ে দিয়েছিলেন, তাই আমাদের অন্বিষ্ট ওই সব ব্যক্তি-কবির কাব্যগ্রন্থগুলোতে উঠে আসা কৃষক-শ্রমিকদের জীবনপ্রসঙ্গ। অনেক জ্যেষ্ঠ কবির কাব্য তুলনামূলক বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমাদের কৌশল হবে কাব্যের প্রকাশকাল অনুযায়ী সৃষ্ট সময়ের বাঁক ধরে ধরে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রধানত কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা বা কবিতাসমগ্রই হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঞ্চাশের দশকের কবিতা

পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে বাঙালি-অবাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র নিয়ে তাদের যে মোহ, আবেগ ও উন্মাদনা ছিল, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে, তার অবসানও ঘটেছে খুব দ্রুত। মোহভঙ্গের পরপরই তারা ধর্মীয় সত্তার চেয়ে বাঙালিত্বের জাগরণ বা নিজেদের জাতিগত সত্তার উন্মেষ ঘটানোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। এরই অংশ হিসেবে বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, পোড়খাওয়া জনগোষ্ঠী, বিশেষত কৃষক, শ্রমিকসহ সমাজের অধিকারবঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে তাদের স্বকীয়তা গড়ার প্রত্যয় ব্যাপৃত। এ ক্ষেত্রে রাজনীতির পাশাপাশি তাদের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গৃহীত হয় শিল্প-সাহিত্যের সামূহিক প্রকাশ। তা সম্ভব হয় আটচল্লিশ থেকে সূত্রপাত ঘটা আন্দোলনের কারণে। আর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শহুরে মধ্যবিত্তের যে সুদৃঢ় অবস্থান বাঙালি উপলব্ধি করে, তা-ই তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চিন্তকদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। তার কারণ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আর ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ভাষা আন্দোলনের প্রজন্মের কবিগণকে ভিন্ন পথে বেশি দিন থাকতে দেয়নি। এই দুই ঘটনা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নানা হঠকারী তৎপরতা তাঁদের স্বদেশের কোলকে প্রধান আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। দেশবিভাগোত্তর 'স্বাধীনতাপ্রাপ্তির' স্বপ্নভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে, সাহিত্যিক ঐতিহ্যে, গ্রামীণ প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যে আর ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে তাদের অধিক মনোযোগী হতে দেখা যায়। এককথায় তাঁরা কবিতায় ধারণ করলেন নব-উপলব্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে। খুব স্বাভাবিকভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, বিশেষ করে *একুশে ফেব্রুয়ারী* কবিতা-সংকলনের কবিগণের পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকে সক্রিয় কবিগণই বাংলাদেশের কবিতার পথ নির্মাণে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাতনরী হার* প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। শহুরে পরিবেশে নিজেকে খাপখাইয়ে নেওয়া কবি এ-কাব্যগ্রন্থে ছড়ার ছন্দে, কথ্য ঢঙে রূপকথার অনুষঙ্গকে কবিতার বিষয়ভুক্ত করে প্রমাণ করেছেন, তিনি শেকড়কে, ঐতিহ্যকে কাব্যসত্তার ভেতরে ধারণ করতে চান। মা-মাটি-মাতৃভূমিও তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে গণ্য হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মাতৃচেতনা তাঁর কবিতার রূপকল্পে অনিবার্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাশাপাশি ম্রিয়মাণ হলেও 'চেতনায় তাঁর ক্রিয়মাণ থাকে ইতিহাসবোধ, কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের বিবর্তন ও মানুষের নৃতাত্ত্বিক রূপবৈচিত্র্যের

উপাদান।' (অনু; ২০০৫: ১০১) কারণ, শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের অভ্যস্ত কবি শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন না থাকলেও তাতে তিনি স্মৃতিযাপন করতে চান কেবল। প্রতিনিয়ত সংগ্রামশীল কৃষিজীবীদের প্রতি অনুরাগ থাকলেও তাদের পক্ষভুক্ত হন না। তাই তাঁরা কবিতার অনিবার্য উপাদান হয়ে নয়, কবিতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্থান পান। তাই দেখা যায়, এগারোটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বেশির ভাগ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় 'জেলে ডিঙি', 'সবুজ ধানের ক্ষেত', 'ভাগচাষি', 'ক্ষেতমজুর' প্রভৃতি শব্দ কবিতাগঠনে প্রযুক্ত হলেও তা মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় ব্যক্তিগত রোমান্টিকতায়—কোনো শ্রেণিচেতনায় উত্তীর্ণ হয় না। তবে *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* গ্রন্থের মহাকাব্যিক কবিতায় "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" এবং কাব্যের নাম-কবিতায় নিজের জাতিগত অস্তিত্বকে জানান দিতে গিয়ে শিল্প হিসেবে কবিতার গ্রহণযোগ্যতাকে উচ্চকিত করেছেন। কবিতা যে সর্বজনীন, কবিতা যে প্রকৃতি ও মানুষের প্রতিটি সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নিহিত থাকে, কবিতা যে মেহনতি মানুষের ঘাম ও শ্রমের বিনিময়েও রচিত হয়—এসব অনুষঙ্গ কবিতার শরীরে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় তিনি নানা সময়, নানা ঘটনা, ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ ইঙ্গিতময় করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবীর কথা বলেছেন। এর সূত্র ধরে ঐতিহ্য হিসেবে এসেছে কৃষক-শ্রমিক তথা সমাজের কায়িক শ্রম বিক্রি করা মানুষদের প্রসঙ্গও। তাই কোনো কাতরতা নয়, তাদের জীবনসংগ্রামের দরুন কোনো অনুযোগ নয়, বরং এ ধরনের জীবনকে মর্যাদা ও ঐতিহ্যের অহংকার গণ্য করে কবি উচ্চকণ্ঠে বলেন :

> আমি কিংবদন্তির কথা বলছি।
> আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।...
> তিনি মৃত্তিকার গভীরে
> কর্ষণের কথা বলতেন
> অবগাহিত ক্ষেত্রে
> পরিচ্ছন্ন বীজ বপনের কথা বলতেন
> সবৎসা গাভির মতো
> দুগ্ধবতী শস্যের পরিচর্যার কথা বলতেন
> তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
> যে কর্ষণ করে তাঁর প্রতিটি স্বেদবিন্দু কবিতা
> কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
>
> (ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ৯৮-৯৯)

এসব শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রূপকের আবডালে কবি যদি ভিন্ন ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেও থাকেন, তবু যেভাবে তিনি শ্রমজীবী ও চাষিদের শিল্পিত স্থান দিয়েছেন, তার গুরুত্ব সামান্য নয়। দেশহীন, বাস্তুহীন, উপার্জনহীন কিংবা শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ, তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার স্বপ্ন বোনার প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় না এলেও তিনি যে মর্যাদা তাদের দিয়েছেন, সেটাও সময়ের বিবেচনায় নতুন। নতুন ভাষা ও শব্দ চয়নে তা অনন্যও। সম্ভবত তাঁর কবিস্বভাবের ভেতরে ছিল কৃষিজীবী বা শ্রমজীবীদের প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ। কারণ তিনি যে সুনির্দিষ্ট কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন, তা কিন্তু নয়। বরং মানবসভ্যতার বিবর্তন ও রূপান্তর হয়েছে যেসব মানুষের কল্যাণে তিনি তাদেরও কবিতায় অঙ্গীভূত করেছেন। নইলে তিনি বলতে পারতেন না—

আমি শ্রমজীবী মানুষের
উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
আদিবাস অরণ্যের
অনার্য সংহতির কথা বলছি
শৃঙ্খলিত বৃক্ষের
ঊর্ধ্বমুখী অহংকারের কথা বলছি
আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।

শৃঙ্খলিত বৃক্ষের ঊর্ধ্বমুখি অহংকার কবিতা
আদিবাস অরণ্যে অনার্য সংহতি কবিতা।

(ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ১০২)

শুধু তা-ই নয়, তিনি অসম্ভব দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলেছেন 'যে কবিতা শুনতে জানে না/ শস্যহীন প্রান্তর তাকে পরিহাস করবে।' (ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ৯৯) কবিতা আর মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ একাকার হয়ে যায়, কবিতা আর তাঁর নিজের জাতিত্ব, নিজের ঐতিহ্য, পুরাণ—সব একে অপরের পরিপূরক হয়ে যায়। তিনি কবিতায় আবির্ভাব ঘটান এমন এক আদর্শিক পূর্বপুরুষের, যিনি শৈল্পিকভাবে সমগ্র বাঙালিরই পূর্বসূরি হয়ে উঠেছেন। তা না হলে একইভাবে তিনি বলতে পারতেন না, 'তিনি স্বপ্নের মতো সত্য ভাষণের কথা বলতেন/ সুপ্রাচীন সংগীতের আশ্চর্য ব্যাপ্তির কথা বলতেন/ শস্যের নক্ষত্রে আলোকিত প্রান্তরের কথা বলতেন/ তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।' (ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ১০০)

শ্রমজীবন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার শ্রীবৃদ্ধির উপাদান হিসেবে আসুক কিংবা ঐতিহ্যকে যাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে আসুক, তাদের জীবনের বঞ্চনা, রিক্ততা, অপূর্ণতা, আক্ষেপ অথবা তাদের জীবন-জীবিকা অন্বেষার ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করার ভাবনা যে তিনি কবিতাতে ধারণ করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্যের নাম-কবিতায় কবি যেন একধরনের অতৃপ্তিতে ভোগেন। তিনি

স্বপ্নহীন প্রান্তরের এক নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক। তাঁর চতুর্দিকে 'শুকনো পাতা ছাড়া কোন ছায়া নেই।' তাই কবি অনেকটা অসহায়ত্ব নিয়ে বলে যান :

অথচ আমি বৃক্ষহীন প্রান্তরের কথা বলতে চাই না।
যুদ্ধ এবং আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলতে চাই না।
বিশীর্ণ নদী কিম্বা রুক্ষ মৃত্তিকার কথা বলতে চাই না।
ভাটি অঞ্চলের বিপন্ন কৃষকের কথা বলতে চাই না।
কিন্তু আমি কেমন করে
মরা গাঙ্গে বান আনব
কৃষকের ঘরে শস্যের দানা তুলে দেব...
আমি সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করেছি
বর্ণ এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছি
শস্য এবং গাভির জন্য প্রার্থনা করেছি
আমি ভূমি এবং কৃষকের জন্য প্রার্থনা করেছি।

(ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ১০৬ ও ১১০)

শ্রমজীবন, বিশেষ করে কৃষিজীবী ও কৃষকদের নিয়ে কবির এমন গভীর মমত্ব তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে লক্ষণীয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবিতার অলংকার হিসেবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতার ব্যঞ্জনা বৃদ্ধির অনুষঙ্গ হিসেবে কৃষি, কৃষক, ফসলাদির নাম কবিতায় প্রযুক্ত হয়েছে।

দেশবিভাগ-পরবর্তী সময়ে লড়াই-আন্দোলন ও বিরুদ্ধে স্রোতে গিয়ে জাতিগত চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে যাঁরা নতুন কাব্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তাঁরাই মূলত বাংলাদেশের কবিতার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ সময়ে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকজুড়ে যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চা করেছেন, তাঁরাই বাংলাদেশের পঞ্চাশের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনের কবিগণ যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন একক প্রচেষ্টায় কাব্যচর্চা করে খ্যাতিমান কবিগণও। তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশের দশক শেষ না হতেই প্রকাশিত হয় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও দিলওয়ারের কাব্য। এর পরের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কবি শামসুর রাহমানের *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০)। তিনি বাংলাদেশের প্রধান কবিদের একজন। জন্ম থেকেই তিনি রাজধানীর বাসিন্দা। নগরজীবনই তাঁর কাব্যচর্চা এবং কর্মজীবন অতিবাহিত করার প্রধান ক্ষেত্র। তিনি প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন নাগরিক কবি হিসেবে। পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে কাব্যচর্চার জন্য কেবল নয়, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জন্য ছিল বিপুল প্রতিকূলতা। তবু পঞ্চাশের কবিরা 'শুরু থেকেই অসাম্প্রদায়িক, আন্তর্জাতিক, যুদ্ধ বিরোধী এবং সমাজ চেতনার অধিকারী। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পাঠও লাভ করেছেন। বাংলা কবিতার প্রবহমান

ঐতিহ্যে গভীরভাবে স্নাত ঐ কবিরা কবিতার ধর্মে আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত।' (রফিকুল; ১৯৭১: ষাট) এই পাঠ ও দীক্ষা লাভ করা কবিদের একজন শামসুর রাহমান। ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহিদ, ভাষার প্রতি মমত্ববোধ, রাজনৈতিক চেতনা, স্বদেশভাবনা প্রভৃতি বিষয় স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে তাঁর কবিতার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর এ-কারণে বাংলাদেশের কবিতায় তাঁর স্বকীয় কণ্ঠস্বর পাঠকের কাছে অধিক সমাদৃত হয়েছে। শামসুর রাহমান অনন্য তাঁর কবিভাষার কারণে। তাঁর কবিভাষার বদৌলতে তিনি 'যেমন অনায়াসে যে কোন আবেগ ও অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপান্তর করতে পারেন, সে কবিতা তেমনি সহজে পাঠক-চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে। এই ভাষার সাহায্যেই শামসুর রাহমান সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেন।' (রফিকুল; ১৯৭১: একষট্টি) কিন্তু আমাদের অন্বিষ্ট কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। যতটুকু এসেছে, তার বেশির ভাগই উপমা বা রূপক হিসেবে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতীক বা প্রতি-তুলনার আশ্রয় হিসেবে কিংবা কবিতাকে সমৃদ্ধ করতে তিনি শ্রমজীবনকে সংকেতিত করেছেন। যেমন কবি তাঁর এক স্বজন বিয়োগের ব্যথায় স্মৃতিকাতর হয়ে লিখেছেন "একটি মৃত্যু-বার্ষিকী"। স্মৃতিকে ধরে রাখার কৌশল হিসেবে কবি আশ্রয় নিয়েছেন চারপাশের পরিমণ্ডলকে, যার মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের এক চিত্র। বৃক্ষ কিংবা কামারশালার অবিরাম অভিন্ন চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেছেন :

> গাছ সাক্ষী অনেক দিনের লঘু-গুরু ঘটনার
> আর এই কামারশালার আগুনের ফুলকি ওড়ে
> রাত্রিদিন হাপরের টানে। কে জানতো স্মৃতি এতো
> অন্তরঙ্গ চিরদিন?
>
> (রাহমান; ২০০৬: ৪৭)

শ্রমজীবনে সংগ্রামরত মানুষগুলোর জন্য শামসুর রাহমানের কবিতায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বার্তা পাওয়া যায় না। তাঁদের প্রতি আলাদা করে কোনো দায়বোধও তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হতে দেখা যায় না। কারণ, 'Shamsur Rahman did not start a movement or proclaim a manifesto. He was a quiet revolutionary, whose only claim to that title was earned though a quiet understanding of his time and history and his place in it. This is what enabled him, as it were, to stand up for the time, to capture its essence, to express its every nuance, in a language which will not flatter or exaggerate but state with precision and truth.' (Source: Khan Sarwar; 1996: 41) তবে শহুরে মানুষের জীবনের কর্মব্যস্ততার নানা বৈচিত্র্য তুলে ধরে তিনি রচনা করেছেন বেশ কিছু কবিতা। তার মধ্যে "দৃশ্যপট, আমি এবং

অনেকে” একটি। এ-কবিতায় নানা পেশাজীবী, শহুরের ব্যস্ততার নানা অনুষঙ্গ, নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের পাশাপাশি শ্রমিকজীবনের প্রসঙ্গও টেনেছেন অতি সংক্ষেপে :

এ-শহরে
কেউবা হাপর টানে, অক্লান্ত পেটায় লোহা কেউ;
কেউবা ঘুরিয়ে চাকা গড়ে নানা ছাঁদে
নানান পুতুল, কেউ রঙচটা স্টেজে প্রাণপণে
আওড়ায় পার্ট, কেউ কবিতার প্রতিটি অক্ষরে
নক্ষত্রের দীপ্তি চেয়ে ক্লান্ত হয় দুরাশার ভীষণ চত্বরে।

(রাহমান; ২০০৬: ৭১)

তবে কোনো সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলেও সমকালের অগ্রগামী কবি হিসেবে, সেই সময়েও রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রমজীবন উপেক্ষা করে তাঁর পক্ষে সব সময় শিল্পিত কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন ছিল! তেমনই এক কবিতা “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯”। এ-কবিতায় শ্রমিকের জীবন ও সংগ্রামকে নিজের ভেতরে ধারণ করে কবি বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, ষাটের দশকের উত্তাল আন্দোলন সংগ্রামে উজ্জীবিত ছিল সারা দেশ, প্রকম্পিত ছিল পাকিস্তানি শোষণের ব্যূহ। আর তাতে সমান অংশগ্রহণ ছিল সাধারণ মানুষের। কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা অনাচার থেকে মুক্তিটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। তাই হয়তো কবি নিজেকে শামিল করেছেন তাদের কাতারে। নিজেকে লীন করেছেন তাদের জীবিকার কর্মযজ্ঞের সঙ্গে :

আমি দূর পলাশতলীর
হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক
        মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধু-ধু
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড়-বাদলের
                নিত্য সহচর
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত-কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
        উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতি সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
                মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে,

(রাহমান; ২০০৬: ৮৫)

একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা যে কেবল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা যে ধাপে ধাপে স্বাধিকার আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, জনমানসের উপলব্ধিজাত চেতনার অনুশীলন তথা সর্বব্যাপী গণ আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল, আর তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল সুবিধাবঞ্চিত

বা শ্রমজীবী মানুষের, তা কবির চোখ এড়ায়নি। এমনকি তিনি হয়তো এও ভেবেছেন, তাদের জীবনের হাজারো স্বার্থত্যাগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নগরজীবনের সার্বিক ব্যবস্থা সচল রাখার মতো প্রকৃত সত্য। এ-সুপ্ত সত্যকে তুলে ধরে তাদের স্বজন ভেবে তিনি একই কবিতার শেষের দিকে বলেছেন :

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিষ দিয়ে,
জীবন মানেই...
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

(রাহমান; ২০০৬: ৮৬)

একুশের চেতনা আমাদের কেবল সাংস্কৃতিক মুক্তির নিশান ছিল না, ছিল স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ে মৌলচেতনাও। কবির এ-কবিতায় সেই সত্য উপস্থাপিত হয়েছে ভাবনার নিবিড় পরিচর্যায়। আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিবাদ-মিছিলের উদ্দাম নগরে পরিণত হওয়া ঢাকার সেই উত্তাপ ক্রমশ পৌঁছে গিয়েছিল প্রত্যন্ত বাংলার ঘরে ঘরে। একুশের সেই চেতনার উত্তাল স্রোত বেয়ে বাঙালির জীবনে একসময় উনসত্তর এসে উপস্থিত হয়। উনসত্তরের গণ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে দুটি হত্যা কাণ্ডের কারণে। ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে (১৯৪২-১৯৬৯) এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহম্মদ শামসুজ্জোহাকে (১৯৩৪-১৯৬৯)। তাঁদের আত্মাহুতি ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের গতিপথ নতুন করে নির্ধারণ করে দেয়। আইয়ুব খানের শাসন ও শোষণের মধ্য দিয়ে যে নিপীড়নমূলক অসহনীয় অবস্থা বিরাজমান ছিল, তারই বিরুদ্ধে জনরোষ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই কবি শামসুর রাহমান রচনা করেন তাঁর অনবদ্য কবিতা “আসাদের শার্ট”। পরাধীন এই ভূখণ্ডের সব শ্রেণিপেশার অধিবাসীদের মননে-মগজে জাগরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল বলেই কবি লিখতে পেরেছিলেন :

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
　　　　শহরের প্রধান সড়কে
　　　　কারখানার চিমনি-চুড়োয়
　　　　গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

(রাহমান; ২০০৬: ৯০)

সত্যিই এই 'চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়' পৌঁছার মধ্য দিয়ে কবি শহুরে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, সুবিধাবঞ্চিত অথবা ভূখানাঙ্গা কৃষক থেকে শুরু করে কারখানার শ্রমিকদের যূথবদ্ধতাকে কিংবা সব ধরনের মানুষের সংঘবদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত তাঁর বহুল পঠিত দুটি কবিতাতেও সুচিন্তিতভাবে অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতায় কবি বলেন শ্রমজীবীদের কথা। মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়েছে এ-কবিতায়। ছাত্র-শিক্ষক-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত থেকে শুরু কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করা সমাজের স্বাভাবিক আলো থেকে বঞ্চিত জনমানুষও নিজেদের অবস্থান থেকে অবদান রেখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। তা না হলে 'স্বাধীনতা তুমি/ মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী'র প্রসঙ্গ কবিতার শিল্পিত শব্দমালার অংশ করতে পারতেন না। এমনকি স্বাধীনতার অনন্ত তৃষ্ণা জমে থাকা জনমানুষের প্রতীক্ষার কথা এভাবে তুলে ধরতে 'তুমি' সম্বোধন করে বলতে পারতেন না :

তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে...
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

(রাহমান; ২০০৬: ৯৯)

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* কাব্যগ্রন্থে নিজেকে নিয়ে রচিত "আমার বয়স আমি" কবিতায় তিনি 'কৃষকের রৌদ্রদগ্ধ মুখের মতন স্পষ্ট' মুখচ্ছবির সঙ্গে নিজের অবয়বের

তুলনা করেছেন। আর ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত *শিরোনাম মনে পড়ে না* কাব্যগ্রন্থের "কে যেন ডাকছে কাকে" কবিতায় মানুষের বিপন্ন অবস্থার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন :

সেই ডাকে মায়া কাননের নৃত্য-দৃশ্য ছিল?
ভরা গাঙে নৌকাডুবি ছিল?
ছিল কি বিবাদে বিয়ে-ভেঙে-যাওয়া কন্যার পিতার
অসহায় বিপন্নতা কিংবা
খনির ভেতরে ধস-বন্দী শ্রমিকের
ভীষণ মরিয়া আর্তনাদ?

(রাহমান; ২০০৬: ২৬৯)

কারণ সেই ডাকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ছিল। ১৯৭৭ এবং ১৯৮৫ সময়পর্বগুলোর বাংলাদেশের মানুষের জন্য কোনো কল্যাণকর সময় ছিল না। দুই স্বৈরশাসকের কবলে পড়ে দেশ ও দেশের মানুষের মধ্যে তখন নাভিশ্বাস চলছে। সুতরাং সাংবাদিক-কবির কাছে দেশের জনগণ এক অনিঃশেষ ইশারার ডাকের পিছু ছুটছে। ১৯৮৬ সাল। তখন একটু একটু দানা বাঁধছে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। ছাত্ররা তাদের অধিকার নিয়ে রাজপথ আন্দোলিত করছেন। সারা দেশের মানুষ আস্তে আস্তে সংঘটিত হচ্ছে স্বৈরাচারবিরোধী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে। এই পটভূমিতেই রচনা করেন কাব্যগ্রন্থ *অবিরাম জলভ্রমি* (১৯৮৬)। এ-কাব্যের "তোমাকে পাঠাতে চাই" শীর্ষক কবিতায় নতুন প্রজন্মের প্রতি অনুপ্রেরণামূলক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি চেতনাগত অবস্থান থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিকে সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। কারণ, তরুণ-যুবার কাঁধেই মুক্তির মহান গুরুভার। তাদের হাত ধরেই আসবে সাধারণ্যের মুক্তি। এ তরুণ হতে পারে একজন বিপ্লবী, হতে পারে রাজনৈতিক কর্মী, হতে পারে মানুষের মুক্তিপ্রয়াসী এক দামাল তরুণ। কারণ 'বিপ্লবের' 'যোগ্য উদ্দীপনা' রয়েছে যার মধ্যে, কবি তাকে চান। তাই তিনি উচ্চকণ্ঠী হয়েছেন এক কল্পিত তরুণকে নিয়ে :

তোমাকে পাঠাতে চাই শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে,
ভিড়ে কেরানির কলোনিতে, মজুরের ঝুপড়িতে আর
মাছরাঙার বিলে; কৃষকের কুপিজ্বলা, রাত্রির কুটিরে,
তোমাকে পাঠাতে চাই ফ্যাক্টরির চঞ্চল চাকার
খুব কাছে, হাটে,
অজস্র জোনাকি-ঝলসিত ঝোপ-ঝাড়ে,
কুমোর পাড়ায় আর জেলের ডিঙিতে পুকুরের স্তব্ধ ঘাটে
চাঁদের সংকেতে চমকিত ছোট ঘরে, চুপিসারে

(রাহমান; ২০০৬: ৩৫৫)

শামসুর রাহমান শ্রমজীবনকে নিয়ে আলাদাভাবে কাব্যসাধনা করেননি। তবে শ্রমজীবনকে তিনি কবিমানসে ধারণ করেছিলেন। জনসম্পৃক্ত থাকতে দেশাত্মবোধক আবেগ ও জীবনসংগ্রামী মানুষের প্রসঙ্গ তাই তিনি কবিতায় এনেছেন। উল্লিখিত কবিতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় :

> বস্তুত ১৯৮০-৯০ কালপর্বের কবিতায় শামসুর রাহমান প্রবল জনসম্পৃক্তির পাশাপাশি প্রাণবল্লভ আত্মগুহাকেও...লালন করেছেন অবলীলায়। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পর্বে সংক্ষুব্ধ বর্তমানের তাপে জেগে উঠেছিলেন যে কবি, তিনি তখনো রুদ্ধ করেননি নিজের নিভৃত গৃহকোণের প্রবেশদ্বার। ওই পর্বেও চেতনার স্বভাবজ দ্বৈত স্রোত, জনতা ও নির্জনতার কবিতোকোণ সৃজনের শিল্পক্রীড়া অব্যাহত রেখেছিলেন কবি। (ভীষ্মদেব; ২০১০: ১৪৪)

শামসুর রাহমানের বিশেষত্বই হলো তিনি খুব সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারতেন। চিন্তার আধুনিকতা, শব্দ বাছাইয়ের বিচক্ষণতা ও কাব্যবুননের দক্ষতার কারণেই তিনি এই অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। সে-কারণেই বলা যায়, 'কবিতার আলোতেবাতাসে; বিষয় ও ভাষায় তিনি যে-চেতনা সঞ্চার করেছেন তাঁর কবিতায়, তা সংক্রমিত হয় অন্যদের ও তরুণতরদের মধ্যে;... শক্তি-সৃষ্টি-সাফল্যে, তাঁর সাম্প্রতিক ধূসরতা সত্ত্বেও, পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলে প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত তিনি, এবং সম্ভবত শামসুর রাহমানই বাঙলাদেশের একমাত্র "প্রধান কবি"।' (আজাদ; ২০০৮: ৩০) তবে কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি কৃষক বা শ্রমজীবীদের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিতে পারেননি। তার কারণ 'শামসুর রাহমান দ্রোহী নন—ভেঙে, তছনছ ক'রে তিনি আসেন নি; বিপ্লবী নন।' (আজাদ; ২০০৮: ৩৪) তা সত্ত্বেও তিনি সর্বত্রগামী হতে চেয়েছেন, সবার কাছে কবিতার মাধ্যমে পৌঁছানোর আকুতি তাঁর ছিল, তা ব্যক্ত হয়েছে কবির বক্তব্যে :

> যা কিছু মানুষের প্রিয়-অপ্রিয়, যা কিছু জড়িত মানব নিয়তির সঙ্গে, সেসব কিছুই আকর্ষণ করে আমাকে। সবচেয়ে বড় কথা, সুদূর সৌরলোক, এই চরাচর, মানুষের মুখ, বাঁচার আনন্দ কিংবা যন্ত্রণা, সব সময় বন্দনীয় মনে হয় আমার কাছে।... আমি তো জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করতে চাই, কুড়িয়ে আনতে চাই পাতালের কালি, তার সকল রহস্যময়তা। যে মানুষ টানেলের বাসিন্দা, যে মানুষ দুঃখিত, একাকী—সে মানুষ আমার সহচর, তেমনি আমি হাঁটি সেসব মানুষের ভিড়ে, যারা ভবিষ্যতের দিকে মুখ রেখে তৈরি করে মিছিল। (রাহমান; ২০১১: ০৭)

পঞ্চাশের কবিদের কাব্যপ্রকাশের দিক থেকে আলাউদ্দিন আল আজাদের *মানচিত্র* বেশ প্রাচীন। এ-কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে জুলাই মাসে। তাঁর খ্যাতি কবি-কথাসাহিত্যিক হিসেবে। *নতুন কবিতা* ও *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনের কবি। বিশেষ করে *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে

প্রকাশিত বহুল পঠিত কবিতা "স্মৃতিস্তম্ভের" হাত ধরে তিনি সব ধরনের পাঠকের কাছে অধিক পরিচিতি পান। একুশের শহিদদের স্মরণে তাৎক্ষণিভাবে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হলে তাঁর মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, তাকে উপজীব্য করেই তিনি লিখেছিলেন কবিতাটি। সে-কবিতায় কামার ও জেলেদের প্রসঙ্গ এনে তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার গণমুখী চেতনাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ-ধারা সর্বৈবভাবে অব্যাহত থাকেনি। তবে কোনো কোনো সময় কবিতার প্রয়োজনে, আবার কোনো কোনো সময় শ্রমজীবনকে বোধের ভেতরে ধারণ করে কবিতা লিখে গেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। তবে সে-সংখ্যা অপ্রতুল।

মুষ্টিমেয় যেসব কবিতায় আলাউদ্দিন আল আজাদ সাধারণ মানুষ বা কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ এনেছেন, তা অত্যন্ত মমত্বের সঙ্গেই এনেছেন। তা না হলে "কৃষকের গান" তিনি লিখতে পারতেন না। এ-কবিতায় কৃষিজীবীদের 'সোনার ছেলে' সম্বোধন করে তাদের জীবনসংগ্রাম এবং শত শত বছর ধরে পরাধীন জাতির এই পেশাজীবীরা যে সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে কবি তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন :

সোনার ছেলেরা ঘুমোয় না আর
জুড়োয় না আর সুখী মানুষের পাড়া
ধানের খেতের বুলবুলি যত
তীর-ধনুকের সজোর ছিলায়
আজকের মতো খেয়েছে মারণ-তাড়া।...

ধান ফুরাক না, পান শেষ হোক
রোদে বৃষ্টিতে
রশুন বুনেছি মাঠে
তবুও খাজনা দেবোনা দেবোনা
অনেক দুঃখে জেনেছি কেননা।
জমির মালিক আমরাই কোটিজনা।

(আজাদ; ২০০৪: ৫৭)

কবি কৃষকদের এখানে কেবল একটি ইমেজ হিসেবে এনে কবিতার আলংকারিক সমৃদ্ধি ঘটাননি। বরং মানবতাবাদী আলাউদ্দিন আল আজাদ দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি একাত্মতা বোধ করেছেন, তাদের দুঃখদুর্দশায় বেদনাবোধও করেছেন। পাশাপাশি সমকালীন সমাজের উজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথাও তিনি বলেছেন। (বাশার; ২০০৩: ৫০-৫১) ফলে একই

কবিতার শেষের দিকে তিনি বলেছেন, 'দল বেঁধে সবে ছুটে এসো ভাই।' কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, মুক্ত দেশে, মুক্ত জীবনে এক দিন 'আমাদের শিশু-মানিকের মুখে/ হাসি ফোটাবোই।' কবিতাটির রচনাকাল ১০ অক্টোবর ১৯৫৪। দেশভাগ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে, ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গজুড়ে জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের নেতৃত্বে এক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৪৬-৪৭ পর্বে ভূমিমালিক এবং বর্গাচাষিদের মধ্যে উৎপাদিত শস্য সমান দুই ভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে বর্গাদাররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। বর্গাচাষিরা ইংরেজরা বিতাড়িত হওয়ার পরও তাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। জোতদার-জমিদারেরা যেকোনো অজুহাতে কৃষকদের জমি চাষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করত। কারণ উৎপাদনে যাবতীয় শ্রম এবং অন্যান্য বিনিয়োগ করে বর্গাচাষি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রম এবং অবকাঠামোতে ভূমি মালিকের অংশগ্রহণ থাকে অতি নগণ্য। এ কারণে, অর্ধেক নয়, উৎপাদিত ফসলের তিন-ভাগের এক ভাগ পাবে জমিদার-জোতদারেরা। (মালেকা; ২০১১: ১০) ইতিহাসে এ আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন হিসেবে সুপরিচিত। যারা আন্দোলন করছিল, তারা ছিল মূলত বর্গাচাষি। এ আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় বিস্তার লাভ করে। ভিনদেশীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে দিনের পর দিন। ভারত ভেঙে ভারত আর পাকিস্তান নামে আলাদা দেশ হয়েছে তবু তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তখন অন্য লড়াইয়ে লিপ্ত। সে-কারণেই কবি হয়তো বলেছেন 'অনেক দুঃখে জেনেছি কেননা/ জমির মালিক আমরাই কোটিজনা।' কবিতাটির মধ্যে কৃষকদের প্রতি কবির মমত্ব ফুটে উঠেছে, যা তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের অবস্থানের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ মনে হয়। কেননা, বাংলার কৃষকেরা চিরদিনই নিপীড়িত-বঞ্চিত।

বাংলাদেশের ইতিহাসে পঞ্চাশের দশক রাজনৈতিক নানা ঘটনাপ্রবাহের কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দশকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কবি-সাহিত্যিক তথা সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে। এ-সময় আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা তীব্রভাবে রাজনীতি সচেতন ও গণমুখী হয়ে ওঠে। কবিতায় শব্দের ঝাঁজ ঝরে পড়েছে তৎকালীন শাসকদের ওপর—'ঝরেছে সকল রক্ত। এখন ক'খানা হাড়ে/ ঝক্‌ঝক্ করে তীব্র তীক্ষ্ণ বর্শ-ফলা :/ নতুন দস্যু আসে যদি, দেশ দেবোনা তারে/ ইস্পাত-হাড়ে গড়েছি বজ্র বহ্নি-জ্বালা।' (আজাদ; ২০০৪ : ৬৬) কিন্তু দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত শব্দসমূহতেও আর কৃষক বা শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ ঠাঁয় পায়নি। কিংবা তাদের প্রতি দায়বোধ থেকে আর তেমন কোনো কাব্যপঙ্‌ক্তি রচনা করেননি। তাঁর মতো কবির কবিতায় পরবর্তী সময়ে আর কৃষি ও শ্রমজীবন না আসাটা বিস্ময়কর। কারণ এরপর রাজনৈতিকভাবেই কৃষক ও শ্রমিক নানা দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত (২০ মে ১৯৫৪) করার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

মওলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। তাঁর দলের মূলনীতির অন্যতম ছিল, '...পূর্ববাংলার জন্য গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে জমি প্রদান, জমি পুনর্বণ্টনের সময় ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের অগ্রাধিকার দান ও পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা প্রভৃতি।' (সাঈদ; ১৯৮৩: ৫১) তবু বলতে হয়, "কৃষকের গান" কবিতায় কবি যথার্থ কাব্যিকতা দিয়ে কৃষকদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা এ-রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে অনেকাংশেই অভিন্ন। পঞ্চাশের অন্য কবিরাও কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেদের পক্ষভুক্ত করে খুব বেশি কাব্য রচনা করেছেন, তেমনটা দুর্লভই বলা যায়।

বাংলাদেশের কবিতার অগ্রযাত্রা যাঁদের হাত ধরে আরম্ভ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি ঐতিহাসিক সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*র অন্যতম কবি। তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয় *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনেই। গল্পগ্রন্থ (১৯৫৪) প্রথম প্রকাশিত হলেও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দিক থেকেও সৈয়দ শামসুল হক যথেষ্ট এগিয়ে। তাঁর চেয়ে জ্যেষ্ঠ কবিদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অনেক পরে। অবশ্য ১৯৫৭ সালে *বুনোবৃষ্টির গান* নামের গ্রন্থটির স্বীকৃতি দিলে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর পরই হতো তাঁর কাব্য প্রকাশের অবস্থান। সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) আত্মস্বীকৃত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *একদা এক রাজ্যে*। প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। তাঁর কৈশোর কুড়িগ্রামে অতিবাহিত হলেও তিনি আর ফিরে যাননি শিশু-কিশোরবেলার স্মৃতি-বিজড়িত জন্মগ্রামে। জীবনের প্রায় এক দশক কাটিয়েছেন লন্ডনে (১৯৭১-১৯৭৮); বাকি সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাটিয়েছেন রাজধানী শহর ঢাকায়। তাই তাঁর হাতে নিখাদ নগরকেন্দ্রিক কবিতা যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি তাঁর কবিতায় অনুভূত হয় শেকড়ের প্রতি টান। তিনিও যেহেতু সাংগঠনিকভাবে কোনো সাম্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের চর্চা করেননি, তাই তাঁর কবিতাতেও কৃষক বা শ্রমিকদের প্রসঙ্গ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসেছে কবিতার আলংকারিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

কবি শামসুর রাহমান ও আলাউদ্দিন আল আজাদ সংখ্যায় কম হলেও শুধু কৃষক-শ্রমিককে বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে আলাদা দুঃখবোধ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে, ব্যক্তিমনের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গকে ভিত্তি করে, বাংলার মানুষের অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ নিয়ে, বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতি নিয়ে, মানব-মানবীর প্রেম—সর্বোপরি রোমান্টিকতা নিয়ে সমগ্র কবিতার জগৎ গড়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতার বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে বাংলাদেশের কবিতার ঋতুবৈচিত্র্য। তাঁর প্রিয় ঋতু গ্রীষ্ম। প্রিয় মাস

বৈশাখ। বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ তাঁর কবিতার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কারণ বৈশাখের 'খর-রৌদ্র', 'উত্তাপ', 'দাবদাহ' তাঁকে আরও সৃষ্টিশীল করে তুলত। *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* নামে রয়েছে দীর্ঘ এক কবিতা, যেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কাব্যগ্রন্থও। বৈশাখ নানাভাবে সৈয়দ হকের কবিতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কবিতাকে সমৃদ্ধও করেছে। তাঁর কবিতায় অন্যতম প্রবণতা ব্যক্তির স্বরূপ অন্বেষার পাশাপাশি বাঙালির শেকড়কে অবলম্বন করা। ফলে বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব পুরাণ, বাঙালির সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোক-ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় সাড়ম্বরে স্থান পেয়েছে। এত কিছুর পরও কবিতায় এ-দেশের কৃষক বা শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে কিংবা তাদের পক্ষ নিয়ে অথবা তাদের দুঃখবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মমত্ববোধসম্পন্ন কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তেমন কবিতা সৈয়দ হকের কবিতাসমূহের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। অনুসন্ধান করে মুষ্টিমেয় কবিতায় পাওয়া যায় কৃষক ও শ্রমিকের নানা অনুষঙ্গ—তাকে কোনোভাবেই তাদের 'জীবনপ্রসঙ্গ' বলা যায় না। ওই কবিতাগুলো যে শ্রমজীবনকে অবলম্বন করে কিংবা তাদের কল্যাণ কামনা করে কিংবা তাদের সংগ্রামী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিত্রায়িত করেছেন, এমন ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো দুরূহ। কোনো কোনো সময় তাদের জীবনপ্রসঙ্গ এসেছে কেবল তাঁর কবিতার সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্য। কখনো কখনো এসেছে আলংকারিক শব্দসমূহের অনুগামী বিকল্প শব্দ হিসেবে। কারণ, 'সৈয়দ শামসুল হক এ জীবনের পরিচর্যা করেন জীবনের ক্ষয়িষ্ণু রূপ, জীবনের অন্ধকার, ক্লেদ, আর গ্লানিকে দৃশ্যমান করার জন্যে নয়, এ জীবনকে নতুনভাবে গড়ার জন্যে নয়। কবি শামসুল হক সমাজ-সংস্কারক নন। কোনো রাজনৈতিক বা আদর্শগত চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সমাজকে বিশ্লেষণ করেন না। বরং বলা যায়, সৈয়দ শামসুল হক নীতি আর তত্ত্বের বাইরে থেকেই জীবনকে অনাবৃত করেন।' (রফিকুল; ১৯৭১: আটাত্তর)

সে-কারণেই বলা যায়, 'নীতি আর তত্ত্বের বাইরে থেকেই' শৈশবের নানা স্মৃতিবিজড়িত কুড়িগ্রাম এবং সেখানকার অধিবাসীদের সংগ্রামী জীবন এবং চল্লিশের দশকের (১৯৪৮) শেষ দিকে কেবল অধ্যয়নের জন্য সদ্য 'নতুন দেশের' রাজধানী ঢাকায় আসা সাধারণ শ্রমজীবীদের জীবনপ্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি সন্নিবদ্ধ হতে পারত সৈয়দ হকের কবিতায়। কবিতা, গল্পের পাশাপাশি কাব্যনাট্য, উপন্যাস, বিচিত্র গদ্য রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। সব্যসাচী লেখক হিসেবে রয়েছে সমধিক গ্রহণযোগ্যতা। আলাদাভাবে কবি হিসেবেও বাংলাদেশের সাহিত্যে রয়েছে তাঁর বিপুল অবদান। নিজেকে তিনি কবি হিসেবে ভাবতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো কবিতা নিয়েও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কাব্যযাত্রার প্রারম্ভিককালে বাংলাদেশের নগর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি কেবল উদীয়মান। কৃষিই তখন জনমানুষের উপার্জনের প্রধান

অবলম্বন। আবার সংগ্রাম ও বঞ্চনা—দুই-ই তাদের বেশি। তাঁর কাব্যকলা আধুনিক নানা উপাদানে সুগঠিত। কবিতায় সমাজ নয়, ব্যক্তির চৈতন্যই তাঁর কাছে প্রধান। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী ও কামনা-বাসনা। এ সবই সৈয়দ হকের কবিতাশিল্প গঠনে সমৃদ্ধি দান করেছে। সে-কারণেই তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে এ-বক্তব্য গ্রহণযোগ্য :

> প্রসঙ্গের দিক থেকে তিনি কবিতায় গ্রহণ করেন নারী, অবদমনজনিত প্রেম এবং অপ্রাপ্তিজনিত বিকলন। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় মনোজাগতিক সমস্যাই হয়ে ওঠে প্রধান উপজীব্য বিষয়। ব্যক্তিগত পৃথিবীর বাইরে দৃষ্টি প্রক্ষেপের কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন না এই কবি। সম্ভোগচেতনা প্রধান হয়ে ওঠে বিপরীতের সাহচর্যে। ফলে সৈয়দ হকের কবিতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে একজন নারী, যাকে আবর্তিত করে বিকশিত হবে তাঁর কল্পনাপ্রতিভা। (মাসুদুজ্জামান; ১৯৯৩: ২৪১)

উপর্যুক্ত বক্তব্য সৈয়দ হকের কবিতার ক্ষেত্রে যথার্থই। এর বাইরে বলা যায়, 'অনর্গল উষ্ণ ও উচ্ছল লাল নীল সবুজ তমসাকে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত করতে পারেন শামসুল হক, তাদের দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন কবিতায়, কবি হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের এইটেই সবচেয়ে বদ সার্থকতা।' (রফিকুল; ১৯৭১: সাতাত্তর) তবে লক্ষ করার বিষয়, যে বাহান্নো তাঁদের প্রজন্মকে কবি করে তুলল, যে উত্তাল ষাটের দশক তাদের নিজস্ব পথে হাঁটতে শেখাল, সেসব বিষয়ে সৈয়দ হকের কবিতা খুব বেশি সরব নয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম-সংঘবদ্ধতা কিংবা এত কিছুর অন্যতম কারণ ছিল সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। হয় সরাসরি, নাহয় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সদ্য শহুরে আগমন করা তাদের সন্তানেরা এসব সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁদের কারণেই ছয়দফার ভিত্তিতে বাঙালির সর্বৈব আন্দোলন ও অস্তিত্বের লড়াই হয়েছে এবং তাদের অবদান ও অংশগ্রহণের কারণেই ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন সফল হয়েছে। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণিকে বাদ দিয়ে এসব আন্দোলন ছিল অসম্ভব। সময়োচিত বা যুগচেতনার কার্যকর প্রতিফলন হিসেবে তাঁর কবিতা এসবের সাক্ষ্য বহন করে না। (রফিক; ২০০১: ১৮২) এতদ্‌সত্ত্বেও সৈয়দ হকের কবিতায় যখন দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গ আসে, তখন মানুষের সংগ্রামের ইঙ্গিতও চিত্রায়িত হয়, যেমনটা হয়েছে "খাদ্য ও খাদক। এক" কবিতায়। দিনের পর দিন সারা বিশ্বের শোষিত জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দিয়ে যে 'মজা' পেয়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তি, তাদের কটাক্ষ করে সৈয়দ হক এ শিল্পিত কবিতায় তুলে এনেছেন বাংলার কৃষকের প্রসঙ্গ :

> এশিয়ায় আফ্রিকায় অবিকল সেই
> একই স্বাদ; নিয়মিত খেতে বড় শখ।
> তবে যদি প্রশ্ন করো উত্তম কোথায়?—

সবচেয়ে খেতে ভালো বাংলার কৃষক।
সম্প্রতি এখানে তাই প্রান্তরে সোঁতায়
ঘুরি আমি রাত্রিদিন শানিয়ে নখর।
রোদে জলে ভিজে পুড়ে শক্ত আঁশ, তবু
প্রচুর রসালো এই কৃষ্ণ হলধর।
(হক; ১৯৯৯: ১১০)

পরের কবিতা "আমিও বাংলার লোক"-এ তিনি কৃষকের প্রসঙ্গ এনেছেন সুনিপুণ ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে। বলার ধরন সুদৃঢ় ও স্পষ্ট: 'আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতই/ সমতল, সংগীতের শস্যভারে নত, দূরগামী/ পদ্মার মতই ধীর, পলিমাটি আত্মায় সঞ্চিত।' (হক; ১৯৯৯: ১১১) অবশ্য এ-কবিতাগুলো পঞ্চাশের দশকে রচিত কবিতাবলি নিয়ে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নয়। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত *প্রতিধ্বনিগণ* কাব্যগ্রন্থের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ ক্ষীণভাবে হলেও এসেছে। যেহেতু তাঁর কাব্যপ্রবণতা ভিন্ন, তা-ই তাঁর কবিতায় অবধারিতভাবে কৃষক-শ্রমিক না থাকাটা অপ্রত্যাশিতও নয়। তবে নতুন দেশ, নতুন সময়, নতুন সংকট, নতুন সংগ্রাম, নতুন চেতনা—এসব কারণে পঞ্চাশের দশকের কাব্যে সাধারণ মানুষ তথা বঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রসঙ্গ কবিতা হয়ে উঠলে সামাজিক দায়বদ্ধ কবি হিসেবে তাতে পাঠকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতো। কেননা, ১৯৭৪ সালে যখন তিনি প্রবাসী, তখন কবিতায় এনেছেন ফেলে আসা স্মৃতিকে। সেই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করেছেন অসাধারণ উপমা ব্যবহারের মাধ্যমে। আর তার পাশাপাশি সংগতিপূর্ণভাবে এসেছে কৃষকের ধানখেতের প্রসঙ্গ : 'এশিয়ার ধানখেতের ভেতর দিয়ে/ পূর্ণিমায় কাননঘেরা বিদ্যালয়ের দিকে যেতাম;/ সেই ধানখেতের ভেতর দিয়েই আমি আজ/ অমাবস্যার আগুনঘেরা বসতির দিকে।।' (হক; ১৯৯৯: ১২৪) একই কাব্যের মাঝে কেবল কৃষি বা কৃষক নয়, নদীকেন্দ্রিক সাধারণ আরেক পেশাজীবী নৌকার মাঝির সঙ্গে তুলনা করেছেন এশিয়ার সব দেশ ও তার সমস্ত অধিবাসীকে। কবিতাটির নাম "গুণটানা নৌকোর মতো"। শ্রমজীবনকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে কবিতাটি রচিত নয়। মূলত কৃষিক্ষেত্রের অপরিহার্য অনুষঙ্গের কথা কবিতায় এনেছেন দক্ষতার সঙ্গে :

চাঁদের অবিরাম ক্ষয়   পায়ের চাপে ভেঙ্গে যায়
কোদালে মাটি
পাট-কাটা ক্ষেতে রক্তাক্ত পায়ের পাতার মতো...
দিনের   দিকে   যাওয়া

বিপুল কেরায়া নিয়ে এশিয়ার প্রাণ গুণটানা নৌকোর মতো
স্রোত ঠেলে মোহনায় যায়
(হক; ১৯৯৯: ১২৯)

এই গুণটানা নৌকার মাঝির মতো সংগ্রামী জীবনকে তুলে আনার মধ্য দিয়ে সৈয়দ হক নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেন শেকড়ের দিকে। কিন্তু তাই বলে এই সংগ্রামী জীবনের পক্ষে কলম ধরেছেন, তা কিন্তু বলা যাবে না। বরং বলতে হয়, কবিতার শ্রীবৃদ্ধি বা সমৃদ্ধির জন্যই কেবল 'কোদাল', 'পাট-কাটা ক্ষেত' প্রভৃতি বিষয় ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এই অনুষঙ্গগুলোর সঙ্গে যে সৈয়দ হকের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, তার সাক্ষ্যও বহন করে কবিতার এই শব্দসমূহ। একই কারণে কবিতা নির্মাণের শ্রমকে বোঝাতে গিয়ে কবি তুলনা করেন কুমোরের নতুন সৃষ্টির শ্রমসাধনার সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে কুমোরের সংগ্রামী জীবনকে তুলে ধরেন না। যেমন: 'তুমি কি দেখেছ তাকে, তোমার সে বারান্দায় যেখানে কুমোর/ সারা দিন গড়ছে ঠাকুর কিছু খড় কিছু কাদামাটি দিয়ে?' (হক; ১৯৯৯: ১৪৫) তবে তাঁর *নিজস্ব বিষয়* (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত কবিতা "ব্রহ্মপুত্রের প্রতি"-তে শেকড়ের প্রতি তাঁর আজন্ম আকর্ষণকে অত্যন্ত স্পষ্ট করেছেন কবি। কেননা, তাঁর পূর্বপুরুষ যুগ-পরম্পরায় কৃষি বা মাঝি বা অন্য কোনো কষ্টসাধ্য শ্রমজীবনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, সেটা এ-কবিতায় তুলে ধরেছেন বিভিন্নভাবে। তাঁর উপস্থাপনা এত শৈল্পিক যে, কেবল ব্যক্তি-কবি নন, বাঙালির আদি পেশা সম্পর্কেও বলেছেন তিনি :

মহর্ষি ব্রহ্মপুত্র, তুমি তো আমাদের প্রধান স্বর্ণকারও বটে,
নিববধি বানিয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ ফেনিল হাঁসুলি ও বালা;
তুমি এখন তোমার বক্ষ থেকে প্রকাশিত করো বিস্ময়,
মানুষের স্বপ্নধৌত মুখের মতো সংখ্যাতীত বিস্ময়
এবং ধীরে আমার দিকে আবার তুমি ঠেলে দাও ঐ নৌকো...
বলো, আমার পিতামহের রত্নপ্রসবিনী রমণীটির কথা
এবং হেমন্তের অপরাহ্নে স্তূপাকার শস্যের কথা,
(হক; ১৯৯৯: ১৯৮-১৯৯)

'হেমন্ত', 'শস্য', হাঁসুলি প্রভৃতি অগণিত লোকজন শব্দ কবি ব্যবহার করেন তাঁর মানসের বিকশিত রূপ হিসেবে। তাঁর কবিতার আকরভূমি এমন শব্দরাজিতে সমৃদ্ধ। কারণ সৈয়দ হকের মানস পটভূমিতে গ্রামীণ মানুষের পেশা ও সংস্কৃতির উপাদান রয়েছে, যা তাঁর কবিতার মৌলশক্তিও বটে। (মাহবুব; ২০০৫: ৩৪) তা না হলে ব্রহ্মপুত্রকে 'মহর্ষি' সম্বোধন করে তিনি লিখতে পারতেন না, 'তুমি তো আমাদের প্রধান স্বর্ণকারও বটে' এবং 'নিরবধি বানিয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ ফেনিল হাঁসুলি ও বালা।'

সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম ব্যতিরেকে কেবল সমগ্র কবিতা পাঠ শেষে তাঁর সম্পর্কে একটা মন্তব্য জোরেশোরে করা যায়, তিনি 'কবি, শিল্পী ও প্রেমিক। এই ত্রিবিধা সত্তার সন্নিপাতে মোহন এক বাক্‌ভঙ্গিমার জন্ম হয় তাঁর কবিতায়, নিজেকে ফিরে ফিরে পান, তাঁর জীবনের সাথে লীন আর গভীর সব অনুষঙ্গকে সূক্ষ্ম বোধজাত অধীরতার কম্প্রনিনাদে ভরে তোলেন, ভুলে যান শিল্পের সীমানা।' (তারিকুল; ২০০৮: ৭৮) ফলে সামষ্টিক চিন্তা, সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অবস্থান এবং তাদের সংগ্রাম, এমনকি সাধারণ মানুষের অযুত-নিযুত সংকট তাঁর কবিতায় যেন উপেক্ষিত থেকে গেছে। হয়তো এ-কারণেই বৈশাখ নিয়ে যে কবির এত উচ্ছ্বাস, সে-কবির কবিতায় কৃষক অক্রিয়ভাবে আসে কবিতার শরীরে। "আবার বৈশাখ" কবিতায় কৃষককে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে বলেছেন, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কখনোই সঠিক মূল্যায়ন পায় না। যেমন পায় না সৃষ্টিশীল মানুষ :

এ এক বৈশাখ সমস্ত কিছুতে লাঙ্গল চালিয়ে
অনবরত দু'ভাগ করে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে;
উড়ছে
বস্তু আর উদ্বেগের কণা বৈশাখের চুল্লির বাতাসে।
কুটিরে তো স্ফটিক-শীতল মেঝে হয় না
কৃষককে কেউ হাওয়া করে না চন্দনের জলে ভেজানো পাখায়।
চিল একটা চিৎকার করে উঠছে থেকে থেকেই।

(হক; ১৯৯৯: ২১৪)

সৈয়দ শামসুল হকের *পরানের গহীন ভিতর* (১৯৮০) পাঠকনন্দিত একটি কাব্য। উপভাষার শব্দসম্ভার ব্যবহৃত হয়েছে এ-কাব্যে। শিল্পিত সনেট এবং এর কাব্যভাষার নতুন নান্দনিক ব্যবহারের কারণে অ্যাকাডেমিশিয়ান ও গবেষকদের কাছেও এ-কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ আগ্রহ উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাহিত্যের বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে তিনি যে নিরীক্ষা করতেন, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি। একজন নাগরিক কবি হঠাৎ করে আঞ্চলিক বা উপভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে রচনা করেছেন সুচারুভাবে। তাতে গ্রামীণ জীবনের প্রেম, রোমান্টিকতা, অভিমান, প্রেমজনিত আবেগ, রাগ-বিরাগ—সবই আছে। কিন্তু অনুপস্থিত বঞ্চনা বা শোষণের চিত্র। কোনো নির্দিষ্ট পেশাজীবীকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, প্রেমের কবিতা হিসেবে কিংবা সুখপাঠ্য হিসেবে কবিতাগুলো তুমুল গ্রহণযোগ্যতা পেলেও কবি 'এক প্রকার দ্বন্দ্বের ফালক্রামে গ্রন্থের সনেটগুলোকে স্পন্দমান করতে চেয়েছেন।...সৈয়দ শামসুল হক লোককবিতার আঙ্গিকে আমাদেরকে যা উপহার দেন তা সন্দেহাতীতভাবে নাগরিকমননজাত—তাঁর কবিতার ভেতরে যে

উদাসী বাউলের কথকতা তা কতটা প্রাকৃতিক, আর কতটা মুখোশ তা তাঁর রূপক বয়নের জটিল-দূরগামিতা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে।' (আশরাফ; ১৯৯৪: ১৮৬) সে-কারণেই সরাসরি কোনো পেশাজীবীর হয়ে কথা বলেন না। এ-কাব্যে কবি কথা বলেন কবিতার প্রয়োজনে রূপকের আড়ালে: 'দীঘল নায়ের মতো দুঃখ এক নদী দিয়া যায়—/ মাঝি নাই, ছই নাই, নাই কোনো কেরায়া কি লোক।' (হক; ১৯৯৯: ২৩৬) প্রায় একইভাবে প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেললে যে রিক্ততা ভর করে প্রেমিকের মনে, সেই অবস্থা বোঝাতে কোনো এক প্রেয়সীর 'কপট' জবানিতে কবি এনেছেন কৃষকের প্রসঙ্গ : 'আমারে হারায়া দেখি জমিহারা চাষী হও কিনা?' (হক; ১৯৯৯: ২৩৭) অন্য কবিতায় বলেছেন, 'কামারের কাছে বান্ধা দিমু এই রূপার লাঙ্গল?' (হক; ১৯৯৯: ২৪২) এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রতীকী তাৎপর্য প্রতিষ্ঠার জন্য রূপকের আড়ালে অন্য কিছু বলার প্রয়াস নেন, শ্রমজীবীদের জীবন-অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন।

সৈয়দ হকের বহুল পঠিত আরেকটি কবিতা "স্বাধীনতা"। কবিতাটি *রজ্জুপথে চলেছি* (১৯৮৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তখন একজন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। গত দশকের আশির ওই সময়টি ছিল বাংলাদেশের জন্য ক্রান্তিকাল। দেড় দশকের বেশি সময় আগে প্রাপ্ত স্বাধীনতা যে সাধারণ মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়নি, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ-কবিতায়। সামাজিক এক দায়িত্ববোধ থেকে কবিতাটি রচিত বললে হয়তো ভুল হবে না। কেননা, এই কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ও সংগ্রামকে, শ্রম ও জীবনকে এবং মৌলিক চাহিদা প্রাপ্তির গুরুত্ব ও আকাঙ্ক্ষাকে এক ও অভিন্ন হিসেবে দেখেছেন। তাঁর এই গভীর উপলব্ধি ব্যক্তিচারিতার উত্তুঙ্গে বাস করা এক রোমান্টিক কবির অসীম আকাশকে মুহূর্তে বাস্তবতার পলিমাটিতে নিবেদিত করে। এই কবিতাতেই তাঁর উপলব্ধি স্পষ্ট হয় যে, শ্রমজীবীদের স্বাধীনতা অর্জিত না হলে, তাদের সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে সুনিশ্চিত জীবনের নিশ্চয়তা না তৈরি হলে, তাকে আসলে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় না। এ-কারণেই সম্ভবত বলতে হয় 'জীবন ও স্বাধীনতা আমাদের হোক' :

> যেমন সংসারের কোনো বিকল্প নেই
>
> —এই সংসার আমাদের রচিত হোক।
>
> যেমন শ্রমের কোনো বিকল্প নেই
>
> —এই শ্রম আমাদের প্রযুক্ত হোক।
>
> অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, বৃষ্টি, কর্ষণ বপন,
>
> স্বপ্ন, ঐক্য, সংগ্রাম, স্পষ্টতা, অভিজ্ঞতা,

চোখ, হাত, পা, কবিতা, গান, নাচ, পট

সংসার, শ্রম, জীবনের ভেতরে অর্জিত জীবন—

স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই,

জীবনের বিকল্প শুধু জীবন;

জীবন ও স্বাধীনতা আমাদের হোক।

(হক; ১৯৯৯: ২৬২)

তবে তাঁর কবিতায় 'কামারশালা', 'চাষী', 'কুমোর', 'কামার', 'মাঝি', 'জেলে'—এসব পেশাজীবীর বাইরে সংগ্রামশীল জীবনের অধিকারী তেমন কোনো পেশাজীবীর প্রসঙ্গ আসেনি। যে প্রতীক বা যে রূপকের জন্য কবি এটি ব্যবহার করুন না কেন, তা কেবল শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবিতাকে তিনি কেবল শিল্পের উচ্চতায় স্থাপন করতেই সচেষ্ট ছিলেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, সৈয়দ শামসুল হকের মনে নাগরিক মনন আর পাশ্চাত্য আধুনিকতার অভিক্ষেপ ক্রিয়াশীল ছিল। কেননা, তরুণ বয়সে পাশ্চাত্য বসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর স্বতন্ত্র মানসবৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছিল।

বাংলাদেশের কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি একই সঙ্গে কবি-প্রাবন্ধিক-কথাশিল্পী-সংগঠক এবং সেই সময়ের তরুণ কবিদের পথপ্রদর্শক। তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদেরও তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। বাংলাদেশের কবিতার আধুনিক ও স্বকীয় যাত্রা আরম্ভ হয় যে সংকলন প্রকাশনার মধ্য দিয়ে, সেটি সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। সংকলনটির বেশির ভাগ লেখকই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। হাসান হাফিজুর রহমান যদি কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ কিংবা অন্য কোনো সৃজনশীল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নাও হতেন, তবু *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকতেন। মূলত পঞ্চাশের দশকের কবিদের নতুন, আধুনিক, কার্যকর ও অভ্রান্ত এক দিশা দিয়েছিলেন তিনি, এ-সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে। মূলত একুশের চেতনা তৎকালীন উঠতি বাঙালি তরুণদের ভেতর যে জাগরণ তৈরি করেছিল, সেই প্রভাবই সৃষ্টির পাখা মেলে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে হাসান হাফিজুর রহমানের অব্যর্থ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে।

তাঁর জন্ম হয়েছিল অনুন্নত এক মফস্বল শহর, জামালপুরে। শৈশব-কৈশোরের বেশ কিছু সময় কেটেছে পৈতৃক নিবাস কুলকান্দি গ্রামে। তবে মাতুলালয়ের শহুরে পরিবেশ তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত। (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ০৯) পিতার বদলির চাকরির সুবাদে গমন করতে হয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। তবে বেশির ভাগ সময় কেটেছে ঢাকায়। পারিবারিক পরিবেশে ছিল বইপড়া ও সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ। 'সওগাত' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি। তাঁর বেড়ে ওঠা

আর অবহেলিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনাবলিকে সমান্তরাল বলা যেতে পারে। কেননা, সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে শুরু করে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন যখন দেখছেন, তিনি তখন কৈশোরোত্তীর্ণ হওয়ার পথে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল সময় ছিল এ দেশের মানুষের জন্য ভীষণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠারও কাল। সংগতকারণে '৫২-র ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ইতিহাস তাঁকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে গড়ে দিয়েছে। তাই বলতেই হয়, 'ভাষা আন্দোলনের সাথে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পৃক্তি কেবল প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ছিলো না, শিল্পিত আবেগে, সৃষ্টিশীলতার যুগান্তকারী প্রকাশে এবং সাংগঠনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় হয়ে উঠেছিলো প্রাণচঞ্চল ও গৌরবময়। তাঁর জীবন ও শিল্পবোধের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিলো নবমাত্রিক সৃজনপ্রেরণার বীজশক্তি।' (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ২২) তবে তারও আগে থেকে তিনি ঢাকার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর সুবাদে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই সাংস্কৃতিক চেতনাই তাঁর ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের মূল স্পিরিট লালনে সহায়ক হয়েছিল। সে-কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনরত ছাত্রবন্ধুদের নিরস্ত করতে গিয়ে নিজেই জড়িয়ে পড়েন সরাসরি। ভেতরের সুপ্ত আগুনের তাড়নায় নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেননি তিনি। এ নিয়ে রয়েছে তাঁর স্মৃতিচারণা :

> একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমি এবং অলি আহাদ মধুর কেন্টিনে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, মেডিক্যাল কলেজের ওখানে ছেলে ইট্-পাটকেল ছুড়ছে তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ করো, নতুবা গুলি চলতে পারে। আমি তাদের নিষেধ করলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলো না। কতক্ষণ পর দেখলাম, আমি নিজেও ইট মারতে শুরু করেছি। তারপর একটা টিয়ার গ্যাসের শেল আমার কাছে পড়লো, কিন্তু সেটা ফাটেনি। আমি সেটা ঘুরিয়ে উল্টাদিকে মারলাম, তিন চার হাত দূরে সেটা পড়লো। (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ২৩)

কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশ নেওয়া অন্যতম ব্যক্তি হাসান হাফিজুর রহমান। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের যে গোপন বৈঠক হয়, সেখানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। উঠতি মধ্যবিত্ত ও সচেতন পরিবারের সদস্য হিসেবে একাধারে সৃষ্টিশীল কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সমানতালে সংঘ ও সংগঠনে সক্রিয় থাকা মুষ্টিমেয় মানুষদের একজন তিনি। একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সেই দৃশ্য, সেই উত্তাপ, প্রবহমান সেই চেতনা তাঁকে সাহসী করে তুলেছে। তাঁকে সৃষ্টিশীল ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে আবির্ভূত করেছে। ফলে নিজে কেবল "অমর একুশে" লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, সমমনা লেখকবন্ধুদের নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যকে নতুন ধারায় উপনীত করতে, নিজেদের রচনাকে কালের অসীম যাত্রায়

প্রতিনিধিত্বশীল করতে—সর্বোপরি অনবদ্য সব সৃষ্টিশীল রচনাকে অমরত্বের মর্যাদায় আসীন করতে তিনি পরিকল্পনা করলেন *একুশে ফেব্রুয়ারী* নামে এক সংকলন প্রকাশের। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হাসান হাফিজুর রহমান সংকলন প্রকাশে ছিলেন অনড়। 'বাংলা কবিতা' যে আজ 'বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা' অভিধায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তার অগ্রযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এ-সংকলন প্রকাশের সাহস ও প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে। বেশির ভাগ লেখা নিজে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন তিনি। কতটা দূরদর্শী ও কর্মঠ ছিলেন, তা উঠে এসেছে সংকলনের প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতানের ভাষ্যে :

> তেপ্পান্ন সালের প্রথম দিকে হাসান প্রস্তাব দিল ৫২-এর উত্তাল ভাষা আন্দোলনের সময়ে আমাদের সুধী লেখক সমাজ তুলি ও কলমের আঁচড়ে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, পুস্তকাকারে তা প্রকাশ করা যায় কিনা। আজকের দিনে অনেকেই ভাবতে পারেন, কাজটি কত সহজ।...আমরা যারা রাজনীতি করতাম, ৮ পয়সা থেকে ১২ পয়সায় খাবার পেলে রাজভোগ খাওয়া হ'ত মনে করতাম। সেই সময়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' বইটা বের করতে সেই মুহূর্তেই ৫০০.০০ টাকার প্রয়োজন। আমার আর হাসানের হাতে ৫০ টাকাও নেই। সমাধান করে দিল হাসান। বাড়ীতে গিয়ে জমি বেচে সে টাকা নিয়ে আসবে। যা ইচ্ছা, যা চিন্তা, হাসান তাই করল। (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ২৪)

উল্লেখ্য, এই সংকলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কবিতার যে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা-ই আজও বাংলাদেশের কবিতার শরীরে-ধমনীতে প্রবহমান। দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই যুগ আগে—সাতচল্লিশের পর থেকে আমাদের সাহিত্য যে বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, সংস্কৃতি ও নিসর্গ-ঐতিহ্যকে আধার হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এ-সংকলনের কবিদের কাব্যচর্চার প্রতিজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মধ্য দিয়ে। নানা ধরনের প্রগতিশীল সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী ও বিচিত্র কর্মজীবনের অধিকারী কবি হাসান হাফিজুর রহমানের মন ও মানসে সর্বদাই বিরাজমান থাকত দেশপ্রেম, সংস্কৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও দায়িত্ব, সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি। পাশাপাশি 'ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী পর্যায়ে মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে' যে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল, তা হয়ে উঠেছিল তাঁর লেখা ও সাধনার বিষয়। আর তাই তাঁর কবিতাতেও সেসব বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। পঞ্চাশের উপর্যুক্ত কবিদের মতো তিনিও সরাসরি রাজনৈতিক দলের কোনো আদর্শকে লালন করেননি। নাগরিক যন্ত্রণা, সামাজিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের বাসিন্দাদের দৃষ্টিতে তিনি যাপন করেছেন তাঁর কবিজীবন। তাই 'আত্মজিজ্ঞাসা ও সত্তাসন্ধানের সমগ্রতায় কবি জীবনের সূচনা থেকেই হাসান হাফিজুর রহমান স্বতন্ত্র শিল্প-অভিপ্রায়ে বিশিষ্ট। সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়-সংকটকে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন

করেছিলেন।...১৯৪৮ সাল থেকে সূচিত ভাষা আন্দোলন, দ্বন্দ্ব-জটিল সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সমাজমানসের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দুঃসহ বাস্তবতা এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ ও আত্ম-উজ্জীবন সংবেদনশীল শিল্পিচিত্তে হয়ে উঠেছিলো নবসৃষ্টির পথনির্দেশনা।' (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ৭৬) ফলে রাজনৈতিক শহুরে সংস্কৃতির বাইরে কৃষক ও শ্রমজীবন তাঁর কবিতাতেও প্রাধান্য পায়নি। মাঝেমধ্যে কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ইমেজ হিসেবে স্থান পেয়েছে তৎকালীন ছিন্নমূল শ্রেণিপেশার মানুষজন। তাঁর কবিতার উপাদানকে সমৃদ্ধ করতে কিংবা কবিতাকে পূর্ণতা দান করতে নানা উপমা বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেই সময়ে সবচেয়ে অবহেলিত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অধিকারী কৃষি ও শ্রমজীবীরা। তবে মাটি ও নিসর্গ, দেশপ্রেমের অকৃত্রিম ব্যবহার তাঁকে বাংলাদেশের কবিতায় স্থায়ী আসন পেতে দিয়েছে। তাই যতটুকু শ্রমজীবন এসেছে, তা আমাদের অন্বিষ্ট শ্রমজীবনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অতীত-গর্ভে নিমজ্জিত রাষ্ট্রীয় আদর্শ হলো পরিত্যাজ্য, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি স্বীয় মতাদর্শ ও চিন্তাধারা শিল্পকলার মৌল উপাদানে পরিণত হওয়ার অবকাশ পেলো। আর শিল্পীরাই যেহেতু সমাজের প্রাগ্রসর ও প্রাজ্ঞ চেতনার অধিকারী, সেই পরপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশের কবিদের দায় বৃদ্ধি পেল। বাংলাদেশের কবিতার ধারায় হাসান হাফিজুর রহমান সেই দায়বদ্ধ কবিগণের মধ্যে অন্যতম অগ্রবর্তী ও অকৃত্রিম ব্যক্তিত্ব। (রফিকউল্লাহ; ১৯৯৩: ৭৬)

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩)। এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলি ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ সময়পর্বে রচিত। ব্যাপ্তিকাল দেখেই স্পষ্ট বোধগম্য হয়, এ দেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি কতটা বৈরী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও রয়েছে একধরনের নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। এ-গ্রন্থ কেবল নয়, তাঁর বেশির ভাগ কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই একধরনের যুগচিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাতার থেকে তা ইতিবাচক হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ কবিতা তো বটেই, কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়েও মূলত তিনি সেই সময়ের প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর যে যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা, তাই প্রস্ফুটিত কাব্যনামের নেপথ্যে। কারণ, 'কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার বৃত্তায়ন কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করে পাখা মেলে তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে। প্রান্তর যেখানে বিমুখ, শব্দ যেখানে আর্ত, শর যেখানে অন্তিম সেখানে আবেগের স্বরূপ অস্পষ্ট নয়। এই নেতিবাচকতা মূলত শাসকমহলের বিরুদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কৌশল।' (রফিকুল; ১৯৭১: বাহাত্তর)

কবি শুরু থেকেই এই দেশের মানুষ ও মাটির প্রতি আবেগ ও দায়িত্ববোধ থেকে কবিতা নির্মাণ করেছেন। মাটি ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ভাবনাই তাঁর কবিতায় ক্রমশ আশাবাদিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে কবিতার উপাদানকে সমৃদ্ধ করতে তিনি শরণ নিয়েছেন দেশের বেশির ভাগ শ্রেণি-পেশার মানুষের। সে-কারণে কবিতার চিত্রকল্পে ধরা পড়ে এ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পেশাজীবীকে। স্বভাবতই শেকড়সন্ধানী কবি তাঁর অতীত বিস্মৃত হতে পারেন না। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনযাপন ও চিন্তায় অভ্যস্ত কবি তাই নিজস্ব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শামিল করেন অস্তিত্বনিবিড় গ্রামীণ জীবনের দৃশ্যকল্পের মধ্য দিয়ে। কোনো কোনো কবিতার শব্দচয়নে খানিকটা স্মৃতিকাতরও হয়ে পড়েছেন, যাকে তিনি ধারণ করেছেন "স্মৃতির আগুন জ্বলে" বলে :

কতদিন হাঁটি নাতো আমি ধু-ধু করা পথে
শুনি না নৌকার মাঝি ডাকে দূর থেকে তরল আঁধারে
হাট শেষে সঙ্গীসাথীদের সাথে বাড়ি ফেরবার তাড়া
জাগে না চলায় কতদিন
কতদিন একা একা মাঠে জলে ভুলে
অজানায় কেঁপে কেঁপে হারাই না সন্ধ্যার শ্যামলে

(হাসান; ২০০১: ২৯)

'নৌকার মাঝি ডাকে' কিংবা 'একা একা মাঠে জলে ভুলে'র প্রসঙ্গ তিনিই কবিতায় আনতে পারেন, যার শেকড়ের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের চেনাজানা রয়েছে গভীরভাবে। তাই উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন শ্রমজীবীদের। অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এই পেশাজীবীদের প্রসঙ্গ কবিতায় এনে কিংবা কবিতার শরীরে তাদের প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর কবিতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন সত্য। পাশাপাশি তিনি যে পদ্মা-যমুনা বিধৌত ভাঁটি অঞ্চলের 'বাঙাল চাষা'দেরই প্রতিনিধি, সেই সুগন্ধ অস্তিত্বে ধারণ করে "স্তব্ধ-মুখ" কবিতায় বলেছেন সচরাচর না-বলা অনেক কথা। উর্বর পলিমাটি কৃষকের পরম কাঙ্ক্ষিত, আরাধ্যও। নদী বা প্রকৃতির বিরূপ আচরণও কৃষককে তাদের জীবনঘষে আগুন জ্বালানো সেই আরাধনা থেকে কিংবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে নিরস্ত করতে পারে না। সেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকা একগুয়েমি দিয়েই যে জয় করতে হয় জাতীয় জীবনের হাজারো বিরূপতা, তাকেই তিনি কবিতায় উচ্চকিত ও শিল্পিত করেছেন 'গোঁ-ধরা ষাঁড়ের মতো' 'বাঙাল চাষা' বলে। উদাহরণ :

নিরবধি কাল পদ্মা যমুনা বাংলারই
যদিও একরোখা, গোঁ-ধরা ষাঁড়ের
মতো কিংবা বাঙাল চাষার মতো ঘাড় বাঁকানো।

দু-ধারে তার বাৎসরিক পলিমাটি,
আবাদে অনাবাদে, ভালোমন্দে গড়ে-ওঠা
পুব-পশ্চিমের ডানা,...
প্রাণান্ত উদ্যম আর ঘাড়-বাঁকানো তরল তুড়ি
কান্নার সাথে ঘাম আর মায়াময় জন্মের ক্লেদ
শ্রম আর অক্লান্ত বিশ্রামে বিচিত্র
না জানি কী আছে স্তব্ধতায়।
(হাসান; ২০০১: ৩৩-৩৪)

উপর্যুক্ত কবিতাবলির চমৎকার শব্দ-কারুকার্যের আড়ালে ব্যজস্তুতির ছলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা নমনীয়-কমনীয় রূপ বদলে বাঙালিকে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন কবি। তাতে যত ঘাম-শ্রমই ব্যয় হোক না কেন, যত ত্যাগই স্বীকার করতে হোক না কেন। 'যন্ত্রণার অম্লান বেদি মাটির সে আবেগে' তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে অবিচল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে জটিল করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনকে ক্রমশ কঠিন করে তুলেছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সেই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের একজন সক্রিয় কবি-কর্মীর ভাবনায় সামগ্রিকতাই পাওয়ার কথা। সেই সত্যানুসন্ধানই করে গেছেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। কারণ, পদ্মা-যমুনা যেমন বাংলাদেশেরই নদী, কবিতাও বাংলাদেশেরই। স্বদেশ, সমকাল ঐতিহ্য তাঁর কবিতার অনিঃশেষ পরিপূরক। তিনি কেবল কবিতা নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হননি, সমাজ-রাজনীতি-মানুষ-ভূগোলও সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তাই তাঁর স্বদেশ-চেতনা যেমন শহুরের মানুষের চিন্তাচেতনাকে সজাগ করে, তেমনি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহ্য ব্যক্তি-কবিকেই উজ্জীবিত করে রাখে। সাধারণের হার-না-মানা জীবনসংগ্রামী বৈশিষ্ট্যই স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বা নিজের ভেতরের লড়াকু চৈতন্যের গভীরতাকে সামনে আনে। সেই চৈতন্যের স্মারকই কবিতা হয়ে সেই সময়ের সংগ্রামী মানুষের সামনে আসে এই বলে: 'ভালোবাসি মাটি, সুজলা সুফলা বিঘোষিত কুশলা/ বাংলা গর্বিত কাদামাটি আবহাওয়া আলোকের স্বদেশের/ প্রেরণায় আপনার মন অবারিত পেলে লক্ষ মন ডেকে নিতে।' (হাসান; ২০০১: ৩৪-৩৫)

সামাজিক দায়বদ্ধ বা সমাজ-সচেতন কবি হিসেবে হাসান হাফিজুর রহমান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সারা জীবন করেছেন তিনি প্রগতিশীল চিন্তার চর্চা। স্বদেশ প্রেম, মাটি, ঐতিহ্যের ব্যবহার তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে অনন্য। তার ক্ষেত্রে বলা যায়, কবিতার মাধ্যমে তিনি সরাসরি কৃষক বা শ্রমিকের পক্ষাবলম্বন করেছেন কিংবা তাঁদের জীবনমান ও বঞ্চনা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত সুলভ না হলেও বিরল নয়। তবে শোষণের সামাজিক বিন্যাসটি স্পষ্টভাবে গোচরীভূত

না হলেও এ-কাব্যগ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ-উপমা-রূপক থেকে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর প্রতি তাঁর একধরনের পক্ষপাত উপলব্ধি করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। (মিনার; ১৯৯৯: ৭৬)

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিযাত্রার মূলে ছিল স্বদেশচেতনা, সংস্কৃতিচেতনা, একুশের চেতনা—সর্বোপরি বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষায় কবিতা নির্মাণের কমিটমেন্ট। মানুষ, সমাজ ও শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি কবিতাকে অনন্য মাত্রা দান করেছেন। সামাজিক ও মানবিক প্রেরণাতেই তিনি দেশ ও কাব্যচেতনার সঙ্গে সংলগ্নতার সূত্রে অর্জন করে নেন উজ্জীবনের বোধ, যা হয়ে ওঠে তাঁর সামগ্রিক কাব্যচেতনার মৌল ভিত্তি। (মাসুদুজ্জামান; ১৯৯৩: ২৪৯) এই বোধের বাস্তবায়ন ঘটাতে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে তিনি শরণ নেন মাটির ও শ্যামল বাংলার; আর মাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য শ্রমজীবী মানুষের। তবে মাটি নিয়ে মনোরম উপমা-রূপক-প্রতীকের ব্যবহারের দিক থেকে তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র ও স্বকীয়। জন্মভূমি বা মাটির প্রতি আন্তরিক টানই হয়তো তাঁকে উপাদান হিসেবে মাটিকে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। "স্বদেশ আমার" কবিতায় কবি বলেছেন :

> দর্পিত দর্পণ যেন স্বদেশ আমার
> নদীনালা গাছপালা প্রশান্ত খামার...
> কাদামাখা চাষাভুষো মেহনতি হাত
> অর্পিত দেহের ভার রাখে পলিত্বকে
> নির্বিশেষ স্তন দাও ক্ষুধার পাবকে
> অক্লান্ত উৎস তুমি প্রাণের প্রপাত।
>
> (হাসান; ২০০১: ৩৭)

কৃষিশ্রমিকের প্রতি কবির একধরনের পক্ষপাত ছিল। কেননা, 'স্বদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা পক্ষ, রয়েছে শ্রেণীগত বৈষম্য। বাংলার সমাজ প্রধানত কৃষিনির্ভর। আর এই কৃষিনির্ভর সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীই হচ্ছে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক।' (মিনার; ১৯৯৯: ৭৬) তাই তাঁর বিখ্যাত কবিতা "অমর একুশে"তেও তিনি উপাদান হিসেবে কৃষক-শ্রমিককে এনেছেন স্বকীয় কৌশলে। মাতৃভূমির আদলে একজন মাকে সম্বোধন করে মূলত তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের জাতিগত অনুভূতি কবিতার শরীরে গেঁথে রাখতে চেয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মাহুতি কেবল প্রাণ বিসর্জনই নয়, তা ছিল নতুন স্বপ্নের অঙ্কুরোদ্গমও। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সেই আত্মত্যাগ অবারিত সাহসও সঞ্চার করেছিল বাঙালির মনে। সেই উপলব্ধি থেকে হাসান এ-কবিতায় উচ্চারণ করেছেন :

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালি শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি;
দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে-জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে...
তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম;
শ্রমিক তার শিল্পে প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,...
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি।

(হাসান; ২০০১: ৪০-৪২)

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা-মাটি-দেশ এক ও অভিন্ন বীজতলা হয়ে ওঠে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়। কারণ, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের যে প্রবহমান ধারা, তিনি তারই উত্তরাধিকার বহন করছেন নিজের মেধা ও মননে। তাঁর কবিতা সহজে একটা সমৃদ্ধতর ও সুদৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজের অভ্যন্তরে। এর শেকড় বিস্তৃত রয়েছে সুদূর অতীতে এবং তার শাখাপ্রশাখাগুলো আন্দোলিত হয়েছে সেই সময়রে অস্থির প্রেক্ষাপটে। এর মধ্যে কৃষিশ্রমিক এবং তাদের পবিত্র হাতের স্পর্শে উৎপাদন করা ফসলের কথাও কবিতায় শিল্পিত করেন :

ফসলের সম্পন্ন মহিমা গেলো ঢেকে ধূলিঝড়ে, কিছুই করে না ছায়াপাত
কেননা সকল অপঘাত কৌশলে এড়িয়ে সাধা।
সুমসৃণ আমার ললাট। কেননা কখনো আমি হইনি উত্তরগামী
কখনো ছুঁইনি নিষিদ্ধ কপাট।

(হাসান; ২০০১: ১৪৬)

কবি যে নগরজীবনে অভ্যস্ত, তাও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় কবিতাযাপনে। শহুরে মানুষের খাদ্যপ্রবাহ, অর্থনীতির নিশ্চয়তা অক্ষুণ্ন রাখে যারা, তাদের অবস্থানকে তিনি উচ্চমূল্য দিয়েছেন নানা শব্দচয়নে। তাঁর শব্দপ্রয়োগে, তাঁর পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে নাগরিকতার ছাপ কবিতার উচ্চমান নিশ্চিত করেছে। তাই ফেলে আসা সুজলা-সুফলা গ্রামীণ সৌরভ যে নগরকে প্রভাবিত করে প্রতিনিয়ত, তা তিনি স্বীকার করতে চান কবিতাকথনে :

সহজাত ফুর্তির তাড়ায়
সাঁঝ ভুরভুর কাঁঠালিচাঁপার সহজ মাতাল ঘ্রাণে,
এমনকি গোঁয়ার গ্রামীণতা ঢুকে পড়ে নগরে আমার?
নিশিডাকে ছোটে কী সম্মোহিত
শহুরে মরাল
নাগরিক পাথুরে অলিন্দ ছেড়ে অজান্তে পায়ে পায়ে?
এখনো গোঠে ফেরে ধেনু, গোধূলিতে নতজানু
বাঙলার কৃষক নীরবে উঁচিয়ে মুখ দ্যাখে সন্ধ্যাতারা,
দিনশেষে নদীরা মলিন হয় শান্ত-পীঠ গাছগাছালির ছায়ায়
উঠোনে বিছিয়ে আঁচল কিষাণীর যে প্রবল দুপুর
কেটে যায় প্রতিবেলা ফিরে আসে চিরকাল।

(হাসান; ২০০১: ১৫১)

প্রশ্নের আদলে মূলত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন কবি। পেয়েও গেছেন সেই উত্তর। বায়ান্নোয় প্রোথিত চেতনাই যে বিস্তৃতি পেয়েছে একাত্তর পর্যন্ত এবং তাতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পেশাজীবী গোষ্ঠী কৃষক বা কৃষিশ্রমিকের যে অকৃত্রিম অবদান ছিল, সে-বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে উপর্যুক্ত কবিতায়। ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কীভাবে অস্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত হয়, সেই প্রবহমান চৈতন্যই তাঁকে সৃষ্টিশীল করে রেখেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি মুক্তি চেয়েছেন পরাধীনতার কবল থেকে। এই জাতীয় চেতনা ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিকে জাগ্রত করেছে বলেই তিনি বারবার শিকড়ের শরণ নিয়েছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো কিছু বস্তুর অধীনতা মুক্তি পেলেই যেমন স্বকীয় হয়ে ওঠে, তেমনি সমহিমায় মর্যাদাসম্পন্ন শৈল্পিক উত্তরণ ঘটে এবং বিষয়ও অমন সর্বজনীনতা লাভ করে। তাই বলা চলে কাব্যের বিষয় যে-কোনো আপাতনির্দিষ্টতার কাঠামো পেরিয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে। তাই কবিরা হয়ে ওঠেন অনন্যপ্রত্যয়ী। সুতরাং বিষয়ের অধিকারে তাঁরা নন, বিষয়ই তাঁদের অধিকারে। কবিতার জন্যই বিষয়, বিষয়ের জন্য কবিতা নয়। (হাসান; ২০০০: ১১) এই কবিতার জন্য বিষয় হিসেবে বেশির ভাগ সময় তিনি নির্ধারণ করেছেন দেশপ্রেম ও দেশপ্রেমজাত জাতীয় আবেগ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি, যা দিয়ে মূলত সমষ্টিকেই আলোড়িত করেছেন।

হাসান হাফিজুর রহমানের *যখন উদ্যত সঙ্গিন* কাব্যগ্রন্থ রচনার কালপরিসর জানুয়ারি **১৯৭১** থেকে অক্টোবর **১৯৭২**। সময় সাক্ষ্য দিচ্ছে, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের জন্মকালে লেখা হয়েছে এ-গ্রন্থের কবিতাসমূহ। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত (এমনকি পরেও) যত আন্দোলন

হয়েছে, তা সফল হয়েছে এ দেশের সব শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে। বিশেষ করে যখন কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী, বঞ্চিত পেশাজীবীরা সাড়া দেয় এবং অংশগ্রহণ করে, তখন তাতে দেশের সামগ্রিক চেতনার প্রতিফলন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঠিক তেমন ঘটনাই সংঘটতি হয়েছিল। দেশের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রবল ও ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। ফলে বাঙালি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। হাসান হাফিজুর রহমানের কাছে তারাই শ্যামল বাংলার মুখচ্ছবি, তারাই বাংলার মায়ের প্রকৃত সন্তান। একাত্তরে দেশের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা তাঁকে আলোড়িত করেছে। এই অভাবনীয় চিত্র দেখে তিনি উজ্জীবিত হয়েছেন, আশাবাদী হয়েছেন। তাই কবিতার নামকরণ করেছেন "তোমার আপন পতাকা"। একই কারণে কবিতাটি প্রাণের কথা হয়ে ওঠে: 'এবার মোছাবো তোমার আপন পতাকায়।' এই শক্তি ও সাহস তার ভেতরে সঞ্চার করেছে যুগ যুগ ধরে অনালোকিত জীবনকে নিয়ে সংগ্রামরত এ দেশের বঞ্চিত-ক্ষুধার্ত শ্রমজীবীগণ। তাদের অবদানকে উচ্চকিত করতে তিনি এ-কবিতার শিল্পিত উচ্চারণে বলেছেন :

কে আসে সঙ্গে দেখ দেখ চেয়ে আজ:
কারখানার রাজা, লাঙ্গলের নাবিক,
উত্তাল ঢেউয়ের শাসক উদ্যত বৈঠা হাতে মাল্লা দল,
এবং কামার কুমোর তাঁতি। এরা তো সবাই সেই
মেহনতের প্রভু, আনুগত্যে
শাণিত রক্তে ঢল হয়ে যায় তোমার শিরাময় সারা পথে পথে।...
সেই কোটি হাত এক হয়ে
মোছাবে তোমার মুখ তোমার আপন পতাকায়।
সমস্ত শূন্যতায় আজ বিশুদ্ধ বাতাস বয়ে যায়
আকাশ চাঁদোয়া জ্বালে রাহুমুক্ত ঘন নীলিমায়।
অকলুষ বাংলাভূমি হয়ে ওঠো রাতারাতি আদিগন্ত তীর্থভূমি।
(হাসান; ২০০১: ১৫৮)

বাংলার আদি পেশার এইসব মানুষের অকৃত্রিম ভূমিকা কেবল ভাষা আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধকালে সীমায়িত ছিল না, বরং তা প্রসারিত ছিল মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রতিটি গণ-আন্দোলনে। পঁচাত্তরের বিয়োগাত্মক ঘটনার পর দেশ কয়েকপর্বের স্বৈরশাসকের অধীন ছিল। তিনিও স্বস্তিতে ছিলেন না। সংবেদনশীল এ কবি নিজের মনে জমাকৃত যন্ত্রণার শিল্পিত নাম দিলেন *বজ্রে চেরা আঁধার আমার* (১৯৭৬) এবং *আমার ভেতরের বাঘ* (১৯৮৩)। ১৯৭৬ মানেই বাংলাদেশের জন্য নতুন ও

নেতিবাচক পরিস্থিতি। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত। সাধারণ মানুষ আরও বেশি অধিকারবঞ্চিত। কবিও যেন সেখানে শ্রমজীবীদের ন্যায় 'ঘর্মাক্ত কারিগর'। অতি সূক্ষ্ম কৌশলে তিনি কবিতায় এনেছেন কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ :

> কবিও ঘর্মাক্ত কারিগর এক, দুঃখ তার
> রৌদ্রজলে ঢাকা, আঁধারে সমূল গাঁথা।
> শিশুর কান্নার জল মুক্তো হয় শব্দের ঝিনুকে,
> কৃষকের লাঙলের ফলা অন্নপূর্ণা মূর্তি গড়ে
> শ্রমিকের পেশির ঘায়ে বেড়ে যায় সভ্যতার
> মহানন্দা সীমা,
>
> (হাসান; ২০০১: ২২৫-২২৬)

দেশের অর্জন, ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামী পথের নানা ইঙ্গিত, খেদ এবং নানা স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে কবি রচনা করেন "আমি যাই" শীর্ষক কবিতা। এখানেও তিনি কৃষকের প্রসঙ্গ এনেছেন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে। কারণ কৃষক একই সঙ্গে তার কাছে গৌরব ও সংগ্রামের প্রতীক, বঞ্চনা ও প্রতিবাদের প্রতীক। কিন্তু সবই যেন অতীত। সেই সময় যে গর্বের সেই ঐতিহ্যগুলো মানুষরূপী কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত, তাও তিনি বলার চেষ্টা করেছেন প্রতীকী কৌশলে। চলে যাওয়ায় তাড়নায় মানুষ যেমন সব এক নিশ্বাসে বলে শেষ করার চেষ্টা করে, এখানে কবির ভাষা ও শব্দচয়ন ঠিক তেমনই :

> আকাশজোড়া দিগন্তের সুপ্রাচীন অহংকার ছিলো,
> একের পর আর—এমনি করে জন্ম থেকে জন্মের
> বহতা ধারা অটুট রাখা গর্বে
> ডগমগ কৃষকের উল্লাস ছিলো,
> এখানে প্রতিবাদের চিৎকার ছিলো,
> ঝড়ের মুখে আগল দেয়া ঘরের নিশ্চিন্দি ছিলো,...
>
> (হাসান; ২০০১: ২৮৭)

যা গর্বের সবই 'ছিল' হয়ে গেছে। ফলে তাঁর মনে তৈরি হয়েছে কিছু করতে না পারার হাহাকার; 'এই হাহাকার থেকে/ এই অকালের শস্যকণালোভী কতিপয় ইঁদুরের/ বড় বেশি উৎকট লুটোপুটি থেকে' তিনি মুক্তি চেয়েছেন। যখন তাঁর স্বদেশের স্বপ্ন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আশা মুখ থুবড়ে পড়েছে, তখন তিনি বলেছেন, 'চরম প্রহসন থেকে/ আমি যাচ্ছি, আমি যাই।' (হাসান; ২০০১: ২৮৮) কারণ এর আগে তিনি নিজেকে শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিদের সারিতে কল্পনা করে লিখেছেন, 'চোখে নমিত আত্মবিলোপ, মাটিকাটা হাতদুটো ছাড়া/ আমি এখন আর কিছুই নই।' (হাসান; ২০০১: ২৩৬) ১৯৮৩ সালেই কবি পার্থিব মায়া ত্যাগ করেন। তাঁর অপ্রকাশিত এক

কবিতার নাম "চাষা তার ষাঁড়ের প্রতি"। কৃষকের অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকেই কবিতার এমন নামকরণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এ-কবিতার মধ্য দিয়ে কৃষকের আজীবনের ত্যাগ ও সাধনার সঙ্গে একসময় কৃষকের জমিচাষের অপরিহার্য প্রাণী ষাঁড়ের প্রসঙ্গও এনেছেন তিনি কুশলী শিল্পীর মতো :

সারা দিনমান তোমার ভোজের খোঁজে, বাঁকাপিঠ কাটিয়েছি অকাতরে,
আরেকটু টানো ভাই, প্রিয়তম রুজিদাতা।
খাবে যদি খেয়ে নাও, এলিয়ো না চাষের নরম দাঁড়া, খাও খেয়ে নাও!
তোমার গোয়াল দ্যাখো, হাজার মাঠের মেহনতে
এই দুই হাতে সাজিয়েছি কী সুন্দর! আমরা ঘুমাই স্যাঁতসেঁতে ঘরে,
তুমি শুকনো পরম আদরে।

(হাসান; ২০০১: ৩৫৯)

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সংখ্যায় কম হলেও কৃষক-শ্রমিকের প্রতি হাসান হাফিজুর রহমানের দরদ লক্ষণীয়। তাদের সংগ্রামকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করতেন। মানুষ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি কবিতার শব্দে-চিত্রে ও বিষয়বস্তুতে তাদের জীবন ও কথাকে গ্রথিত করেছেন।

বাংলাদেশের কবিতায় আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) এক বিশিষ্ট নাম। পঞ্চাশের দশকের বেশির ভাগ কবি যেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে, উঠতি মধ্যবিত্তের সুবাস গায়ে মেখে, রাজধানীকেন্দ্রিক জীবনের জটিলতাকে মানিয়ে নিয়ে কাব্যচর্চা করে গেছেন, আল মাহমুদ সেখানে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বসবাস করেছেন ভাটি অঞ্চলের মফস্বল শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। দুই বাংলার কবিতা-বিষয়ক বিশিষ্ট সাময়িকী হিসেবে পরিচিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* ও সিকান্‌দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল*-এ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জন্ম-শহরের অধিবাসী থাকা অবস্থায়ই। ষাটের দশকে রাজধানী শহর ঢাকায় আগমন ঘটলেও তাঁর কবিভাষা আগেই নির্ধারিত হয়ে যায়। নগরজীবনের যুগযন্ত্রণাকে বাইরে রেখে সুচিন্তভাবে তিনি গ্রাম ও গ্রামীণ ঐতিহ্য, নদী-নিসর্গ, গ্রামীণ মানুষকে কবিতাশিল্পের উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কারণ গ্রাম ও গ্রামের বাসিন্দারা তাঁর কবিতাদর্শনের অংশ। গ্রামের মানুষ বলতে তিনি পৃথিবীর সকল শেকড়সন্ধানী মানুষ ও সভ্যতা পত্তনের কারিগরদের বোঝাতে চান। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দৃঢ় ও সুস্পষ্ট :

আমি আমার কবিতায়, আধুনিক নগরসভ্যতা তথা সর্বব্যাপী নাগরিক উৎক্ষেপের যুগে ক্ষুয়িষ্ণু, গ্রামীণ জীবন ও ধসে পড়া গ্রামকে উত্থাপন করতে চাইছি বলে অনেক সম্পাদক কটাক্ষ করেছেন। আমি তাদের বহুবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, গ্রাম বলতে আমি যূথবদ্ধ আদিম মানব জীবনকে বুঝিনা বরং

এশিয়া আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকায় যেসব নরনারী ধনতান্ত্রিক নগর সভ্যতার বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছেন তাঁরা আসলে গ্রামেরই লোক। (মাহমুদ; ১৯৭১: ভূমিকা)

আল মাহমুদের বিশেষত্ব এখানেই, গ্রামের নানা অনুষঙ্গ কবিতায় ব্যবহার করলেও গ্রাম্যতা নয়, বরং আধুনিক শিল্পমনস্ক কবি হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি সফলভাবে বিচরণ করেছেন। তবে কবিতায়ই তাঁর অধিক স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা। তিনি বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। আবার নাগরিক জীবনের ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণার মধ্যে বাস করেও কবিতায় প্রত্যাবর্তনের কথা, প্রকৃতির অকৃত্রিম বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যকে ধারণ করেছেন। (রফিকউল্লাহ; ২০০২: ১৩৭) ব্যক্তি আল মাহমুদের মানসিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত পরিবর্তনের ভিন্নতা প্রদর্শনের আগ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা যায়। তবে পঞ্চাশের অন্যদের কবিদের মতো তাঁর তিনি কবিতায় সাম্যবাদী দর্শনের চর্চা করেননি। ফলে কৃষক-শ্রমিকের কল্যাণ কামনা করে কিংবা কৃষক-শ্রমিকের জীবনসংগ্রামের লাঘবে সংগ্রামী শব্দ প্রয়োগে কবিতা রচনায় তিনি নিজেকে প্রবৃত্ত করেননি। বরং সমকালের অন্য কবিগণের মতো তিনিও তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় কৃষক-শ্রমিক এবং তাদের উৎপাদিত ফসলাদি, কৃষি জমি, তাদের সামান্য বঞ্চনাকে বিষয়ের পরিবর্তে কবিতার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো সময় কবিতাকে ঋদ্ধ করতে তিনি অবলীলায় গ্রামীণ অনুষঙ্গ হিসেবে, আবার কখনো কখনো কৃষিশ্রমিকদের শব্দ বা প্রতীকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর* (১৯৬৩)। গ্রন্থ-নামের মধ্যে যুগ থেকে যুগান্তর ধরে প্রবাহমানতার একটা ইঙ্গিত বিদ্যমান। এ-কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতায় শ্রমজীবনের প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে উপমা এবং প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত শ্রমজীবনের অনুষঙ্গ "ড্রেজার বালেশ্বর" কবিতাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এক 'প্রিয়তমা' শব্দের আড়ালে তিনি নদীগর্ভের বালু উত্তোলনে পরিচালিত অধুনা-চিহ্নিত অবৈধ এক যন্ত্রবিশেষের প্রসঙ্গ এনেছেন। এ-কবিতায় শ্রমিকের প্রেম ও শ্রম যেন একাকার হয়ে গেছে :

কাজের উল্লাসে দিন কেটে যায় উদ্দাম পেশীতে
যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি, প্রিয়তমা,
বাতাসে নিজেকে বাঁধি, ঘামে ভিজে, কেঁপে উঠি শীতে
আমাদের শ্রম যেন আনন্দের সরল উপমা।
নিঃশব্দে যন্ত্রণা সয় তিতাসের বুকচেরা পানি

যখন এগোতে থাকে অতিকায় লোহার কাছিম
ময়লা দু'হাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি
ধাতব কোদাল শুধু টানে, ছেঁড়ে, জলের জাজিম।

(মাহমুদ; ২০১৩: ৩১)

আসলে গ্রাম-বাংলার আবহমান 'জীবনধারা আর তার পটভূমিকায় যে প্রকৃতি তার থেকে কবিতার শব্দ, উপমা, রূপক চয়ন করায় আল মাহমুদের কবিতায় এক রসসিক্ত জীবনের স্পন্দন মেলে। সে জীবন পল্লীর সহজ সরল অনাবিল গীতি-কবিতার জীবন নয়, সে কেবল দূর থেকে রঙিন চশমায় দেখা দৃশ্যপট নয়।' (রফিকুল; ১৯৭১: তিরাশি) এ-কাব্যগ্রন্থের "রাস্তা" নামক একটি কবিতাতে কৃষিজীবন এবং কৃষকের প্রসঙ্গ এসেছে। যেন কোনো অতিথিকে কোনো এক বসতভিটার বর্ণনা দিয়েছেন কবি। সেই পথের বর্ণনাকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন কৃষি ও শ্রমজীবনের টানাপোড়েনের কথা :

কাউতলী রেলব্রিজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ি।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাটরেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।
দেখবেন, লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্তনীল শাড়ির নিশেন।'

(মাহমুদ; ২০১৩: ৩৪-৩৫)

কালের কলস (১৯৬৬) আল মাহমুদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থের চেয়ে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কবিভাষা আরও স্পষ্ট, আরও সুদৃঢ়। নিসর্গ, গ্রামীণ মানুষ, আকর্ষণীয় গ্রামীণ চিত্রকল্প ও রোমান্টিক কবি-কল্পনায় সমৃদ্ধ এ-গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতা। কিন্তু এ-কাব্যে মাত্র একটি কবিতায় এসেছে কৃষক বা চাষির প্রসঙ্গ। প্রকৃতি থেকে যেমন মানুষ স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তেমনি যারা ভূমিসন্তান কিংবা যারা জমিনকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কাছ থেকেও যেন কবি প্রতিনিয়ত জীবনাভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রকৃতি ও কৃষিজীবী মানুষ অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে "নির্ভুল নামে" কবিতায় :

বাতাসে কিসের তৃষ্ণা, শস্যের ঘ্রাণ টেনে এমনও পেরেছি—
কখন ফসল উঠবে দিনক্ষণ সঠিক জানাতে।

একটি চাষীর মত এ সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত শিখেছি।

(মাহমুদ; ২০১৩: ৭৮)

আল মাহমুদের কবিতা গ্রামীণ নিসর্গ ও ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ। এর ব্যত্যয় ঘটেনি বহুল পাঠকপ্রিয় *সোনালি কাবিন* (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রেও। এ-গ্রন্থের মাত্র চারটি কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এসেছে। অথচ তাঁর কাব্যপ্রবণতায় গ্রাম ছিল অপরিহার্য। কারণ তিনি শেকড়ে 'ফিরে-যাওয়ার মধ্যে স্মৃতির অনাবিল উন্মোচনের মধ্যে, কবির সমস্ত প্রেরণা ও শান্তির উৎস নিহিত। যে-কৈশোরের স্মৃতি-বেদনা কবির পরিণত উপলব্ধির অনুষঙ্গ, তাঁর শৈল্পিক অগ্রযাত্রার সাথে তা একটা অনিবার্য কার্যকারণ হয়ে থাকে। এভাবেই কবির চেতনায় প্রত্যাবর্তনের সেতুবন্ধন রচনা করে তাঁর স্মৃতি-উৎস এবং বিশ্বাস।' (রফিকউল্লাহ; ২০০২: ১৪০) তাই কৃষি বা কৃষক, বিশেষ করে কিষানি অবলীলায় তার কবিতার শব্দ-সংকেতকে সমৃদ্ধ করেছে। মাটি-নিসর্গ-নারী অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কোনো কোনো কবিতায়। তবে দীর্ঘ সময়ের মফস্বলবাসী কবি হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন 'সংগ্রামী জীবনের অধিকার' নিয়ে যতটা মুখর হওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর, ততটা হননি। তাই অনেক সময় কৃষক বা কিষানির শ্রমজীবন তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম ও কাব্যিকতার অনুষঙ্গ হয়েছে। যেমন "প্রকৃতি" কবিতায় তিনি বলেছেন : 'খেতের আড়াল থেকে কালো/ মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে/ কী ভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম।' (মাহমুদ; ২০১৩: ৯৫) এভাবেই তিনি ক্রমশ আমাদের গ্রামীণ জীবন এবং সর্বজনীন অভিজ্ঞতার আধুনিক রূপকার হয়ে উঠেছেন। গ্রাম, গ্রামীণ জীবন আল মাহমুদের মুখ্য উপজীব্য; কিন্তু তাই বলে তিনি 'লোক-কবি' নন। বরং 'গ্রামের জীবন আর ভাষা যা অত্যন্ত জীবন্ত, তার থেকে আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় উপাদান সংগ্রহ করেছেন আর তা তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র আল মাহমুদই আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনধারা অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ব্যবহার করতে পেরেছেন।' (রফিকুল; ১৯৭১: বিরাশি) "প্রকৃতি" কবিতার আরও কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ; যেখানে রয়েছে শস্য ও শস্যের কারিগরদের প্রসঙ্গ :

কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার
বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তা সর্ব উর্বর আধার।

(মাহমুদ; ২০১৩: ৮৩)

একই প্রবণতা কাজ করেছে "পালক ভাঙার প্রতিবাদে" কবিতায়। উপমার অন্তরালে বিকশিত হয়েছে শ্রমজীবন। পরোক্ষ শিল্পিত সংকেতে যেমন কৃষককে শিল্পী বলেছেন, তেমনি অসংখ্য 'নাওয়ের বাদামের' প্রসঙ্গও এনেছেন অভিজ্ঞতা-সঞ্চারীর মতো করে। এটা কোনো আত্তীকরণ নয়, বরং নিজেকে তিনি কৃষিজীবীদের আপনজন হিসেবেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। সংগতকারণে খড়ের গাদাকে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন "খড়ের গম্বুজ" :

শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে কড়া তামাক সাজালো।
একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
যে যেনো ডাকলো তাকে; সস্নেহে বললো, বসে যাও,
লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে।
আমাদেরই লোক তুমি।

(মাহমুদ; ২০১৩: ৯৫)

তবে এ-কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পাঠকপ্রিয় সনেটগুলোর মধ্যে একটি সনেটে সত্যিকার অর্থে শ্রমিক, শ্রমজীবনের সংগ্রাম ও বঞ্চনাকে কবি উপজীব্য করেছেন। সাধারণত তাঁর কবিতা 'মূলত সুরেলা, স্নিগ্ধ। বাংলাদেশের লোকজ-জীবনের অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে আসে শব্দে, উপমায়, প্রতীকে, চিত্রকল্পে।' (হেনা; ২০০১: ৪০৭) কিন্তু সাম্যবাদী দর্শনের কবিকর্মী না হলেও তাঁর মনের গহিনে যে সামাজিক সাম্য পরম কাঙ্ক্ষিত ছিল তা এই একটি কবিতায় কেবল স্পষ্ট হয়েছে। সোনালি কাবিন কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক সনেটে তিনি সাম্যের কথা বলেছেন তাঁর মধ্যে কেবল একটি ভূখণ্ডকেন্দ্রিক বা একটি কেবল নিজস্ব সমাজের সাম্যের কথা তিনি বলেননি। তাঁর এ সাম্যের দর্শনের মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক ব্যাপকতা। তাই সরাসরি তিনি বলতে পেরেছেন :

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়াছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

(মাহমুদ; ২০১৩: ১০৪)

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত *মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো* কাব্যগ্রন্থ থেকে আল মাহমুদের আদর্শ ও জীবনাচরণে বড় পরিবর্তন ঘটে। তাঁর বিশ্বাস ও মূল্যবোধের এই পরিবর্তনে প্রভাবিত হয় তাঁর

সামগ্রিক সৃজনশীলতা। একে কোনো কোনো সমালোচক আল মাহমুদের কবিতাযাত্রার দ্বিতীয় পর্বও বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন, 'আল মাহমুদের দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মতাত্ত্বিক মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গভীরতর অর্থে এর শিল্পতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রত্যাবর্তন না বলে উত্তরণ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায় একে।' (রফিকউল্লাহ; ২০০১: ১৪২) এই পরিবর্তন বা প্রত্যাবর্তন ঘটলে তাঁর শিল্পিত কাব্যচর্চা আমরণ তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। এ-গ্রন্থের দুটি কবিতায় পাওয়া যায় কৃষকের অনুষঙ্গ। এর মধ্যে একটি "ভারতবর্ষ" :

দূরে গোপদের গ্রাম। প্রজ্বলিত উনুনে এখন
চাষীদের অন্ন উথলায়। ঘরে ঘরে দুহিত গোধনে...
এই গ্রামে আছে এক গোপালক, সদাহাস্য চাষী
ধনিয় কিষাণ বলে ডাকে লোকে, গোপী তার নারী
বহুপুত্রে ফলবতী মনোরোমা, পরিতৃপ্ত মাতা।
গাভী ও বাছুর নিয়ে সুখী পুত্রগণ, জানে শুধু

(মাহমুদ; ২০১৩: ২০১-২০২)

এ-পর্বে আল মাহমুদ তাঁর নিজস্বতা বদলে ফেলেছেন। এই বদলের ফলে 'কবির সবুজ সতেজ মনোভূমিতে বিশ্বাসের চর জাগতে শুরু করেছে। এ-বিশ্বাস ক্ষতবিক্ষত চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষিত আবিষ্কার নয়, বোধের সমগ্রতায় উজ্জ্বল।' হয়তো তাই আগে ক্ষণে ক্ষণে তিনি শ্রমজীবী বা কৃষকদের অনুষঙ্গ কবিতায় গাঁথতে পারলেও ক্রমশ এই প্রবণতা হ্রাস পেতে পেতে বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে আল মাহমুদের কবিতা কোনো বিশেষ শ্রেণিগোষ্ঠী নয়, কোনো বিশেষ পেশাজীবী শ্রেণি নয়, বরং সর্বকালের মানবতার ঐকতান তৈরি হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো পূর্বপুরুষকে সম্ভাষণ জানাতে গেলে অন্ধকার নেমে আসে, একটি দুরূহ আভাসে লোকান্তরিত জীবন কাঁপতে থাকে। তাঁর চেতনা সবুজ অরণ্যের চন্দনের বৃক্ষশাখায় বসে থাকা একটি শাদা পাখির মতো যা সুগন্ধবহ বন্য পরিসরকে ভাস্বর করে তোলে। (আহসান; ১৯৯৩: ১২৬)

বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় নাম দিলওয়ার (১৯৩৭-২০১৩)। মননে ও চেতনায় আধুনিক এই কবি দেশ-বিদেশের শিল্প-সাহিত্যের নিবিড় পাঠক ছিলেন। কাব্যচর্চার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাময়িক রাজধানীবাস বাদ দিয়ে তিনি ছিলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বাসিন্দা। ফলে নগরের ব্যস্ততা বা যন্ত্রণা থেকে দূরে থেকে থেকেও সাধারণ মানুষই হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিতাশিল্প চর্চার প্রধান আধেয়। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি প্রগতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং সাম্যবাদী দর্শনে প্রভাবিত হন। শারীরিক সমস্যা ও প্রেয়সী প্রথম-স্ত্রী বিয়োগের ঘটনা তাঁর কবিজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

পরবর্তী সময়ে নিজগৃহের মানসিক প্রশান্তিপ্রাপ্তিও তাঁকে নগরমুখী হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট :

> আমি কেন রাজধানীতে থাকতে পারিনি, তার পেছনে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রথমেই আসে স্বাস্থ্যগত এবং বৈবাহিক জীবনকথা। ১৯৫৪ সালে আমি ছিলাম ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দেয়ার শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ আমার শরীর ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এটি এমন রহস্যময় রোগ...যার রেশ আজও থামেনি। পরীক্ষা পাশের পর পাঁচ বছর এই রোগে নাকানি-চুবানি খেতে খেতে সামনে চলতে থাকি। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে আমাকে মরণাপন্ন অবস্থায় সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।...১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ঢাকাতে অবস্থান ছিল খুবই আশাপ্রদ। এই অবস্থান দীর্ঘ হতে পারত যদি না দুনিয়া কাঁপানো উনসত্তরের গণ-আন্দোলন দেখা দিত। এই আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে আমাদের ফিরে আসতে হয় সিলেটে। আবার ১৯৭৫-এর শুরুতে আমরা স্থির করেছিলাম পুত্রকন্যা নিয়ে ঢাকায় চলে যাব। আনিসা চাকরি করবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আর আমি পত্রপত্রিকায়। কিন্তু হল না (তাঁর) মৃত্যুর দূরদর্শী থাবায় উড়ে গেল সেই অন্তরঙ্গ স্বাদ। (সূত্র: আকরম; ২০১০: ১৭৮-১৭৯)

তাঁর স্বপ্ন ছিল 'মানুষের পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা, প্রগতিশীলতা ও গণমানুষের মুক্তি। স্বদেশ-পৃথিবীর নির্যাতিত-নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও দায় তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টার সূচনা থেকেই লক্ষ করা যায়।' (দিলওয়ার; ২০১১: ৮) গণমানুষের মুক্তি ও শ্রমজীবীদের মুক্তির ঐকান্তিক ভাবনা দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন নিজের কবিতাকে। মানুষ তাঁকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে গণমানুষের কবি হিসেবে। তাঁর কাব্যচর্চা বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনকে নতুন স্বাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। গণমানুষ ও মানবিকতাই কবি দিলওয়ারের কাব্যদর্শনের মূলমন্ত্র। শুধু কবিতা নয়, তাঁর দৈনন্দিন আলাপচারিতা, চিন্তা-চেতনা, সৃষ্টিশীলতা, আক্ষেপ, মানুষের মুক্তি, প্রগতিচিন্তা প্রভৃতি মিলেমিশে প্রকৃত মানবসন্তান হয়ে ওঠার অবিসংবাদিত সাধনাই ছিল তাঁর জীবন ও সাহিত্যযাপনের চালিকা শক্তি। শ্রমজীবীদের জন্য কল্যাণকর ও শুভবোধসম্পন্ন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

পঞ্চাশের দশকে প্রথিতযশা কবিদের মধ্যে কাব্যচর্চায় মার্ক্সীয় সাম্যবাদী দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এ ক্ষেত্রে দু-একজনের নাম উল্লেখযোগ্য। দিলওয়ার তাঁদের একজন। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই শ্রেণিচেতনার পরিচয় দিয়ে আসছেন তাঁর

সৃষ্টি ও জীবনাচরণে। (সূত্র: নীতীশ; ১৯৮৯: ১৪৪) পিতা-মাতার দেওয়া নাম দিলওয়ার খান নাম বর্জন তিনি হয়ে যান শুধু দিলওয়ার।

দিলওয়ার মার্ক্সবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তবে, দলীয় রাজনীতির সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় নিজেকে আবদ্ধ করেননি কখনো। অন্যদের মতো তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেবল কবিতাকে সমৃদ্ধ করতে কিংবা কবিতার প্রয়োজনে কৃষক বা শ্রমিকের প্রসঙ্গ আনেননি। বরং তাঁর কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এসেছে তাদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ থেকে; স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর যতগুলো কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে তাদের লক্ষ্য করেই তিনি কবিতা নির্মাণ করেছেন। সংগতকারণে তাঁর সেসব কবিতা হয়ে উঠেছে শ্রমজীবীদের অধিকার আদায়ের শিল্পাশ্রয়ী মাধ্যম। তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সিলেট থেকে। তাই বলে নিজের চিন্তা ও কাব্যকৌশলকে তিনি মফস্বলের সংকীর্ণ ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রাখেননি। তাঁর কাব্যঘ্রাণ ক্রমশ পৌঁছে গেছে সমকালীন আধুনিক চিন্তা ও বৈশ্বিক শিল্পের পরিমণ্ডলে। সীমিত ভূগোলে, সীমাবদ্ধ জীবনদৃষ্টিতে নয়, বরং বিশ্ববোধের উদারতা দিলওয়ারকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। কেননা, 'তাঁর ভূগোল ছিল দেশ ও বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত, জীবনদৃষ্টি ছিল উদার-মানবিক এবং তাঁর আধুনিকতা ছিল সময়ের বিচার-বিক্ষোভ-ক্লান্তিকে বুঝতে পারার—তাকে প্রকাশ করার এক অদ্ভুত শক্তিতে পূর্ণ। সময়ের নাড়িতে একটা আঙুল রেখে চলতেন তিনি: সে জন্য সময় ভ্রমণ তাঁকে বিপন্ন করত না।' (মনজুরুল; ২০১৩: ৩) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে—নাম *জিজ্ঞাসা*। বলা যায়, পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে তাঁর কাব্যগ্রন্থই প্রথম প্রকাশিত হয়। এ-কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা "এবার এলো"। কবিতাটির প্রতি শব্দে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই সময়ের নতুন দেশ এবং নতুন স্বপ্নের আশা। যারা শ্রমজীবী, যারা বঞ্চিত শ্রেণি, এত দিন যারা মৌলিক অধিকার সুসংহত করতে পারেনি, কবির প্রত্যাশা জন্মেছিল, হয়তো সেই দিনের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তাই কবিতায় তিনি বলেছেন: 'এবার এলো শক্তিহীনের/ শক্তি লাভের দিন/ নবীন ভুবন সৃষ্টি হবে/ ঐক্যে অমলিন।' (দিলওয়ার; ২০১১: ১৮) এখানে 'শক্তিহীন' বলতে যে পরাধীন মানুষের অবস্থাকে বুঝিয়েছেন কিংবা 'স্বাধীনতা' যাদের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই অর্থনৈতিক মুক্তিপ্রত্যাশী খেটে খাওয়া মানুষদের কথা বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দিলওয়ারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ঐকতান* (১৯৬৪)। এ-গ্রন্থের "যতদিন বেঁচে আছ" কবিতায় তাঁকে বেশ প্রত্যয়ী মনে হয়েছে :

> হ্যাঁ, তুমি আসতে পারো এখানেও এই খোলা মাঠে
> তরুণ পায়ে স্বাস্থ্যবতী কৃষাণীর মতো,
> এবং হাসতে পারো সে মুহূর্তে লজ্জায় বিব্রত

তোমার শহুরে মনঃ আহত যে শক্ত ইটে-কাঠে।

(দিলওয়ার; ২০১১: ৪৬)

তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *উদ্ভিন্ন উল্লাস* (১৯৬৯)। এ-গ্রন্থের উৎসর্গপত্রেই তিনি শ্রমজীবীদের নিয়ে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করেছেন। দৃষ্টান্ত :

যাদের চোখের মণি জ্বলে ওঠে রাত পোহাবার আগে
পৌঁছিয়ে দিতে পৃথিবীর কথা সূর্যের পুরোভাগে
শ্রমজীবী সেই মহামানবের রক্তগোলীপী হাতে
আমার কবিতা ছড়িয়ে দিলেম নিদ্রবিহীন রাতে।

(দিলওয়ার; *উদ্ভিন্ন উল্লাস*: উৎসর্গপত্র)

দিলওয়ার তাঁর সৃষ্টিতে গণমানুষকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গণমানুষের পেশাকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং অবলীলায় কবিতায় তা ব্যবহার করেছেন। আদিম কাল থেকে সমাজ বিবর্তনে শ্রমিকদের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। বিশ্বের নানা অগ্রগামিতার পরও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামমুখর অস্তিত্ব টিকে আছে। এরাই কবির কবিতা-রচনার মুখ্য অনুপ্রেরণা। 'গণমানুষের কবি' তাঁর প্রতিষ্ঠা কতটা প্রবাদপ্রতিম ছিল, তা নিচের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হবে :

> বৃহত্তর সিলেট জেলায় এমন অসংখ্য মানুষ পাওয়া যাবে যারা কবি রবীন্দ্রনাথ কিংবা কবি নজরুলের নামের সঙ্গে হয়ত পরিচিত নন, কিন্তু একজন কবি দিলওয়ার-এর নাম শুনেছেন!...মানুষকে, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষকে, শিশু-নারীকে ভালোবাসার, সম্মানিত করার এক সহজাত প্রবণতার অধিকারী এই কবি। মানবীয় দায়বদ্ধতা আর 'আভূমি আনত' নিবেদনস্পৃহা তাঁর কবিসত্তার কেন্দ্রীয় শক্তি। মিথ-পুরাণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা ও নিসর্গ এবং রাজনীতি ও সম্প্রীতিচেতনা একাকার হয়ে আছে তাঁর কবিতার শব্দে-ধ্বনিতে, উপমায় ও প্রতিমায়। যে শোণিতে সঞ্চালিত তাঁর কবিতা, তার পবিত্রতম নাম 'মানুষ'। (সূত্র: আকরম; ২০১০: ১৭২)

আসলে মাটি ও মানুষই তাঁর শিল্পচর্চার প্রকৃত অবলম্বন। এই কবির আধুনিকতা শহুরে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা, জনবিচ্ছিন্নতা অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটকে বিবেচনায় আনেনি। সামনে এনেছে সভ্যতার সংকটকে—মানুষের লড়াই ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সমুন্নত করতে। কবিতার নাম যখন হয় "আদিম স্মরণঃ আদিম প্রেরণা", তখন সেই প্রেরণা হয় মানবিকতার পক্ষে, বংশপরম্পরায় আদিম পেশায় নিয়োজিত মানুষের পক্ষে। তাঁর প্রত্যাশা, এমন অবস্থা থাকবে না, এই অসহনীয় অবস্থার উত্তরণ ঘটবেই :

মানবে না তারা নিসর্গ-সন্ত্রাস,
অদম্য চোখ বিষুবরেখার দিকে,
তাদের কাম্য: বিজয়ীর ইতিহাস
তারা থাকবেই পৃথিবীর বুকে টিকে।

(দিলওয়ার; ২০১১: ৫২)

স্থায়ীভাবে মফস্বলবাসী হলেও জগৎকে দেখার চোখ, কবিতায় প্রতিফলিত মানবিকতা, সংবেদনশীলতা তাঁর মননকে ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। বরং তাঁর কবিতা প্রতিনিয়ত টপকে গেছে নানা প্রতিবন্ধকতার দেয়াল। সভ্যতার বিকাশধারায় যারা লড়াই করেছে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, তারা তো শ্রমজীবীই। তারাই কবিকে 'বিলায় দানবমারণ গীতি। কবি চান, 'মরুক হতাশা তমসায় মাথা কুটে।' সেই অনুপ্রেরণাতেই বোধ হয় তিনি লেখেন "অমোঘ সত্য"। এ-কবিতায় সাম্যবাদী দর্শনের প্রবাদপুরুষ লেনিনের নামও ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন :

লেনিনের ডাক : ধনের পাহাড়ে
শ্রমিকের হাড় জমা,
ঘাতকেরি হাতে দয়ালু বিধাতা
রয়েছে চিরকাল,
স্বর্গের নামে হন্তারা তাই
ছড়িয়ে চক্রজাল
পৃথিবীর চির জীবন প্রবাহ :
শ্রমকে করেনি ক্ষমা।

(দিলওয়ার; ২০১১: ৫৭)

দিলওয়ার বালক বয়সেই যে গণমুখী কবিতার সঙ্গে গেঁথেছিলেন শব্দশিল্পের মালা তা কখনো ছিঁড়ে যায়নি। এর মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ-আহ্লাদ, প্রেম-বিরহের কবিতা যে একেবারে কম রচনা করেছেন, তা নয়। কিন্তু যখনই শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এসেছে, তখন তা এই জনাঞ্চলের মানুষের অধিকার ও সংগ্রামমুখরতাকে ভিত্তি করেই শিল্পিত করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণ আন্দোলন, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে দিলওয়ার গণমানুষের অধিকারের পক্ষে কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর শোণিতের মতো লেখনীও সর্বদা সরব থেকেছে গণমানুষের পক্ষে। তাই ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে তিনি লিখেছেন : 'ঠেলাগাড়ির লোকগুলো নাঙা শরীর/ আমার চোখের আয়নায় ক্রমশ: দীঘল হতে থাকে,/ যেন ঘূণিঝড়ের দুর্বার ঔরসে সৃষ্ট'। (দিলওয়ার; ২০১১: ৫৭) দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ঐকতান* প্রকাশের পর

তাঁর সম্পর্কে মার্ক্সবাদী এক চিন্তক লিখেছিলেন: 'তাঁর লেখাতে ঘোষণার চেয়ে সান্ত্বনার দিকে ঝোঁক বেশি। তাঁর লেখায় একটা ঘরোয়া আলাপের ভাব আছে।...জানালা বাইরের পৃথিবীর জন্য খোলা। জানালা অনেক; কিন্তু বাসাটি ছোট। মাটির ঘর।' (মফিদুল; ২০১৩: ৭) এই মাটির ঘরের সঙ্গে, যাদের সম্পর্ক, মাটির সঙ্গে যাদের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ, মাটিকে কেন্দ্র করেই যাদের স্বাদ-স্বপ্ন, মাটির গহীনেই যত সাধনা আর বিনীত প্রার্থনা, কর্মক্লান্ত রাত শেষেও সেই কৃষক-শ্রমিকের ভোর একই রকম—চিরন্তন, গতানুগতিক। সেই আক্ষেপ থেকে ১৯১৭ সালের 'অক্টোবর বিপ্লব স্মরণ' করে রচনা করেছেন "ভোর : চিরন্তন"।

একদা কৃষাণ আমি: হতভাগ্য শ্রমিক মজুর
একক ভোগের দুর্গে দুর্গতির বুকফাটা সুর
শ্বেত কণিকার মতো জারের ঔসরজাত বিষে
সেদিন নীরক্ত আমি অলৌকিক আশার কার্ণিশে।...
বার্তা এলো অতঃপর এই বিশ্ব রিক্তজনতার
একান্ত শ্রমেরি মূল্যে সমগ্র সৃষ্টির অধিকার,
ঝাঁকেঝাঁকে জন্ম নিল অন্ধকারে রৌদ্রের সঙিন
(দিলওয়ার; ২০১১: ৬৯)

সময়ের অগ্নিস্বভাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিলওয়ারের কবিতাও এগিয়ে গিয়েছে। সংগতকারণে স্বাধিকারের দাবিতে সংঘটিত উত্তাল জন-আন্দোলনের আবেদন তাঁর কবিতায় খুব সহজেই ভাস্বর হয়ে ওঠে। কবি দিলওয়ারের চিন্তার জগৎ বিস্তৃত। তিনি শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবীদের নিয়ে কবিতাকে শিল্পিত করেছেন; আঞ্চলিক ভূখণ্ড নয়, তাঁর তাই অন্বিষ্ট অঞ্চল-অতিরেক আন্তর্জাতিকতা। মূলত সাধারণ মানুষের মুক্তির কথাই তিনি উচ্চারণ করে গেছেন সর্বোতভাবে। তাই যেকোনো অঞ্চলবিশেষে দৈহিক অবস্থান সত্ত্বেও তিনি মানুষের সংকটকে তিনি বৈশ্বিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। ফলে সংকটের তাৎপর্য বেড়ে তা হয়েছে বিশ্বজনীন। কারণ সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবীদের সংকট যেমন অভিন্ন, তেমনি যত গণ আন্দোলন হয়েছে, তাতে শ্রমজীবী বা সাধারণ ও বঞ্চিত মানুষের সহাবস্থান ব্যতীত তা কখনো ফলপ্রসূ হয়নি। নিজেকে তাদেরই একজন মনে করে রচনা করেছেন অনবদ্য সব পঙ্‌ক্তিমালা। যেমন :

তাদেরি দুয়ারে আমি, সংযত শিক্ষার্থী-অভিলাষে
এখন রয়েছি খাড়া, নতদৃষ্টি মৃত্তিকার ঘাসে।
শ্রমিকের হাতুড়ির, কৃষাণের লাঙলের ফলা,
কেরানির লেখনির, মজুরের ক্লান্ত পথচলা,

কামারের কুমারের, ঘর্মসিক্ত শিল্প ও কবির
নিখাদ সৃজনী তীর্থে আমি পুত্র: জ্ঞানভিখারীর।

(দিলওয়ার; ২০১১: ১৪৭)

মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাঙালির আন্দোলন-সংকট-অগ্রযাত্রা প্রতিটি ক্ষেত্রে কবি দিলওয়ার ছিলেন গণমানুষের প্রতিনিধি। যেহেতু উপর্যুক্ত কবিতাটি স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল সময়ে (১৯৬৭) রচিত, তাই এতে ব্যক্ত হয়েছে আশাবাদ। তিনি কবিতাটির উপান্তে বলেছেন, 'যখন সমৃদ্ধ হবে এ জ্ঞানের পথ পরিক্রমা/ আমাকে নেবেই টেনে আগামীর বিশ্বমনোরমা।' (দিলওয়ার; ২০১১: ১৪৭) শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে জাতির ক্রান্তিলগ্ন পার হওয়ার ক্ষেত্রে কবির বাসনা বাস্তবায়িত হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শ্রমজীবীদের সংগ্রামী জীবনের অধিকার ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেনি। তবু পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য কবির তুলনায় নিজেকে অনেক বেশি দায়বদ্ধ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। সেই দায়বদ্ধতা কেবল একটি জাতি, একটি ভূখণ্ড, কিংবা একটি অঞ্চলবিশেষের সীমারেখার মধ্যে বসবাস করা শ্রমজীবীদের জন্য নয়। হয়তো সে-কারণেই ইতালির নবজাগরণের অন্যতম কৃতী পুরুষ যুগস্রষ্টা শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর (১৪৭৫-১৫৬৪) নামের সঙ্গে কৃষকের নাম জুড়ে দিয়ে রচনা করেছেন এক অনন্য সৃষ্টি "মাইকেল এঞ্জেলো : কৃষাণ বাংলা"। বাংলার কৃষকের প্রতিমূর্তি কতটা পবিত্র ও চিরকালীন, তারই ইঙ্গিত রয়েছে কবিতাটিতে। কৃষকের কর্মচাঞ্চল্যের প্রতিটি চিত্রকে তিনি শিল্পকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন :

পিপাসায় রুক্ষরিক্ত ধানখেতে অবিরাম কোদালে কৌলিন
কৃষাণের প্রত্যাশার চলোর্মিতে ভেসে ভেসে...
কৃষাণেরা হয়ে ওঠে যেন-বা স্থপতি মাইকেল এঞ্জেলো,
তখনো লক্ষিত কী-না আলপথে পরাক্রান্ত সুখের মিছিল
মৌমাছি গুঞ্জরণে কৃষাণীরা গৃহকুঞ্জে মধু সঞ্চারিণী,
ললাটের যূপকাষ্ঠে রুধিরে শায়িত যত পোপ-জুলিয়াস,
লম্পট জিউস দীর্ণ ছদ্মবেশী রাজহাঁসে লাঙলের ফালে
মানবীর গর্ভজাত দুলালি হেলেন ক্রমে কৃষাণা সখিনা,...
ভালোবাসা সমাকীর্ণ জীবনের দেবালয়ে—স্বর্গ বাংলাদেশ,
গণ বাংলাদেশ।

(দিলওয়ার; ২০১১: ১৫৫)

গণমানুষ থেকে গণবাংলাদেশ, গণদেবতা থেকে স্বর্গ-বাংলাদেশ—সবই দিলওয়ারকে নিজের মতো করে উদ্ভাসিত করেছে বাংলাদেশের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ঐকতান" কবিতায় কৃষককে কবির সঙ্গে এবং তার উৎপাদিত ফসলকে কবিতা হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।' দিলওয়ার বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর ভাস্কর্য হিসেবে দেখেছেন সৃষ্টিশীল কৃষককে। হেলেনকে দেখেছেন একজন 'কৃষাণা সখিনা' হিসেবে। কৃষককে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েই দিলওয়ার তাঁর কাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। সাধারণ আর বঞ্চিত মানুষকে তিনি অধিকার সচেতন হিসেবে এবং তাদের সংগঠিত স্বরূপকে কামনা করেছেন তিনি। কারণ যত আন্দোলন হয়েছে, তাতে মানুষের সম্পৃক্ততা ব্যতীত সফল হয়নি। এই গণামানুষই আসল বিচারক যদি হয়, তবেই মুঠোবন্দি হবে কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। যেমন ভাষা আন্দোলনের শুরুটা উঠতি মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে হলেও তা ফলপ্রসূ হয় গণমানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশগ্রহণের কারণেই। তাদের ঐক্যবদ্ধ স্বরূপের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। যে কারণে তাদের নিয়ে "একুশ ১৯৭৭" কবিতায় তিনি সরোষে বলতে পেরেছেন :

> ভদ্রমহোদয়গণ, ওরা সেই আটপৌরে সব গণামানুষ:
> আদম শুমারি কিংবা ভোটার তালিকার হীরামানিক,
> ওরা এখন আর বিচারপ্রার্থী নয়, বিচারক,
> যেমন করে একদিন পূর্বপুরুষের শোষণ কবলিত সাম্রাজ্যে
> অবিভাজ্য গণবিপ্লবের দুর্নিবার আকর্ষণে
> বিচারকের নামভূমিকায় সুকীর্তিত গোলাম স্পার্টাকাস!
> ভদ্রমহোদয়গণ, অতন্দ্র শ্রমিকসূর্যের বাংলাদেশ
> একুশের শেষ পরোয়ানা হাতে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান।
> (দিলওয়ার; ২০১১: ১৬৫)

গণমানুষকে কতটা আপন হিসেবে গ্রহণ করলে, তাদের প্রতি কতটা পক্ষপাতিত্ব থাকলে তাদের বিচারকের আসনে বসানোর মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেন শিল্পিত চরণে, তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কবির উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিমালা। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বন্ধুরতা, তা উপড়ে ফেলতে তিনি সবকিছু শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণে দিতেও প্রস্তুত। শ্রমিকের "মিলিতকণ্ঠ" গণমানুষের মুক্তি নেই। কবির ভরসা নেই আর কারও ওপর। শ্রমিক-সংঘ, শ্রমিককণ্ঠই সমাজের সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। ফলে কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এক অমোঘ আহ্বান :

> অতএব শ্রমিকের যুক্তফ্রন্টে একমত হও
> যেহেতু তুমিও একজন শ্রমিক।...

যতদিন দুটি শ্রেণীর রয়েছে অস্তিত্ব,
সর্বহারা অবশ্যই একমত হবে:
বন্দি শ্রমিকের শৃঙ্খল মোচনের ভার
একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর।

(দিলওয়ার; ২০১১: ১৭৪)

বঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সংঘবদ্ধ করতে, প্রাপ্য অধিকার আদায়ে চিরদিন অনুপ্রেরণা জোগাবে দিলওয়ারের কবিতা। তিনি বাল্যকালে কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের অসীম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সামন্তপ্রভুদের দৌরাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; মনে ধারণ করা সেই অবর্ণনীয় চিত্র, মেনে না নেওয়ার মানসিকতা থেকেই নিজের প্রতিভাকে গণমানুষের পক্ষে উদ্ভাসিত করতে পেরেছিলেন। ফলে কেবল কবিতায় নয়, গণমানুষের জন্য গান লিখেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবি। সিলেট বেতারের যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর লেখা গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গান মুক্তিকামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই সময়ে লেখা 'আয়রে চাষী মজুর কুলি মেথর কুমার কামার/ বাংলা ভাষা ডাক দিয়েছে বাংলা তোমার আমার' বহুশ্রুত একটি গান। (শাহীন; ২০১৭: ১২) দিলওয়ারের সব কবিতাই গণমানুষের নয়। তাঁর কবিতা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে সমৃদ্ধ। তবে শ্রমজীবীদের নিয়ে রচিত কবিতায় যে আন্তরিকতা প্রস্ফুটিত, তা অনন্য। যে-কারণে পিরামিড বিশ্ব সভ্যতার অনির্বচনীয় উপাদান হলেও তা নির্মাণে যে শ্রমিকদের ক্লান্তিহীন শ্রম ব্যয় হয়েছে, তা তিনি ভুলতে পারেন না। বরং তিনি 'সহসা শুনতে' পান 'লক্ষ শ্রমিকের আর্তনাদ।' এভাবে তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন শ্রমিকদের কল্যাণ, চেয়েছেন তাঁদের সংগ্রামী জীবনের প্রাপ্য অধিকার। তাঁর স্বপ্ন ছিল, একদিন বিশ্বব্যাপী বিরাজমান সকল বৈষম্যের অবসানে ঘটবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী শ্রমিক নিগ্রহ, আরও বেড়েছে বই কমেনি। তবে তাঁর কবিতাশিল্প যুগ যুগ ধরে উজ্জীবিত করবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায়।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর পেশা ছিল অধ্যাপনা। তবে একদিকে যেমন তিনি নিয়মিত কবিতা লিখেছেন, তেমনি বাংলাদেশের গবেষণা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও অবদান রেখে গেছেন। তিনি নিজস্ব ধারার কবিতা রচনা, গান রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন প্রচুর। ষাটের দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সমৃদ্ধ ও শ্রোতাপ্রিয় অনেক গান তিনি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া দেশাত্মবোধক গান রচনাতেও ছিল তাঁর পারঙ্গমতা। দেশাত্মবোধক ও চলচ্চিত্রের শ্রোতাপ্রিয় বেশকিছু গান এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। দেশপ্রেম, নিসর্গপ্রীতি, মানবপ্রেম তাঁর কবিতায় সব সময় প্রাধান্য পেয়েছে। (সূত্র: bn.banglapedia.org) বাংলাদেশের মানুষ, নাগরিক জীবনের জটিলতা তাঁর কবিতায় অন্যতম

বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। এ ছাড়া বাংলার শ্যামল মাটির প্রতি আলাদা টান লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *দুর্লভ দিন* (১৯৬১)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ; রয়েছে অনূদিত কবিতা।

বাংলাদেশের মাটি, সবুজ শ্যামলিমা, সোনালি শস্যের ঐতিহ্য, মানুষের একাকিত্ব, প্রেম, নগর-যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত প্রশান্তি ও অতৃপ্তি, 'ফসলী সবুজাভা', সমুদ্র, নিসর্গ প্রভৃতি উপাদান তাঁর কবিতাকে অলংকৃত করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে নাগরিক কবি হিসেবেই তিনি নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। মধ্যবিত্তের জীবন, তাদের রোমান্টিতা, স্বপ্ন বা ভাবনার মধ্যেই নিজের কবিতাসত্তাকে গণ্ডিবদ্ধ রেখেছিলেন কবি। তাই তাঁর কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে কদাচিত। তাই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিপন্ন বিষাদ* (১৯৬৮)-এ প্রথম একটি কবিতায় কারখানার প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। বাহ্যিক উন্নতি যে সবকিছু নয়, উঁচু ইমারতই যে সবকিছুর মানদণ্ড নয়, তা-ই কবি বলার চেষ্টা করেছেন ব্যতিক্রমী কায়দায়; যেখানে সমাজবাস্তবতার চিত্র উঠে এসেছে নিখুঁত শব্দের গাঁথুনিতে :

কারখানা ও কোঠা উঠছে যত
ঢেলে স্নেহ স্নেহাপ্লুত শিরে
ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষত
যায় না মুছে জনরোদন নীরে।

(মনিরুজ্জামান; ১৯৯৮: ১০০)

এর বাইরে কবি তাঁর রচিত কবিতার মাধ্যমে হতাশা, রক্তক্ষয়, বিচ্ছিন্নতাকে ডিঙিয়ে নির্বিবাদী জীবনের অনুসন্ধান করেছেন। তাই কৃষক বা শ্রমিকশ্রেণির ভাবনা তাঁর কাছে কখনো তেমন বড় হয়ে ওঠেনি। তবে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে *ভূমিহীন কৃষিজীব ইচ্ছে তার* (১৯৮৪)। এ-কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতায় কৃষক ও শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এসেছে। এর মধ্যে একটি কবিতা কাব্যনামের কবিতার কাছাকাছি। "ভূমিহীন কৃষিজীব ইচ্ছে তার জেলে হয়ে কিছু মাছ ধরে" শীর্ষক কবিতাটিতে রূপকের তীক্ষ্ণ গাঁথুনিতে তিনি শেকড়হীন মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। যাদের শরীর নিয়ত ক্লান্ত হওয়ার পর 'চোখের লবণ জমে চোখ জ্বলে/ শুধু জ্বলে।" মূলত জগতে যাদের পায়ের নিচের নিজস্ব ভূমির অধিকার নেই, তাদের সামাজিক অবস্থা বোঝাতে গিয়ে কবি কবিতার নাম সংকেতিত করে তুলেছেন। আর স্পষ্ট করে বলেছেন :

ভেসে যাওয়া ডালপালা কুড়িয়ে কাড়িয়ে
আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আছে
ভূমিহীন কৃষিজীবী, ইচ্ছে তার

জেলে হয়ে কিছু মাছ ধরে।...
সব মাঠ, হলুদ সবুজ কালো ফসলের সব মাঠ,
সময়ের প্রতীক্ষায় রঙ সাদা থেকে কালো হবে
জমে উঠবে মেঘের পাহাড়
কখন ক্ষেতের কাজ শুরু হবে কৃষকের
সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু।

(মনিরুজ্জামান; ১৯৯৮: ২১২)

ভূমিহীন বা শেকড়বিহীন, নির্যাতিত, বঞ্চিত—যা-ই হোক না কেন, সেই শ্রমজীবীদের একসময় সুদিন আসবে, সেই স্বপ্ন দেখেছেন কবি "আসবেই আমাদের কাল" শীর্ষক কবিতায়। তাই খুব সুসংহত স্পষ্ট ও সাহসী-ভাষ্যে তিনি বলেছেন, 'উদ্দাম সাহসে হব দুরন্ত উজ্জ্বল/ ছিন্ন করে শত ভ্রান্তি তন্দ্রা মোহজাল/ একদিন আসবেই আমাদের কাল।' (মনিরুজ্জামান; ১৯৯৮: ২১৫) পরের কবিতায় কবি এমন ভাব কবিতায় উপস্থাপন করেছেন, যেন তা আগের কবিতারই ধারাবাহিকতা। যদি আসে তেমন কাল, তবে কোন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, সীমিত সামর্থ্যের সংগ্রামী জীবনে:

সেই সবুজে বসত আমার
    সেই শ্যামলে ঘর,
সেই আকাশে আপন আমি
    অন্য গ্রহে পর;
প্রাণের ভেতর গানের মত
    মায়ের ভালবাসা
পায়ের নীচে যে মাটি তার
    বুকের মধ্যে বাসা।

(মনিরুজ্জামান; ১৯৯৮: ২১৬)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের দশটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উপর্যুক্ত কবিতাসমূহ ব্যতিরেকে উল্লেখযোগ্য আর কোনো কবিতায় কৃষি বা অন্য কোনো শ্রমজীবন নিয়ে জীবনসংগ্রামের লিপ্ত পেশাজীবীদের চিত্র পাওয়া যায় না। নগরজীবনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রিক দৃষ্টিতে কবিতা রচনায় বেশি মনোযোগী ছিলেন তিনি।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলা ভাষার নতুন কবি ও কবিতার যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক কারণে এবং অন্যান্য নানামুখী প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও তা নতুনতর পথের সন্ধানী হয়েছে। নতুন রাজধানী ঢাকায় আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে আগমন ঘটলেও এ-সময়ের কবিগণ

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রতিজ্ঞা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সেসব মোকাবিলার পাশাপাশি যুগপৎভাবে তাঁরা অবলম্বন করেছেন ঐতিহ্য ও শেকড়কে। নাগরিক পরিবেশে কবি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁরা যেমন কখনো সভ্যতা বিনির্মাণের কারিগর কৃষক-শ্রমিককে অবজ্ঞা করতে পারেননি, তেমনি কৃষি, কৃষিশ্রম ও অন্যান্য শ্রমভিত্তিক সমাজে তাঁদের মানসিক বিকাশ সাধিত হলেও কবিতার মৌল প্রবণতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ প্রাধান্যও পায়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ষাটের দশকের কবিতা

পঞ্চাশের দশকের কবিগণ যে সাংস্কৃতিক প্রত্যয়, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, জনচেতনার দিক থেকে তাঁদের সেই ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি মুসলমানকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে ভাষাভিত্তিক চেতনায় উত্তরণে এবং কবিতার নতুন ভূখণ্ডের নতুন কবিতাভাষা নির্মাণে তাঁদের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। ষাটের দশকে আবির্ভূত কবিগণ সেই প্রতিশ্রুতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মেনে নিয়েও স্বতন্ত্র চিন্তায় অগ্রসর হয়েছেন। দেশ-মাটি-রাজনীতি-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সময়োচিত ভাবনায় নিজেদের শানিত করেও স্বতন্ত্র কাব্যভাষা নির্মাণে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলাদেশের গণমানুষের কাছে ষাটের দশক অভিহিত হয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন-সংগ্রামের কাল হিসেবে। এই অস্তিত্বের লড়াই যেমন ছিল ব্যক্তির, তেমনি ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষার, তেমনি রাজনৈতিক স্বাধিকার আদায়ের; একইভাবে অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের। এককথায়, পরাধীন একটা জাতিকে তার অস্তিত্ব বিলীন করতে ভিন্ন জাতির অমানবিক শাসকগোষ্ঠী দ্বারা যত রকমভাবে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন করা যেতে পারে, তার সব রকম অপপ্রয়োগই হয়েছিল বাঙালির ওপর। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে বিরাজমান তুমুল জনচেতনা কবিদেরও স্পর্শ করেছে। সেই উত্তাল স্বাদেশিক চেতনায় আবির্ভূত কবিদের মধ্যে প্রায় সবাই সেই চেতনাকে ধারণ করেই নিজস্ব কৌশলে শিল্পিত কবিতা চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। ফলে পঞ্চাশের কবিদের সঙ্গে তাঁদের কাব্যভাষা ও ভাবনাজগতের সুচিন্তিত স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময়ে ষাটের কবিদের মধ্যে ব্যক্তিক ও স্বাদেশিক অস্তিত্বের সংকট অবিচ্ছেদ্য হয়ে সামনে আসে। ফলে দেশাত্মবোধ যেমন তাঁদের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা পড়ে, তেমনি অস্তিত্বসংকট, প্রেম, নিসর্গ-সৌন্দর্য, নেতিবাচকতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, হতাশাও তাঁদের কবিতায় ঠাঁই নেয় স্বকীয় নান্দনিক ভাষাশৈলীর মোড়কে। এ-দশকের স্বনামধন্য প্রায় সবাই ছিলেন শিল্পজ্ঞানে আত্মবিশ্বাসী। এই আত্মবিশ্বাসই তাঁদের অগ্রজদের যাত্রাপথকে অনুসরণ না করার সাহস জুগিয়েছিল। ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত পঞ্চাশের দশকের কবিগণ নিজস্ব পথ নির্মাণে সাফল্য অর্জন করলেও ষাটের কবিগণ সে-পথে যাননি। তাঁরা কবিতার নতুনত্ব নির্মাণ করেছেন স্বাদেশিক ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে; প্রয়োজনে ঝুঁকেছেন পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে। কর্ম ও শিক্ষাজীবনের জন্য অবস্থানগত কারণে তাঁরা পূর্বজদের চেয়ে অধিক নগরবাসী ছিলেন। ফলে

শহুরে মধ্যবিত্তের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁদের জীবনাচরণে প্রতিবিম্বিত ছিল। অনেকের শেকড় গ্রামীণ জীবনে প্রোথিত থাকলেও তাঁদের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে উদ্ভিন্ন নগরমানস। ফলে স্বাদেশিক স্বাজাত্যবোধ থাকলেও বিচ্ছিন্নতাবোধ, অস্তিত্ববাদ ও সময়চেতনায় সওয়ার হয়ে তাঁরা কবিতাকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন। হয়তো সে-কারণেই কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ প্রাধান্য দিয়ে কবিতা রচনায় ব্রতী হতে দেখা যায় কমসংখ্যক কবিকে। এ সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের কবিতা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমার তা চিহ্নিত করার প্রয়াস পাব।

ষাটের দশকের জ্যেষ্ঠ কবি শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)। পঞ্চাশের কবিগণের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সখ্য। বাংলা কবিতার ত্রিশের আধুনিক কবিদের উত্তরসূরি বলা হয়ে থাকে তাঁকে। স্বতন্ত্র ও স্বকীয় কাব্যভাষা সৃষ্টিতে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন বলে এ মন্তব্য তাঁর ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। অনেকে তাঁকে বাংলাদেশের বাংলা কবিতার একমাত্র নাগরিক কবি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের বাংলা কবিতার অন্যান্য চিহ্ন পাওয়া গেলেও কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। তাঁর শৈশব কেটেছে অবিভক্ত বাংলার কলকাতা শহরে। ১৯৫২ সালে স্থায়ী হন নতুন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায়। হয়তো সে-কারণেই কৃষক এবং শ্রমজীবন তাঁর ভাবনাকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। স্বভাবতই কবিতায়ও তা স্থান করে নিতে পারেনি। কারণ, 'তাঁর কবিতা আমাদের নিয়ে যায় সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতে, ঝলমলে বিশ্ব-নাগরিকতা বোধ ও গভীর স্বাদেশিকতার মিশেলে শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্বে।' (ভূমিকা; *শহীদ কাদরীর কবিতা*; ২০১০: ৫) তাঁর এই বিশেষত্ব 'বিদ্যুচ্চমকের মতো' শানিত ও প্রোজ্জ্বলিত। বাংলা কবিতাকে আধুনিকতার মানদণ্ডে বৈশ্বিক উচ্চতায় নেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর মধ্যে। আবেগ ও মেদহীনহীন কবিতায় রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই কোনো পেশাজীবীর প্রতি আলাদা করে কোনো অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না। তাঁকে খাঁটি নাগরিক কবি বলার বোধহয় এটাও একটা কারণ। তবে তাঁর বহুল পঠিত কবিতা "রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট" কবিতায় সাধারণ মানুষের চোখে রাষ্ট্রের এক অমানবিক চিত্রের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এ-কবিতায় যে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন কবি, তারই অংশ হিসেবে ফুটে উঠেছে শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রের বিমাতাসুলভ আচরণ। যেমন: 'রাষ্ট্র বললেই মনে হয় তেজগাঁ/ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এলাকা,/ হাসপাতালে আহত মজুরের মুখ।' (শহীদ কাদরী; ২০১০: ৬৫)

রফিক আজাদ ষাটের দশকের প্রথম পর্বের গুরুত্বপূর্ণ কবি। স্যাড জেনারেশনের প্রধান প্রবক্তা কবিতায় জীবনকে দেখেছেন দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশার মাপকাঠিতে। তাই কবিতা রচনায় বেশির

ভাগ সময় রোমান্টিকতার চেয়ে যৌক্তিক ধীশক্তির প্রাবল্যে আচ্ছন্ন থাকলেও, ব্যক্তিগত ও সামাজিক হতাশা পেরিয়ে ক্ষুব্ধও হয়েছেন তিনি। ষাটের দশকে বাঙালির সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী তথা স্বাধিকার আন্দোলনে রূপান্তরিত বেশির ভাগ কবি-সাহিত্যিক তাতে অংশ নিয়েছেন। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কবি রফিক আজাদও। সময়ের চাহিদায় সামাজিক দায়বোধ ও দেশাত্মবোধের চেতনায় শামিল হলেও তিনি কবিতার বয়ানে দুঃখবোধ, অস্তিত্বের বিপন্নতা, নেতিবাদী জীবনদৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর কবিতার বড় অংশজুড়ে 'প্রযুক্ত হয়েছে কবির অস্তিত্ব-সংকট, দেহজ বাসনাতপ্ত নারীপ্রেম চেতনা, আত্মবিধ্বংসী প্রবণতা, একাকিত্ববোধ ও স্বদেশভাবনার বলয়িত প্রেরণাসমূহ, যদিও সেটি প্রায়শই আত্মসমাহিত নারীসৌন্দর্যের উত্তেজক বাঁকে। অনেকটা আত্মজৈবনিক ঢঙে তিনি কবিতাকে প্রকাশ করেন। এর সঙ্গেই তাঁর নৈরাশ্যবাদ, বিচ্ছিন্নতবাদ, প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্য আকুতি প্রভৃতি উচ্চারণ শৈল্পিক মাত্রা পায়।' (বায়তুল্লাহ্; ২০০৯: ৪৫) তবে রফিক আজাদের কবিতার পাঠকনন্দিত ও তুলনামূলক বেশি আলোচিত স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলির বাইরেও সমৃদ্ধ একটা জগৎ রয়েছে। যে জগতে তিনি মাটির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন; যেখানে নিজেকে তিনি কৃষকের উত্তরপ্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করেন। পূর্ব-পুরুষের পেশাজীবনের প্রতি রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম কাতরতা। ফলে নিজের কাব্যচর্চার একাগ্রতা চাষীর সাধনার সাফল্যের সঙ্গে অভিন্ন করতে তিনি বলতে পারেন, 'লাঙলে এনেছি তুলে অতলের উর্বর-মৃত্তিকা—...একাগ্র চাষীর মতো সারাক্ষণ একটি চিন্তায়—ক্ষুদ্র এই বাগানকে কেন্দ্র করে ক'রে কাটাবো সময়।' (রফিক; ২০০৭: ৮৬) তিনি নিজেই যেন কৃষিজীবী। চিন্তাচর্চায়, সৃজনশীলতায় কৃষক হতে চান কবি। তাই পেশাজীবী হিসেবে কৃষকগোষ্ঠীর অন্য কাউকে নয়, নিজেই কৃষক হয়ে উঠতে চান। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'প্রতিটি শস্যের মধ্যে আমার নিশ্বাস প্রবাহিত।' (রফিক; ২০০৭: ৮৭) তাঁর কবিতার মৌল চেতনা, যা নাগরিক চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তার বাইরে গিয়েও যে স্বল্পসংখ্যক কবিতায় তিনি কৃষকের প্রতি অকৃত্রিম হার্দিক দরদ অনুভব করেছেন, তা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিল্পিত প্রেরণায় উজ্জীবিত। তারও কারণ তাঁর "অন্তরঙ্গে সবুজ সংসার"। যে-কারণে মুক্তিযোদ্ধা-কবি স্বাধীনতার মর্ম কেবল রাষ্ট্রাচারের বহিরঙ্গে নয়, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেই চর্চা করতে চান। তাই যতই নাগরিক জীবনযন্ত্রণার কবি হিসেবে রফিক আজাদকে চিহ্নিত করা হোক না কেন, তিনি মূলত 'বহিরঙ্গে নাগরিক—অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক'। সুতরাং আত্মবিশ্বাসী কবি খানিকটা ঘোষণার মতো করে বলতেই পারেন :

মানুষের বসবাসযোগ্য চিরস্থায়ী ঘর-বাড়িঃ
বহিরঙ্গে নাগরিক—অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক;
স্থান-কাল পরিপার্শ্বে নিজ হাতে চাষাবাদ করি
সামান্য আপন জমি, বর্গাজমি চষি না কখনো।

(রফিক; ২০০৭: ১০০)

ব্যক্তি-জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গের প্রতি উদ্‌যাপনের চেয়ে কবি যেমন নেতিবাদী, তেমনি তাঁর কবিতায় কৃষক এসেছে অসহায়, অবহেলিত, বঞ্চিত পেশাজীবী হিসেবে। তাতে কখনো ব্যক্তিগত অসহায়ত্ব সমাজে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত কৃষিজীবীদের দুঃখ-পরম্পরায় লীন হয়ে গেছে। এই অসহায়ত্ব কখনো জীবনব্যাপী বিরাজমান গভীর সীমাবদ্ধতার সঙ্গেও একাকার হয়ে গেছে। অসহায় বা অবহেলিত হলেও কৃষকের কৃপাতেই জনজীবনের আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীও তাঁর কাছে কৃষকের মতোই আত্মত্যাগী। মারি ও মড়কে, খরা ও প্লাবনে কৃষক যেমন প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে, সংসারের অজস্র সংকট ও গ্লানিতেও নারীর শুশ্রূষার হাত অটল থাকে, তেমনি কবির প্রতিজ্ঞাও নারী ও কৃষকের মতো হার না-মানা :

উত্থান-রহিত এক সৈনিকের প্রতি
গভীর প্রণয়ে প্রজ্বলিত করে যাচ্ছো
সর্বদাই আশার প্রদীপ। একদিন
ন্যূজপীঠ আমি আবার কোমর বেঁধে
মার-খাওয়া কৃষকের মতো শেষবার
দাঁড়াবো নিশ্চয়—দুই চোখে, পুনর্বার,
জ্বলতে থাকবে যুগপৎ ঘৃণা আর
হৃদয়-জাগানো ভালোবাসার আগুন—

(রফিক; ২০০৭: ২৫০)

কৃষকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বংশগত। পূর্বসূরির ধারাবাহিকতায় তাঁর শরীরেও বহমান কৃষকের ঐতিহ্যিক গুণাবলি। ফলে কবির সেই জীবন চেতনাপ্রবাহের মতো স্মৃতিময় হয়ে ফিরে আসে বারবার। তাঁর সুবর্ণস্মৃতি বলতেই গ্রাম, ঐতিহ্য, সোনালি ফসল, কৃষি ও কৃষকের ঘর গেরস্থালি। তাই অনায়াসে বলতে পারেন, ‘হাফপ্যান্ট পর সেই কিশোর বেলায় চ'লে যাই—চ'লে যাওয়া ভালো,/ এভাবেই চ'লে যেতে চাই ন্যাংটোপুটো রোদের দুপুর.../ বাগানে ও বনে চলে/ বাল্যকাল অন্বেষণ খেলা; এই খেলা ক্ষুব্ধ অভিমানে খেলে দু'টি/ শাদা-কালো কৃষক সন্তান।’ (রফিক; ২০০৭: ১১৭) কৃষকের সঙ্গে অন্তর্লীন সম্পর্কে এবং নিজের মধ্যে কৃষকের বংশীয় ধারার বহমানতা আবিষ্কার করার মধ্যে কবির আনন্দযোগ কবিতাতেও নতুনমাত্রা যোগ করেছে।

পূর্বসূরি কৃষিজীবীদের উত্তরাধিকার বয়ে নিতে নিজেকে তরুণ চাষা আখ্যা দিয়ে কবি কবিতায় গেঁথেছেন অসাধারণ চিত্রকল্প:

তরুণ চাষার হাতে-ধরা প্রবীণ লাঙল, গাছ-গাছালির
ধারাবাহিকতা, নিকোনো উঠোন—শোলার বেড়ার ফাঁকে দেখি
ঘোমটা-দেয়া চাষা-বউ, ছিমছাম গেরস্থালি, জ্বলন্ত উনুন;
প্রতিটি বাড়ির থেকে ভেসে-আসা ঢেঁকি-ছাঁটা চালের আঘ্রাণ;
কিশোর নাতির পিঠে হাত রেখে গল্প করে গাঁয়ের মোড়ল
অতিক্রান্ত যৌবনের শস্যের ও সুন্দরীর; সাহস, নিষ্ঠার।
কৃষকের মতো শ্রমে মনো-মৃত্তিকায় পুঁতি মৌল চারাগাছ:
মুহূর্তেই সেই কচি চারা দেখি সারা বিশ্ব ব্যেপে বেড়ে ওঠে;

(রফিক; ২০০৭: ১১৭)

স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল ষাটের দশকের কবি হলেও প্রথম দিককার কবিতায় কবি রফিক আজাদ যতটা নিমগ্ন ছিলেন নাগরিক ও আন্তর্জাতিক কবিতা-ভাবনায়, সময়গতির প্রবহমানতার সাথে সাথে তিনি ততই অগ্রসর হয়েছেন শেকড়ের দিকে। তাঁর কবিতার অভিযাত্রায় এই রূপান্তর স্পষ্ট। তাই বলে রাজনৈতিক সচেনতাকে পাশ কাটিয়ে নয়, বরং তীব্র ভাষায় তীর্যক ও ব্যঙ্গাত্মক শব্দবাণে বিদ্ধ করেছেন রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকদের। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আরও বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন সময় ও সমাজের প্রতি। ফলে কৃষি ও কৃষকের সন্তান হিসেবেই তিনি আত্মপ্রশান্তি লাভের প্রত্যাশায় যেন নীড় খুঁজে ফিরেছেন। যেখানে শঠতা নেই, কৃত্রিমতা নেই; আছে নয়নাভিরাম কর্মযজ্ঞে অংশ নেওয়ার এবং তা উপভোগের নিশ্চয়তা। তিনি যেন কৃষি-ঐতিহ্যকে লালন করেন কৃষক পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। তাই কোনো রাখঢাক না রেখেই তিনি বলতে পারেন :

একজীবনে অনেক জীবন যাপন করতে,
মন পড়ে রয় কৃষিকর্মে—
কৃষিকার্যে মন দেবো খুব, নূপুর পায়ে বউটি আমার
ঢেঁকিতে ধান ভানবে সুখে,
পরিশ্রমের ফসল এনে তুলবো ঘরে,
আমরা দু'জন গভীর সুখে
কলাপাতে ফেনাভাতের পাহাড় খাবো—
রাত্রিবেলা চাঁদের আলোয়
শরম-রাঙা বৌয়ের চোখে চোখটি রেখে
শীতল পাটির দিক দেখাবো—

(রফিক; ২০০৭: ২১৩)

সামগ্রিক কবিতার তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও ‘অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক’ হিসেবে শিল্পসৃষ্টির অনিবার্য উপাদানরূপে কৃষকের মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হয়েছে রফিক আজাদের কবিতায়। কখনো উপমা-উৎপ্রেক্ষা হিসেবে, কখনো নিজেকে কৃষকের সন্তান হিসেবে, কখনো স্মৃতিকাতরতার অনুষঙ্গ হিসেবে রফিক আজাদ নতুন কাব্যকথায় যেন শেকড়কে পুনর্জীবন দান করেন। যেমন: ‘ক্ষুধার্ত চাষীর ঘরে জন্ম নিলো আজ এক কবি/—মোরগের উচ্চারণে ভোরের আজান।’ (রফিক; ২০০৭: ৩১৮) একই কবিতায় সেই ‘কবিশিশু’ স্বকীয় দায়বদ্ধতার পীড়নে বলেন, ‘তোমাদের কথা, ক্ষুধা ও ব্যাধির কথা রাষ্ট্র করে/ দেবে দেশে ও বিদেশে।’ এই অঙ্গীকারে অতৃপ্তির বেদনা থাকে, কিন্তু দ্বিধা থাকে না; অকৃত্রিম আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু কোনো মোহ থাকে না। তাই তিনি অতীতকে ‘পিছনে ফেলে’ আসেন, কিন্তু ভুলে যান না। যেমন :

> পিছনে ফেলে আসিঃ
> কুয়োর মতো গভীর দু’চোখ অশ্রুভেজাঃ মা;
> অনাবাদী জমির মতো ধূ-ধূ দৃষ্টিঃ বাবা;
> প্রবীণ লাঙল, বৃদ্ধ বলদ, জরাজীর্ণ বাড়ি;
> কয়েকটি খুব ক্ষুধার্ত মুখ, তোবড়ানো গাল, ক্লিষ্ট হাসি,
> পিছনে ফেলে আসি।
>
> (রফিক; ২০০৭: ১৩১)

একবার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে গ্রামের ঐশ্বর্যকে ভুলতেও দ্বিধা হয় না, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই বাংলাদেশের কবিতায়। অথচ ‘তিনি নিজেকে কৃষক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, কারণ কৃষকরা হচ্ছেন সৃষ্টিশীল মানুষ, যথার্থ মানুষ—এমনই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কৃষক তথা নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি রফিক আজাদ কবিতায় পৌনঃপুনিক শুনিয়েছেন তাঁর ভালোবাসার কথা।’ (সূত্র: মিন্টু; বিশ্বজিৎ : ২০১৭ : ৪৫৭) তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র-স্বর। রফিক আজাদ কবিতার প্রয়োজনে যখন তীর্যক শব্দবাণে বিদ্ধ করেন সময়কে, সমাজের অসাম্যকে, ব্যর্থতাকে, তখনও কৃষকের সঙ্গে ইতিবাচক সমীকরণ অক্ষুণ্ন রাখতে চান। কারণ, ‘ষাটের দশকের কবিতায় নাগরিক উল্লাস, বিকার, আত্মরতি ও আত্মখননের যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি, রফিক আজাদের সতেজ কবিমন তা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে। যেন এক বাউল পাখি নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছে—এই জগতের সব কিছু সে দেখতে ও অনুভব করতে চায়। কিন্তু নিজের সময় মর্মের গভীরে লুকানো রাখালিয়া বাঁশির সুর সে ভুলতে পারছে না।’ (সূত্র: মিন্টু; রফিকউল্লাহ; ২০১৭ : ৫৩৯) এই ‘রাখালিয়া বাঁশির সুর’ কৃষিজীবী ও কৃষকের মাহাত্ম্য হিসেবে কবিতা-সজৃনের অকৃত্রিম প্রয়াসে অন্তর্লীন হয়ে ধরা দেয়। তবে ষাটের দশকের কবিতার চেয়ে তাঁর

কবিতায় কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আরও বেশি হার্দ্য মনোভাব এবং তাঁদের প্রতি অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় একুশ শতকে রচিত কবিতায়। যেখানে তিনি নগর-সভ্যতা গঠনে নিরবচ্ছিন্ন অবদান রাখা কৃষকের জীবিকার তাগিড়ে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মুচি, ছুতার, ধোপা, পাটনী, তাঁতী প্রভৃতি পেশাজীবীকে কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। ২০০৪ সালে রচিত একটি কবিতায় কীভাবে কৃষিসভ্যতার বংশগতি কয়েক প্রজন্ম পর নাগরিক আবহে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে ছিন্ন হয়ে যায়, তা অত্যন্ত শিল্পিত ভাষায় চিত্রিত করেছেন :

আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে পুরো দুই মাস
এ ঋতুতে কোনো কর্ম ছিল না দাদুর—
অবিরাম দড়ি-পাকানোর কাজ ছাড়া,
ছিলেন কৃষক বটে—কৃষিকার্যে ব্রতী;...
মৃত্যু তাকে নিয়ে গেলে ধারাবাহিকতা
বর্তায় পুত্রের ঘাড়ে; পুত্র তার খুব
কৃতকর্মা নয়, তবু ধারা রক্ষা করা
অবশ্য কর্তব্য জেনে দড়িটি পাকাতে
দ্যান মনপ্রাণ, পরবর্তী বর্ষাগুলো
অতি যত্নে পাকাতেন আমার জন্য—...
পরম্পরাময় পারিবারিক কর্মটি
করতেই হয় বলে দায়িত্বটি নিই—...
আমার মৃত্যুর পর?—সন্তানেরা কিন্তু
অস্বীকারও করতে পারে কৃষি-ঐতিহ্যকে!

(রফিক; ২০০৭: ২১-২২)

সময়গতির কারণে কৃষি ও কৃষকের সঙ্গে বংশগতির সম্পর্কচ্ছেদের বিয়োগব্যথা রফিক আজাদের মনে যে বেদনার ঢেউ তোলে, তা বাঙালির পরিবর্তিত পুঁজিবাদী সমাজে অনিবার্য নিয়তি। তাই তাঁর আর্তনাদ, 'কী ক'রে তা বলি—তারা তো আমার মতো/ নয় মোটে অনিবার্য কৃষক সন্তান।' এই অনভূতি কবি এবং তাঁর কবিতাকে বাংলা ভাষার কবিতাপাঠকের হৃদয়ে অনুরণন তুলবে অনাদিকাল ধরে। কারণ, 'আবহমান বাংলার সুবিস্তৃত কৃষি পটভূমি দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে তাঁর কবিসত্তায়।' (সূত্র: মিন্টু: মিনার; ২০১৭: ৫৩৭)

এ দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪)। প্রেমাবেগের আর্তি, নারী ও নিসর্গকে দেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, দেশপ্রেম, সময়ের ক্লেদ, কবিতার টানে যাপিত জীবনের প্রতি

উন্নাসিকতা ইত্যাদিই তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। কবির নিজস্ব অনুভূতিও তেমনই। কবিতার বিষয় ও উপাদান সম্পর্কে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি :

> বৃষ্টির শব্দ, পাতার মর্মরধ্বনি, নদীর কলস্বর এসবের মধ্যেই ক্রমশ আমার মন বিহ্বল ও কাতর হয়ে উঠতে থাকে, পাতায় জমা ভোরের শিশিরের মতোই আমার মনেও বিন্দু বিন্দু করে জমা হতে থাকে বিস্ময় বেদনা ও আনন্দ, নিজের দিকে একবার তাকাতে গিয়ে আমার মনে হয় কবিতার চেয়ে নিজেকে দেখার ভালো দর্পণ বুছি আর কিছু নেই। আমি বুঝি কবিতা বহু অর্থে নিজের জীবনেরই গূঢ় গভীর সত্য, এই জীবনেরই সর্বোত্তম নির্যাস, একই সঙ্গে যেমন স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের ভাষ্য তেমনি বহু জীবনের অনুভূতিময় নিবিড় চিত্র। (মহাদেব; ২০১৭ : ৫)

আপাতভাবে মনে হতে পারে, মহাদেব সাহার কবিতার জগৎ কেবল উপর্যুক্ত বিষয় ও বিষয়ীতেই সমৃদ্ধ। তাই তাঁর কবিতা নিয়ে সহজেই এমন মন্তব্য করতে পারেন যে-কেউ: 'তাঁর কবিতার মূল সুর বা বৈশিষ্ট্য কি, যদি প্রশ্ন করা হয়, তো বলব—প্রেম ও প্রকৃতির দ্বৈত রাগিণীর সাধনায় কবি সিদ্ধি অর্জন করেছেন। যদিও তাঁর কবিতার পরিমণ্ডলে আবহসঙ্গীতের মতো সমাজবোধ ও দেশাত্মবোধ মাঝে মাঝে সুর তুলেছে।' (সুত্র: সুবল; ২০০৫: ৩৪৩) হয়তো তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্রচলিত এমন ধারণার কারণেই এর বাইরে তেমন কোনো প্রেক্ষণবিন্দুর প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টির আলো পড়েনি। তবে এসবের বাইরেও তাঁর কবিতার ধারাবাহিক রূপান্তরকামী প্রবণতায় ম্রিয়মাণ স্রোতোধারায় বহমান রয়েছে কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। কবির অন্তরের এক মৌলিক স্তরে তাদের জন্য অনিবার্য এক স্থান নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।

কবির শৈশব-কৈশোর গ্রামীণ পরিবেশে কাটলেও মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে কবি স্থায়ী হন শাহরিক পরিবেশে। এ সময়ের অনুকূল পরিবেশে তিনি কবিচেতনা বিকাশের সুযোগ পান; সম্পৃক্ত হন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে। ধীরে ধীরে ঢাকাকেন্দ্রিক মূলধারা সাহিত্যপত্রিকা, ছোটকাগজসহ সমস্ত আয়োজনের সঙ্গে নিবিড়তা বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকের উত্তাল সময় অন্যান্য সৃষ্টিশীল মানুষের মতো তাঁকেও প্রভাবিত করে। ফলে তিনিও হয়ে ওঠেন নাগরিক কবি। কবিতার মোহে *এই গৃহ এই সন্ন্যাস* (১৯৭২) নামে যাপন করে নিজের অধিষ্ঠান ঘোষণা করলেও মাঝেমধ্যে শিল্পিত কবিতার প্রয়োজনে তিনি বাঙালির প্রত্নপেশা হিসেবে স্বীকৃত কৃষিজীবীদের সঙ্গে নিজের চিরায়ত ঘনিষ্ঠতার বাতাবরণ উন্মোচন করেন। আত্মনির্মিত সেই অর্গলে কৃষকসহ অন্য শ্রমজীবীগণও স্থান পান অনিবার্য অস্তিত্বের অংশ হিসেবে। কারণ, তাঁর ধারণা, নিসর্গও কখনর মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; যেমন করে নিসর্গ অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণেই বিলয় ঘটেছিল

বড় বড় সভ্যতার। "নিসর্গের খুন" কবিতায় প্রকৃতি নিজেই যদি হন্তারক হয়ে ওঠে, তার গ্রাস থেকে বাঁচবে না কেউ—কৃষক-শ্রমিকও না :

সরল চাষার লণ্ডভণ্ড করবে খামার, শস্যক্ষেত
নিশিরাতে গোয়াল থেকে খেদিয়ে নেবে গরুর পাল
কালো খোঁয়াড়ে
বন্দী করবে একে একে,
লুটপাট করবে স্থানীয় মুদির দোকান, সারাগ্রাম
কাঠমিস্ত্রির সারসরঞ্জাম তছনছ করবে
(মহাদেব; ২০১৭: ৩০)

যাপিত জীবন এবং বাস্তবিক ও সামাজিক কারণে মানুষ অনেক সময় শেকড় বিচ্যুত হয়। কিন্তু জীবনানন্দের ঘাটতি হলেও মানুষ আবার ফিরতে চায়, শেকড়ের কাছে; নিজেকে সমর্পণ করতে চায় মাটির কাছে। যে কারণে কবিতার নাম হয় "মাটি দে, মমতা দে"। মাটির কাছে, নিগূঢ় বন্ধনের নিবিড় সাহচর্য পেতে কতটা উদগ্রীব ও তৃষ্ণার্ত হলে কবি শিল্পিত কথামালায় গাঁথতে পারেন মৃদুতালের চিরায়ত ঝঙ্কার, তার দৃষ্টান্ত :

আমাকে তুই তুলে দে তুলে দে
তুলে দে একটু মাটি
মাটিতে ছড়ানো বীজ, কালো ঘাম,
কালো কৃষকের শ্রম,
আবার এসেছি ফিরে তোর কাছে মধুর মানব
আমাকে তুই মাটি দে মাটি দে
মাটির মমতা দে, মন্ত্র দে
তুলে দে তুলে দে! (মহাদেব; ২০১৭: ৩৭)

এই মাটির প্রত্যাশার তিনি আজীবন 'করাঞ্জলি পেতে' থাকবেন। কারণ কবি 'মধুর মানব'কে ফেলে শহুরে জীবনের বিবরে হয়েছেন স্থায়ী। বাস্তবতা মেনে নিলেও তাঁর মনের গহিনে বাস করেন একজন *ধুলোমাটির মানুষ* (১৯৮২)। আর তাকে ধারণ করেই কবির সৃষ্টিজগৎ আবর্তিত হয়। ফলে ধুলোমাটির সান্নিধ্যে বসতি গড়া অনাহারী কৃষক 'মনু মিয়া' কিংবা 'চোয়াল ভাঙা হারু শেখের' বঞ্চনা তুলে ধরার দায়িত্ব নেয় তার কবিতা। তাদের দৈনন্দিন শোষণের প্রসঙ্গ টেনে বিশ্বের সমস্ত শোষিত শ্রমজীবীর কথা বলতে চান কবি। তাই 'পূর্ণিমার চাঁদ' যেমন করে 'ঝলসানো রুটি' হয়, তেমনি করে মহাদেব সাহার কবিতার নাম হয় "জুঁইফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর"। তবে কবির পরম প্রত্যাশা, শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে একদিন অধিকার

আদায়ে শোষিত কৃষক যেদিন ঐক্যবদ্ধ হবে, ছিনিয়ে হাতের মুঠোয় নিতে পারবে নিজের প্রাপ্য, সেই দিন হবে এই কবিতা রচনার সার্থকতা—

> পেটে খিদে এখন বুঝি কবিতার জন্য কি অপরিহার্য
> জুঁইফুলের চেয়ে কবিতার বিষয় হিশেবে আমার কাছে
> তাই
> শাদা ভাতই অধিক জীবন্ত—আর এই ধুলোমাটির মানুষ;
> এই কবিতাটি তাই হেঁটে যায় অন্ধ গলির নোংরা বস্তিতে
> হোটেলের নাচঘরের দিকে তার কোনো আকর্ষণ নেই,
> তাকে দেখি ভূমিহীন কৃষকের কুঁড়েঘরে বসে আছে
> একটি নগ্ন শিশুর ধুলোমাখা গালে অনবরত চুমো খাচ্ছে
> আমার কবিতা,
> এই কবিতাটি কখনো একা-একাই চলে যায় অনাহারী
> কৃষকের সঙ্গে
> জরুরী আলাপ করার জন্য,
> তার সঙ্গে কী তার এমন কথা হয় জানি না
> পরে মুহূর্তেই দেখি ক্ষুধার্ত কৃষক
> শোষকের শস্যের গোলা লুট করতে জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে;
> এই কবিতাটির যদি কোনো সাফল্য থাকে তা এখানেই।
> (মহাদেব; ২০১৭: ৯৯)

"এই কবিতাটি কোথায় পেয়েছি" শীর্ষক কবিতাতে দেখা যায়, কবিতার সামগ্রিক প্রেরণার উৎস নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন কবি। তিনি জীবন ও সমাজে নানা অনুষঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু সেখানেও অবশ্যম্ভাবীভাবে তিনি সংকেতিত করেছেন কৃষক, মাটি, ভাত মিছিল, ধুলো, অনাহারী শিশুকে। যেমন: 'এই কবিতাটি ছিলো কৃষকের মাটির শানকি-ভরা শাদা ভাত/...এই কবিতাটি পেয়েছি এখানে ধুলো ও মাটিতে রূঢ় বাস্তবে।' (মহাদেব; ২০১৭: ১০৬-১০৭) একসময়ের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী কবি আশির দশকে হয়েছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। নিশ্চয়ই তিনি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখতেন। তাই আস্তে আস্তে তিনি তাঁর কবিচৈতন্যকে স্পষ্টভাবে প্রবাহিত করেছেন বঞ্চিত মানুষের পক্ষে। তাঁর সম্পর্কে বলা যায়:

> ধীরে ধীরে মহাদেব সাহাও সমর্পিত হন স্বদেশ-মৃত্তিকা-মাটি ও মানুষের সঙ্গে। সেটি তাঁর পক্ষে ঘটে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর কাল-পরিসরের মধ্যেই।...দেশাত্মবোধ নিয়ে যায় তাঁকে সাম্যবাদী চেতনায়। আসলে ষাটের দশকের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা এসেছে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মেহনতী মানুষের প্রতি দায়িত্বসেচতনতা থেকে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলা কবিতার নজরুল-সমর-সুভাষবাহিত

ঐতিহ্যও ক্রিয়াশীল।...ষাটের দশকের কবিদের সাম্যবাদীচেতনাও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আদর্শের ভিত্তিতে যতটা না নির্মিত, তার চেয়ে বেশি কার্যকর সমকালীন গণচেতনা, সর্বজনগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার ঐকান্তিক আগ্রহ। (বায়তুল্লাহ্; ২০০৯: ৯৮-৯৯)

ফলে জনমানুষ তথা শ্রমজীবীদের অধিকার আদায়ে কবি আপসহীন থাকতে পারেন এবং ভেতরে ধারণ করতে পারেন একজন 'ধুলোমাটির মানুষ'কে। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচীর সঙ্গে সম্পৃক্ততাও তাঁর সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমীজীবীদের প্রতি দায়বদ্ধতার ইঙ্গিতই বহন করে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে "লেনিন, এই নাম উচ্চারিত হলে" শীর্ষক কবিতায় লেনিনের উদ্দেশে বলতে পারেন, 'তুমিই প্রথম পৃথিবীর মাটিতে উড়িয়ে দিলে সাম্যের পতাকা।/... তুমি পৃথিবীর মাটিতে উড়ালে প্রথম এই মানুষের মুক্তির পতাকা।' ইতিহাসের পাতায় সজাগ থাকা সমাজ-সচেতন কবিদের অন্যতম লক্ষ্য। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে রাশিয়ায় জারশাসকদের হটিয়ে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের শাসন কায়েম করেছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। তাঁর সেই আন্দোলন 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' হিসেবে খ্যাত। কারণ, লেনিনই প্রথম মার্ক্স-এঙ্গেলসের শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদান করে জারশাসিত রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের বাস্তবায়ন ঘটান। (রফিক; ২০২১: ৪৮)

তাই সাম্যবাদী সমাজপ্রত্যাশী কবি লেনিনকে সামনে আনেন। এই শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আদর্শই কবি মহাদেব সাহার প্রকৃত কবিসত্তার পরিচায়ক হতে পারত। তিনি দিনেশ দাস-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিচৈতন্যের দৃঢ় অনুসারী হতে পারতেন। কিন্তু কবিতা রচনায় সমাজতান্ত্রিক চেতনা ধারণ করে সাম্যপ্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের নিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর খুব বেশিসংখ্যক কবিতায় সরব হতে দেখা যায় না। তবে সংখ্যায় কম হলেও সমাজতান্ত্রিক চেতনা লালনের বারুদকে যে তিনি স্বমহিমায় ধারণ করেছেন, তা বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবি হিসেবে স্বাতন্ত্র্যভাষী এবং সেই সময়ের কবিতাধারায় নিজের কবিতাকে অনন্য সংযোজন হিসেবে পরিগণিত করতে পেরেছেন। তাই কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাতে এবং সমাজের ভারসাম্য আনতে কবিতায় তিনি ব্যবহার করেন লেনিনের আদর্শকে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় কৃষকের ভূমিকাকে তিনি মূল্যায়ন করতে চান। কারণ, কৃষক এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্য জোগানদাতা। তাঁদের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক স্থাপন এবং শোষণের বদলে মালিক হিসেবে তাদের চিরমুক্তি ঘটিয়ে লেনিনের আবির্ভাব ঘটান এবং শিল্পিত শব্দমূহের ওপর ভর করে বলেন :

তার আগে মেহনতী মানুষের ছিলো না কিছুই;
এবার শস্য তার, শস্যের খামার তার, শিল্প-কারখানাও এবার তাদেরই।
কমরেড লেনিন, এই নাম উচ্চারিত হলে রক্তে খেলে যায়
প্রত্যাশার কী যে বিদ্যুৎ ঝিলিক...
মনে হয় আর কোনো ভয় নেই—
শোষণের দিন শেষ পৃথিবীতে মেহনতী মানুষ জেগেছে!
লেনিন এনেছে পৃথিবীতে নবযুগ
কাস্তে-হাতুড়ি সাম্যের সংবাদ,
লেনিন এনেছে ঐক্যের মহামন্ত্র
মানুষে মানুষে মৈত্রীর সেতুবন্ধন;

(মহাদেব; ২০১৭: ১০১)

বিদুৎঝলকের মতো শ্রমজীবী মানুষই এসেছে মহাদেব সাহার কবিতায় এবং কোনো কোনো সময় তা কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবেই। কিন্তু বিস্তৃত পরিসরে আসেনি। তবে মানুষের শুভবোধের জাগরণ, সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রত্যাশা তাঁর কবিতার অন্যতম মূল্যবান বিষয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নিজ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এ ক্ষেত্রে তিনি বৈশ্বিক। আত্মমুখিতা তাঁকে ব্যক্তিজীবনে খোলসবন্দী করলেও তাঁর চেতনার জগৎ কবিতার ক্ষেত্রকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক চিন্তার মানদণ্ড। তিনি ভেবেছেন, গোটা বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে আফ্রিকা আর নিজ দেশের দুঃখ কিংবা প্রাপ্তিও অভিন্ন হয়ে উঠবে। আর তাতে মানুষের প্রকৃত মুক্তি আসবে। কারণ, তিনি বলতে পারেন, "আফ্রিকা, তোমার দুঃখ বুঝি"—

আফ্রিকার বুকের ভেতর আমি শুনতে পাই এই
বাংলাদেশের হাহাকার
বাংলাদেশের বুকের ভেতর আফ্রিকার কান্না;...
আমি দেখতে পাই এঙ্গোলার কৃষকের মতোই
বাংলাদেশের ভূমিহীন চাষীও
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলেছে আকাশে
সে-হাত শোষণের বিরুদ্ধে দুর্জয় হাতিয়ার
আজ এশিয়া তাকিয়ে আছে আফ্রিকার দিকে

(মহাদেব; ২০১৭: ১০৩)

আমাদের নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে উপর্যুক্ত কবিতাসমূহ ছাড়াও কিছু কবিতায় চিত্রকল্প নির্মাণে কিংবা কবিতার বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে কিংবা ভাব ও বিন্যাসের শ্রীবৃদ্ধির তাগিদে তিনি কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গ এনেছেন। মহাদের সাহার জীবনব্যাপী কবিতা-সৃজনে শাহুরিক চেতনা

প্রাধান্য পেলেও যে স্বল্পসংখ্যক কবিতায় কৃষক-শ্রমিককে ঠাঁই দিয়েছেন, তা তাঁর সামগ্রিক কবিচেতনায় অন্বেষণে অত্যন্ত মূল্যবান।

মোহাম্মদ রফিক (জ. ১৯৪৩) ষাটের দশকের খ্যাতিমান কবিদের একজন। শব্দ-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শতভাগ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি বাংলাদেশের কবিতাভূমে আবির্ভূত হয়েছেন। যদিও লক্ষ্যযোগ্য শব্দ-স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেক কবিরই অন্যতম শক্তির পরিচায়ক; তবুও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মোহাম্মদ রফিকের শব্দ নির্বাচন অবশ্যই পৃথক মনোযোগ আকর্ষণ করে। কারণ, শব্দ ব্যবহারে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন গোটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংকট, সংগ্রাম, দাম্পত্য জীবন, রোমান্টিকতা, স্বপ্ন প্রভৃতি নিত্য-অনুষঙ্গকে। তাঁর কবিতার মানুষকে কেবল 'সাধারণ' বললে সরলীকরণ করা হয়। বরং বলা সমীচীন, বংশপরম্পরায় যারা বাঙালির প্রত্নপেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যাদের কারণে সভ্যতার ভিত্তিভূমি সমৃদ্ধতর উপায়ে সঠিক গন্তব্যে পারিচালিত হয়, যাদের অবদানে ভারসাম্যপূর্ণ থাকে সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি, তাদের জীবনের প্রতিভাসকে তিনি নানা চিত্রকল্প, রূপ-রস ও প্রাসঙ্গিক শব্দপ্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। এই ভাষা যেমন জসীমউদ্‌দীনের কাব্যভাষা থেকে আলাদা হয়েও নিবিড়ভাবে গ্রামীণ, তেমনি জীবনানন্দের রূপসীবাংলার অতীন্দ্রিয় কাব্যভাষার মতো দূরবর্তী নয়, নিকটের। বাঙালির অতি আপন সেই ভাষায় কবিতা রচনা করে তিনি সহজেই পাঠকের নৈকট্য লাভ করেছেন। যে-কারণে নানা প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে শ্রমজীবনকে বিষয় হিসেবে তিনি নির্বাচন করেন। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় কৃষক, জেলেসহ অন্যান্য পেশাজীবীর জীবনচিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পেশাসূত্রে নাগরিক জীবনের অধিবাসী হয়েও শেকড়কে চিত্রিত করার ব্যাপারে তিনি যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এমনকি জেলে, মাঝি, কৃষক প্রভৃতি পেশাজীবীর জীবনকে কখনো কখনো প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন বক্তব্যের তীর্যকতা প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ও শব্দ যোজনা করেছেন তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরতেও। কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও রয়েছে ব্যতিক্রমী ও নতুনতর ভাবনার প্রকাশ। *বৈশাখী পূর্ণিমা* (১৯৭০), *ধুলোর সংসারে এই মাটি* (১৯৭৬), *কীর্তিনাশা* (১৯৭৯), *খোলা কবিতা* (১৯৮৩), *কপিলা* (১৯৮৩), *গাওদিয়া* (১৯৮৬), *স্বদেশী নিশ্বাস তুমিময়* (১৯৮৮) কাব্যনামের ঔজ্জ্বল্যে বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, জনপদ, শেকড়, নিসর্গ যেন একাকার হয়ে গেছে।

সমসাময়িক অন্য কবিগণের তুলনায় প্রান্তিক জনজীবনের চিত্র ও জীবন-সংগ্রামের পরিবর্তনহীন অবস্থা চিত্রণে মোহাম্মদ রফিক একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লালনকারী। তাঁদের জীবনকে কবিতায় প্রোথিত করার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই নির্মোহ। যেন কোনো আবেগের বশবর্তী হয়ে কবিতা

নির্মাণে তিনি আত্মনিয়োগ করেন না। নিজেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছিন্ন প্রতিনিধি হিসেবে কাব্যবুননে উপনীত হন। ফলে আরোপিত নয়, আন্তরিক প্রকাশ ঘটে প্রাসঙ্গিক শব্দযোজনায়।

যেমন "মাঝি ও তার দিন" কবিতায় লক্ষ করা যায়, জলের বুকে নৌকা বাওয়া, জলের গহীনে বিচরণ করতে হয় যাদের রুটিরুজির খোঁজে, তাদের কিন্তু প্রকৃতির মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাদের দিনরাত উদ্বেগ-অনিশ্চিয়তা-শঙ্কায় কাটে। সেই উপাজর্নক্ষম মানুষকে নিয়ে পরিবারের শঙ্কাও পাহাড়সম। এসবের পাশাপাশি তাদের এই জীবনচিত্র এঁকেছেন কবি শব্দকুশলী শিল্পীর মতো। যেমন :

বাড়িতে প্রচুর মুখ দুই বউ ছেলেপিলে ঢের
ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দু-একটা রুপোর ইলিশ

দিনান্তে চালের দাম সবকিছু তার মাপাজোকা
কূলেতে ঠেকিয়ে নাও জলে সারে রোদ্দুরে শুকোয়

একটি খুঁটির সঙ্গে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে
নিদ্রা যায় পুঁটির আঁশটে গন্ধে পড়ন্ত বিকেলে

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ৫৭)

এই কবিতার মতো "মাঝি ও তার দুঃখ", "মাঝি ও তার রাত্রি"সহ আরও কিছু কবিতায় মূলত জেলে বা মৎস্যজীবীদের নদীকেন্দ্রিক সংগ্রামী এবং অনিশ্চিত জীবনের প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত শিল্পিত শব্দ প্রয়োগে নির্মাণ করেছেন কবি। কবিতাগুলো পাঠকনন্দিত হলেও এর নামকরণ নিয়ে মৃদু প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ, তিনি কবিতায় এনেছেন জেলে বা মৎস্যজীবীদের প্রসঙ্গ কিন্তু কবিতার নামে প্রয়োগ করেছেন "মাঝি"। আসলে মাঝি ও জেলে অভিন্ন পেশাজীবী[১] নয়।

প্রকৃতি আর প্রকৃতিনির্ভর পেশাজীবী এবং তাদের জীবনসংগ্রাম, মিতব্যয়ী শব্দপ্রয়োগে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ রফিকের মুনশিয়ানা সমকালীন অন্য কবি তো বটেই, বাংলা কবিতার সুবৃহৎ জগতেই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে দিয়েছে। তেমনই আরেকটি কবিতা "কিষাণের দিনলিপি"। কত গভীরভাবে কৃষক ও তাদের নিত্যকর্ম প্রত্যক্ষ করলে এবং তা ধারণ করলে কৃষি উপকরণ, চাষবাসের অনুপুঙ্খ চিত্র নির্মিত হতে পারে চলচ্ছবির মতো, তারই দৃষ্টান্ত :

হালের ফলায় লেগে ঝুরঝুরে বালি কিছু মাটি,
এখন ভাটার টান খালের ঘোলাটে ম্রিয়মাণ
জলরেখা, সারাটা আকাশে আলো গলে গলে ছায়া,

হালের বলদ একা ঘুরে ফেরে, একাকী কিষাণ
দাওয়ার ফ্যাকাশে রোদে চুপচাপ মূঢ় জবুথবু;
সারাটা দিন খাটাখাটি এন্তার কাজের চাপে ভাঙা,
মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ৫১)

কবিতাটিকে গ্রাম্য কৃষকবাড়ির দিনলিপিও বলা যায়। ভূমি কর্ষণের এমন বর্ণনা নগর-সভ্যতায় অভ্যস্ত হাল আমলের পাঠক-বিশ্লেষকের পক্ষে বোধগম্য হওয়া অনেকটাই দুরূহ হলেও তা শাশ্বত। এই কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্য-জোগানদাতা কৃষকের জীবনসংগ্রাম ও প্রকৃতিনির্ভর কৃষকের চাষপদ্ধতি সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। তবে প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে কৃষিসভ্যতার ওপরও। তাই পদ্ধতিগত আধুনিকায়নের ফলে কৃষকের এমন দিনলিপি এখন অনেকটাই ক্ষয়িষ্ণু। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা থেকেও কৃষকেরা এখন অনেক নিরাপদ। তাই কবির আন্তরিক উদ্বেগ 'ভেবেছিল প্রচুর আলুর চাষ আর এই মাঘে/ ভয় নেই অথৈ বৃষ্টির,.../ অবাঞ্ছিত জলে ভাসে ফলনের থৈ থৈ ক্ষেত' (মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ৫৮) বা এ-সংক্রান্ত সমূহ-বিপদ থেকেও কৃষকেরা সতর্ক হতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কল্যাণে।

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি ও শ্রমজীবন কবিতার অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য উপাদান হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও নগরায়ণের দ্রুততর প্রসারমানতার কারণে গ্রামীণ শিক্ষিত মানুষের শহুরে নাগরিক হয়ে ওঠার প্রবণতায় তা হয়নি। তবু যে খালেক, মালেক, মোমেনার বাপ প্রমুখ প্রতীকী নামের আড়ালে বাংলাদেশের প্রত্নপেশার মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মকে মোহাম্মদ রফিক কবিতার প্রধান উপাদান করে তোলেন, তাতে অকৃত্রিমভাবে নিজেও উপস্থিত থাকেন। এর আগে বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান কবি আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় খালেক নিকিরীদের প্রসঙ্গ এনছিলেন নস্টালজিক হয়ে। কিন্তু নগরবাসী মোহাম্মদ রফিকের ভেতরে যেন কোনো নস্টালজিয়া কাজ করেনি, বরং তিনি যেন অন্যতম অংশীজন হয়ে অনাহারী শ্রমজীবীদের দুঃখ-বেদনাকে ভাগ করে নিয়েছেন: 'খালেক/ গাইটার কোনো তেমন লক্ষণ নেই সেরে উঠবার/ ওষুধ/ পত্তর একদম বৃথা গেল দুই কুড়ি টাকা/ হাঁড়িতে/ লাফায় ব্যাঙ পেটে ক্ষুধা গাঁটে ব্যথা মরিচ চল্লিশ।' (মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ৯৪) এই সব ভেবেও কবি রূপকথার বীরপুরুষদের মতো সাফল্য কামনা করেন খালেকদের হয়ে। *গাওদিয়া* নামক কবিতাগ্রন্থে দিনবদলের স্বপ্নে বিভোর কবি। দেশটা তখন অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতারিন্ত্রক শাসনের কবলে। গাওদিয়া একটি গ্রামের নাম। হয়তো কবির কল্পিত গ্রাম কিংবা পুতুলনাচের ইতিকথার গা্ওদিয়াই!

কারণ, পুতুলনাচের ইতিকথায় চরিত্রগুলো একসময় 'বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিন্ন নাম গাওদিয়ার অচলায়তনে আত্মপ্রবঞ্চনামূলক সহাবস্থানে অবশেষে মানিয়ে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকালকে গাওদিয়ার প্রতীকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন কবি মোহাম্মদ রফিক। সমাজের গতিপ্রকৃতি ও তার প্রবণতাসমূহে তিনি মানিক-পুরাণের ধ্রুপদ প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন।' (সূত্র: জিল্লুর; ১৯৮৬: ৬৩) কিন্তু কবিতায় তা আর নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলবিশেষের গ্রাম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; হয়ে উঠেছে সারা বাংলাদেশের আদর্শগ্রাম। যে গ্রামের মানুষেরা কবির আপনজন; বাংলাদেশের সব মানুষের আত্মীয়। তারা কৃষক, তারা শ্রমিক, তারা মানবসভ্যতার অনিবার্য, কিন্তু অবহেলিত ক্রীড়নক। বাঙালির রূপকথা, বাঙালির পুরাণের নানা খ্যাতিমান চরিত্রকে কবি এখানে ব্যবহার করেছেন অনবদ্য দক্ষতায়। তাদের নিয়ে তাঁর বেদনাবোধ চিত্রিত হয় কবিতায়। শ্রমজীবী স্বজনদের হারানোর সেই আর্তনাদ নিয়ে কবি রচনা করেন :

কেঁদে কেঁদে খালেকের বউ মারা গেছে গত সনে
কাঁশির গমক উঠে। ধস নামে পাহাড়ের গুহায়।
হাঁস ক'টা ছেড়ে দিলে! উহ কী ভীষণ জাড় আজ।
আগামী বছর শীতে, খালেক ঘুমোবে ঠিক দেখো,
বাঁশপাতা, দূর্বাঘাস, সোঁদামাটি, খড়, এইসব
মুড়ি দিয়ে বাগানের এক কোণে, খুব নিরিবিলি
ভূমিহীন ভূমিদাস, নিজরাজ্যে ভৌমিক তোষকে;

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১২৯)

কবির ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা অনেক কবিতাতে সর্বজনীন কৃষিভিত্তিক সমাজের কর্ণধারদের দুঃখগাথাগুলো অসাধারণ ইমেজ হয়ে উঠেছে। কেবল তাদের শ্রম বা শ্রমকে কেন্দ্র করে জীবনসংকট নয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককেন্দ্রিক বেদনা, অসুখবিসুখ, চিকিৎসাসংকট নিয়ে তাদের চিরন্তন উদাসীনতা কিংবা অকালে সন্তান-হারানোর আপাত স্বাভাবিকতার আড়ালে গভীর আবেগ, আঁতুড়ঘরে মা কিংবা শিশুর মৃত্যু নিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করার প্রয়াস।এত কিছুর পরও জীবনকে মানিয়ে নেওয়ার যে অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি, তা-ই মোহাম্মদ রফিকের কবিতাকে অনন্য অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে। যেমন :

মাথার ওপরে ভাঙা বাঁশের বেড়ায়, নিষ্পলক
মাথাল, জোয়াল, যত্নে রিপু করা পিরান-কামিজ;
মোমেনার বাপ ফিরে এলে গায়ে দেবে, কাজে যাবে,
ছাইভরতি উঠোনের এক কোণে মরচে পড়া দাও;

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৩৬)

আশির দশকে রচিত *গাওদিয়া* নামকরণের আড়ালে মূলত কবি গোটা বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মাঝেমধ্যে তিনি রূপকথার শরণ নিয়েছেন, তাতে কবিতার প্রতীকী ব্যঞ্জনার তাৎপর্য আরও গভীরে উপনীত হয়েছে। যেমন :

পরান মাঝির হাঁকে সচকিত, বিদায় বিদায়,
লঞ্চঘাট, স্টিমার, প্রচণ্ড ভিড়, সারেঙের ত্রস্ত হাঁকডাক,
হিজিবিজি কথাবার্তা, সমস্ত গুলিয়ে যায়, যায়
ভেসে যায় কচুরিপানার দল সারি সারি নাও,
মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা, স্বাধীনতা, যুদ্ধ, স্বাধীনতা
মহামারী, একদিন দাঙ্গার আগুনে গেরস্থালি,
বেঁচে থাকা, যুদ্ধ করা, বেঁচে থাকা, ঘূর্ণি ঝড়ো গাওয়া,
এই কান্না, বাংলায় বৈশাখী মেঘ, এ-ই ভালোবাসা

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৩৯)

কবি মোহাম্মদ রফিক পোড়খাওয়া বাঙালির জাগরণে বিশ্বাস করেন। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষ এক দিন সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বপ্নের পৃথিবী গড়বেন, এমন প্রত্যাশাও করেন কবি। তাঁর যত স্বপ্ন, যত সংকট, যত কাব্যকৃতির সম্ভাবনা—সবই যেন কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যলিখনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নইলে বাংলাদেশের অন্যতম স্বৈরাশাসকের শাসনামলে তিনি বলতে পারতেন না, 'কেউ আর একা নই; আজ/ জনতা-মিছিলে ভাঙে সহস্রবর্ষের বালিবাঁধ/ আদিম শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায়;/ কলম-কালিতে নয় ঘামেশ্রমে রক্তের বিপ্লবে/ শ্রমিক দিয়েছে সাড়া, মহাকাব্য লেখা শুরু আজ।' (মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৪৯) সেই একই কারণে তিনি যেন নতুন প্রজন্মকে রূপকথার গল্প শোনানোর ঢঙে লেখেন "গল্প শোনো"। এখানেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক সংকটই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি শুরু করেছেন এভাবে :

রাজার ছেলে মন্ত্রীর ছেলে
পঙ্খীরাজে সওয়ার হলো,
রাক্ষস মারে খোক্কস মারে...
সারাটা রাত স্বপ্ন দিয়ে পেট ভরাত
শ্রমিক-কৃষক ডাক দিয়েছে
খোক্কসেরা কাঁপছে ডরে

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৫০)

ষাটের দশকের অন্যান্য কবির চেয়ে মোহাম্মদ রফিকের স্বতন্ত্র অবস্থান আশাবাদিতার ক্ষেত্রেও। এ সময় দীর্ঘ স্বৈরশাসন এবং যুগের নানা সংকটের কারণে ষাটের কবিদের মধ্যে অনেকের কবিতাতে

নৈরাশ্য জেঁকে বসেছিল। মোহাম্মদ রফিক সামগ্রিকভাবে নানা সংকট তুলে আনলেও শেকড়ের শরণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত আশাবাদকে টিকিয়ে রেখেছেন।

বাঙালির প্রত্নপেশা হিসেবে কৃষিকাজ, মাছধরা প্রভৃতিকে যেমন কবি অকৃত্রিম আন্তরিকতায় নতুন কাব্যকৌশলে ব্যবহার করেছেন, তেমনি লোকপুরাণ, লোককথা, শ্রমজীবন, ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন চরিত্র, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে, সেসবকেও তিনি কবিতায় তুলে এনেছেন নবতর প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিগণের অনেকেই যেখানে পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিংবা তাদের অনুসরণ করে কাব্যবৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় সাধনা করে গেছেন, সেখানে কবি মোহাম্মদ রফিক ডুব বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গহীনে। তাঁর কবিচৈতন্যের সঞ্জীবনী যেন চাষাভূষাদের রক্তের প্রবাহে একীভূত হয়। তা-ই তিনি অভূতপূর্ব দক্ষতায় গাঁথতে পারেন :

এইবার কবিতার ছন্দ চিত্রকল্প হোগলার
বেড়া, ছনে-ছাওয়া ঘর, দোআঁশলা মাটির কাঁচা ভিত,
উপড়ে ফেলে কীর্তনখোলার রক্ত মেদমজ্জা হাড়;...
ভূমিহীন মজুরের ভূমির অপূর্ব সৎকারে
চিত্রল চাঁদের দেশি-বিদেশি চিতার চক্রান্তের
সাম্রাজ্যিক উলঙ্গ, পেষণে এক হাজার বিঘার
চষা ভুঁই, ভাঙনের ঢলে চিরতরে ভেসে গেলে;
করিম আলীর থ্যাবড়া দন্তহীন মুখের চোয়াড়ে
চৈত্রের খরায় দগ্ধ ঘোলা স্বপ্ন, চোখের কোটর,
অনাবাদি চোয়ালের, লাঙলের নিরেট কর্ষণ,
খুঁড়ে তোলে বলিরেখা; এইবার দেশ গড়া হবে।

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৬১)

কবি তাঁর কবিতা নির্মাণের প্রতিজ্ঞায় ঘর-গেরস্থালি করতে চেয়েছেন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষের দুঃখ-সুখ, লড়াই-সংগ্রামকে আত্তীকরণ করে। কাউকে অনুসরণ করে কিংবা ভিনদেশি বা ভিনভাষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, নিজস্ব সম্পদের ওপর ভর করে কবি মোহাম্মদ রফিক সাধের অট্টালিকা নির্মাণ করতে চেয়েছেন; যা একই সঙ্গে আধুনিক ও শেকড়মুখী। কারণ, তিনি 'এদেশের ভূমিকে ধারণ ও অবলম্বন করে তিনি কবি-প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন। তাঁর সূচনা ও পথচলা এর মধ্যে কোনো বিরোধ বা প্রশ্ন নেই।' (সৌমিত্র; ২০১১: ৭৮) বরং আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ তাঁর কাব্যচেতনা। দীক্ষিত সাম্যবাদী না-হলেও সাম্যবাদী চেতনার নিরিখে তিনি কবিতায় আনেন জনজাগরণের স্বপ্নকে। ফলে জব্বার, হারু, নারু, খালেক আতর আলী, নকীব বা করিম আলীর

সঙ্গে একাত্ম হন এবং বলতে পারেন, 'আমি ফুল খুব ভালোবাসি, বিশেষত আমি কবি;/ শ্রমিকের দুঃখকষ্টে হাউমাউ জ্বলে ওঠে ক্ষুধা।' (মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৯৭)

সমাজ সচেতনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রূপকথা, লোককাহিনী, ইতিহাস-সচেতনতা, রাজনীতি, শ্রমজীবন ও তাদের জীবনসংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে মোহাম্মদ রফিকের কবিতায়। তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ঢঙে মাঝেমধ্যে আক্রমণও করেছেন দুঃশাসনের ক্রীড়নকদের। অত্যন্ত সুকৌশলে *কপিলা* কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতাতে তুলে আনেন রুশ বিপ্লবের ভুবনখ্যাত প্রসঙ্গ। উপস্থাপন এতই সূক্ষ্ম যে, মনে হয়, এ যেন ভিনদেশী ভূখণ্ডের নয়, এই অঞ্চলের স্থানীয় ঘটনার আন্তরিক বিবরণ। শ্রমিক-মজুরের হাতে সর্বময় ক্ষমতা উঠে এসেছিল ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর। কবিতায় যেন সেই চলচ্ছবিই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে :

ঘুম থেকে মিছিলে মিছিল ভেঙে সোজা রাজপথে
সাপের রক্তের বানে দৃঢ় হাতে পতাকা রাঙাও
এইবার এইবার রাক্ষসী নিপাত যাও যাও...
জাদুমন্ত্রবলে
ডেকে উঠল কাক। কারখানায় বেজে উঠল ভেঁপু।
শীতের সকালে ভেজা রাস্তায় তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ল শ্রমিক
দল বেঁধে কামার কুমোর তাঁতী
খালি পেটে মেঠো পথে চাষি, কাঁধে লাঙল, সাথে দুটো
বুড়ো গাই গরু হাড্ডিসার বাছুর

(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ২৬০)

মোহাম্মদ রফিকের কবিচেতনায় মূলত সামগ্রিক বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ ঐতিহ্য ঠাঁই পেয়েছে স্বতন্ত্র কাব্যভাষার কল্যাণে। ঋণ স্বীকার করে অন্যভাবেও বলা যায়, 'মোহাম্মদ রফিক ব্রাত্য ও প্রান্তের মানুষকে, তাদের জীবনাচরণ এবং নদীতীরবর্তী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্যকেই মূলত তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন।...জল ও জলকেন্দ্রিক মানুষ, সৌন্দর্যচিত্র তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে বর্ণনাত্মক রীতিতে। সে জন্য তাঁর ক্যানভাস বাংলাদেশের নদীতীর অঞ্চলের ব্রাত্যলোকসমাজ, সংস্কার ও মূল্যবোধ। স্বদেশ, নিসর্গ ও বাস্তবতায় তিনি ব্যবহার করেছেন লোকপুরাণ, রূপকথার অনুষঙ্গ এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানান অনুষঙ্গ।' (বায়তুল্লাহ্; ২০০৯: ৫১) তাঁর কবিতাপাঠে বাঙালি হারিয়ে যাবে স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের গভীরে, নিজেকে সামনে আনবে প্রতিবিম্বের মতো, কবিতার শব্দসমূহ হয়ে উঠবে নিজের দর্পণ। ফলে যে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারবে গোটা বাংলাদেশকে, যাকে সে হাতের দুই

পিঠের মতোই জানে, চেনে ও ধারণ করে; যা অবিচ্ছেদ্য কবিসত্তা থেকে, যা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনমানুষের অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য।

ষাটের দশকের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় কবি নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫)। সহজ ও সাবলীল শব্দপ্রয়োগ, তারুণ্যের আবেগমিশ্রিত প্রেম, বঙ্গবন্ধু, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, সমকালীন পরিস্থিতি কবিতার অবয়বে প্রাধান্য পাওয়া তাঁর পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। আবৃত্তিশিল্পীদের কল্যাণে তাঁর কবিতা শ্রোতাপ্রিয়তা ও সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে অন্য অনেক কবির চেয়ে বেশি। তাঁর অনেক কবিতাতে প্রেম ও দ্রোহ চেতনা পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে। মূলত 'উনসত্তরের গণ আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় কবিরা হয়ে উঠলেন পরিচালিত থেকে পরিচালক সত্তা, নিজের ওপর সর্বক্ষণ হুলিয়া ঝুলছে দেখে কবি নির্মলেন্দু গুণ সমগ্র জাতির মুখপাত্র হয়ে নিজ অস্তিত্বের প্রশ্নে ঘোষণা করে ছিলেন *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*।' (সূত্র: সুবল; ২০০৫: ৩৫২) আরেকটি কাব্যনামের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে *না প্রেমিক না বিপ্লবী* (১৯৭২) বলতে চেয়েছেন। আদতে তিনি দুটোই হতে চেয়েছেন তাঁর সমস্ত কাব্যজীবনজুড়ে। তাঁর কবিতাভাষ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার তুমুল প্রভাব লক্ষণীয়। একই সঙ্গে তিনি কাব্যনামে বলেন *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র* (১৯৭৯)। কোনো একটি চেতনায় তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। এই প্রবণতাকে প্রতিভা বিকাশের বিচিত্রগামিতা যেমন বলা যায়, তেমনি তাঁর 'না জাতীয়তাবাদী, না সমাজতন্ত্রী' চেতনাকে তাঁর দুর্বলতা হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, মৈমেয়নসিংহ গীতিকার গীতিকবিদের ভৌগোলিক অঞ্চলে। মফস্বলগন্ধী এই বাস্তবতা তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশিষ্টতা দান করেছে। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা যায় :

> লোককবিদের হৃৎস্পন্দন নির্মলেন্দু গুণের কবিতার শিরায় হাত রাখলেই টের পাই, কিন্তু ঐ লোককবিতারই অনুষঙ্গী দৌর্বল্যগুলোও সেখানে জড়িয়ে থাকে অনিবার্য। তার সাথে যুক্ত হলো তাঁর দীপ্র সংগ্রামিতা, এক পর্যায়ে। মূলত ৭৫-পরবর্তী সময়পর্বে গুণ সহজিয়া স্বরের সাথে মেলালেন ধনুকের টংকার। সমাজতন্ত্রের জন্য আমূল চিৎকার, ব্রীড়াহীন, অনলংকার, সরাসরি প্রকাশভঙ্গি তাঁকে গ্রাস করে নিলো। যা ছিলো মেদুর, সজল ও কামতপ্ত তা হয়ে উঠল তীব্র, রুক্ষ ও ঝলসানো।... প্রথম থেকে শেষাবধি গুণ আশিরনখ রোমান্টিক। প্রেমের কবিতায় আবেগের বহুবর্ণিল সফেনতা, সমাজতন্ত্রের কবিতায় কল্পস্বর্গীয় পয়গম্বরিতা—সর্বত্রই তিনি বাউল, আজন্ম অস্থির, প্রদর্শনকামী, সংরক্ত, মর্ষবিলাসী, স্বমৈথুনানুরক্ত। (আশরাফ; ১৯৯৪: ১২২)

জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করে কবি যখন এই ভূখণ্ডের জনমানুষকেও কবিতার উপাদান হিসেবে গণ্য করেন, তখনই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এদেশের বঞ্চিত-শোষিত-নিপীড়িত মানুষের ওপর।

কৃষক-শ্রমিকসহ কায়িক শ্রম বিক্রীত মানুষগুলোর দুর্দশার চিত্র কবিকে যখন প্রভাবিত করে, তখনই যাপিত জীবনের অত্যন্ত সহজিয়া পথে তিনি সমাজতান্ত্রিক চেতনায় 'তাদের' মুক্তি খোঁজেন। এই 'তাদের' মুক্তি মানেই নিজেদের মুক্তি। কারণ, 'তাদের' অবদান ছাড়া, 'তাদের' আত্মত্যাগ ছাড়া, 'তাদের' লড়াই-সংগ্রাম, পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত সামগ্রিকভাবে জাতীয় মুক্তি সম্ভবপর নয়। কীভাবে শ্রমজীবী মানুষের হাতের আঙুলগুলো অস্ত্র ধরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল মুক্তিসংগ্রামে নিজেদের সঁপে দিয়ে সেই গল্প বলেছিলেন তিনি প্রতীক-সংকেত-চিত্রকল্প ও ঐতিহ্যসমেত। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার ভিন্নপাঠ যেন আরও বেশি অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে উঠেছে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত *না প্রেমিক না বিপ্লবী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাটিকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারকচিহ্ন হিসেবেও বিবেচনা করা যায় :

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,
যারা কবিতা লিখতো মধ্যরাতে, সেইসব চাষী,
সেইসব কারখানার শ্রমিক, যারা ইস্পাতের
আসল নির্মাতা, যারা তৈরি করতো স্নো-বিস্কিট,
আমার জন্য শার্ট নীলিমার জন্য শাড়ি, তারা এখন
অন্য মানুষ, তাদের বাড়ি এখন প্রতিরোধের দুর্গ।...
কাঠের লাঙল ফেলে লোহার অস্ত্র নিয়েছে হাতে,
কপালে বেঁধেছে লালসালুর আকাশ...
যারা গান গাইতো, বাঁশিতে আঙুল রেখে
যারা কবিতা লিখতো রাতে, সেইসব চাষী
আজ যুদ্ধের অভিজ্ঞ-কৃষক।

(গুণ; ২০২০: ৪৮-৪৯)

নির্মলেন্দু গুণের বেশকিছু কবিতায় যুদ্ধ, দেশপ্রেম, ঐতিহ্য, রোমান্টিকতা—সব অভিন্ন হয়ে প্রকাশিত হয়েছে শ্রমজীবীদের স্বমহিমায়। কোনো কোনো সময় নিতান্ত প্রেমের কবিতাতেও তিনি শ্রমিকের আত্মত্যাগী মানসিকতা সংকেতিত করেছেন। যেমন: 'তোমার প্রেমের স্পর্শ/ গ্রহণ করেছি বুকে-পিঠে,/ যেমন অগ্নি দাহ/ চুল্লির, চিমনীতে পোড়া ইটে।' (গুণ; ২০২০: ৯৩) তাঁর কবিতায় বিপ্লব ও প্রেমের মিশ্রিত প্রকাশ কখনো পাঠককে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। ষাটের দশকের অন্যতম কবি হিসেবে কৃষক ও শ্রমিককে নিয়ে কবিতা নির্মাণে তাঁরও রয়েছে স্বকীয়তা। আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা, রোমান্টিকতা প্রকাশের সারল্য, দেশপ্রেম তথা জনমানুষের প্রতি প্রতিজ্ঞা তাঁর কবিতাকে পাঠকনন্দিত করেছে। রাজনীতি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সচেতনভাবে এসেছে। আর তা এসেছে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনার ওপর ভর করে সমাজতন্ত্রের স্বাপ্নিক প্রত্যাশা থেকে।

অবশ্য যখন তিনি শ্রমজীবীকে অত্যন্ত আপন ভাবনায় উচ্চকিত করেন, তখন তাঁকে কখনো নজরুল-দিনেশ-সুভাষ-সুকান্তদের মতো সাম্যবাদী কবির উত্তরসূরি বলে মনে হয়। কিন্তু সেই ধারায় ধাবমান না থেকে তিনি মাঝেমধ্যেই চকিতে হারিয়ে যান অন্য ভুবনে। ফলে কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রতিজ্ঞায় অটল তাঁকে কখনোই মনে হয় না। তাই তাঁর কবিতা কৃষকের-শ্রমিকের বেদনা এবং সীমিত সামর্থ্যের মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা যায়. 'একদিকে সে প্রেমিক, রমণপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক, নারীর সৌন্দর্য ও শরীরের প্রতি আগ্রহী। অন্যদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু প্রেম ও রমণীর সান্নিধ্য-আকাঙ্ক্ষার ফলে এই সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে সে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে।' (রফিকউল্লাহ; ২০০২: ১৬৩) ফলে কবিমনের দ্বৈতরূপ উন্মোচিত হয়।

দ্বিধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নির্মলেন্দু গুণকে সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শতভাগ নিবেদিত কবি হিসেবে এবং পোড়খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের কবি হিসেবেও স্বতন্ত্রভাষ্যের কীর্তিমান কবি হিসেবে সহজেই আলাদা করা যায়। কারণ, 'ব্যক্তির যে আত্ম-উন্মোচন কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য, তা ব্যক্তির আত্ম-সামাজিকীকরণেরই নামান্তর। কবিতা এই আত্ম উন্মোচনের শিল্পসম্মত একটি প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে কেবল সামাজিকই হতে চায় না ব্যক্তি, নিজের অনুভব-উপলব্ধিকে অপরের চেতনায়ও সঞ্চার করতে চায়।' (রফিকউল্লাহ; ২০০৭: ১১) এই 'অনুভব-উপলব্ধিকে' সঙ্গে নিয়েই গুণ তাঁর কবিতার জগতে শ্রমজীবী, বিশেষত কৃষকদের প্রতি আলাদা মমত্ব প্রদর্শন করেন এবং কবিতায় চিত্রিত করেন "কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে আলাপ"। ফেলে আসা গ্রামীণ জনপদের অতি চেনা বৃদ্ধ হরিপদ, রহিম আলি, ব্রজেন সাধুদের স্বজন হয়ে তিনি বলেন তাদের নিত্যদিনের আচার-অভ্যাস, দুঃখ-আনন্দের কথা। কবি যেন শহুরে মধ্যবিত্তের অংশ হলেও তারা রয়ে গেছে আগের হৃদ্যতায়। তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা অবিচ্ছিন্ন নাড়ির যোগ উপলব্ধি করেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন :

> কেউ নিড়ানি চালায় রবিশস্যে, সবাই কিছু না কিছু মরিচের চাষ
> করেছে এবার;—কেউ সর্ষে, কেউ সয়াবীন।
> অনেকগুলো খুরপি চালানো হাত থেমে যায় আমাকে দেখেই।
> বৃদ্ধ হরিপদ তখন ক্ষেত থেকে গোরাটে উঠে আসে।...
> সন্ধ্যা হয়ে আসে, রোদ পড়তে পড়তে ঝিলের পাতার জলে নেমে যায়
> ওদের ক্লান্ত অবসন্ন শীতার্ত মুখে অন্ধকার ছায়া ফেলে।
>
> (গুণ; ২০২০: ১৩৮)

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় আহত কবি লেখেন "সেই রাতের কল্পকাহিনী"। পনেরো আগস্টের সেই দুর্বিষহ ঘটনাটি কবিতার চিত্ররূপে ধরা পড়েছে জীবন্ত হয়ে। অত্যন্ত পাঠকপ্রিয় এই কবিতায় শ্রমিকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ এনেছেন কুশলী শিল্পীর মতো। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে বলেছেন, তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়/ বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য/ একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।' (গুণ; ২০২০: ১৪৪) *তার আগে চাই সমাজতন্ত্র* (১৯৭৯) কাব্যনামে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রত্যাশা জাগিয়েও কবি ঠিক এর সব কবিতায় শ্রমজীবীদের কথা কিংবা সামাজিক সাম্যের কথা বলেন না। এমনকি কাব্যনামের অভিন্ন শিরোনামের কবিতাতে স্থান পেয়েছে কবি-হৃদয়ের এক প্রেমিকার প্রতি অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমিক-পুরুষ হিসেবে তার প্রত্যাশা পূরণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। এই কাব্যের "নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ" শীর্ষক কবিতায় একজন শ্রমজীবী, একজন ঘর-হারানো খেটে-খাওয়া মানুষের ব্যথিত হৃদয়ের চলচ্ছবি উঠে এসেছে। পরবর্তী সময়ে কবিতাটির চলচ্চিত্রায়ণও ঘটেছে। হতদরিদ্র পরিবারে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে, যেখানে একজন শ্রমিক তার জীবনভর শ্রম বিক্রি করেও কখনোই স্ত্রীর উদরের চাহিদা পূরণ করতে পারে না; পারে না অনটনের সংসারে হাসি ফোটাতে। এই ব্যর্থতার দরুণ স্ত্রী-বিয়োগ হলে তার হাহাকার জগতের যেকোনো মানবহৃদয়কেই স্পর্শ করে। কিন্তু সমাজের কি কোনো দায় নেই? এই প্রশ্নই যেন বড় হয়ে ওঠে কবিতায়। নেকাব্বর তেমনই শাশ্বত এক শ্রমিক চরিত্র, যার আর্তনাদে সিক্ত হয় সবাই :

ফাতেমার মতো ফাঁকি দিয়ে সময় গিয়েছে ঢের চলে।
কারা যেন ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে সব শক্তি তার।
বিনিময়ে দিয়ে গেছে ব্যাধি, জরা, দুর্বলতা, বক্ষে ক্ষয়কাশ;
অনাদরে, অনাহারে কবরে ডুবেছে সূর্য, ফাতেমার তিরিশ বছর।
এখন কোথায় যাবে নেকাব্বর?
হয়তো গিলেছে নদী তার শেষ ভিটেখানি, কবর ফাতেমা,
কিন্তু তার শ্রম, তার দেহবল, তার অকৃত্রিম নিষ্ঠা কারা নিলো?
আজ গোধূলিবেলায় এই যে আমার পৃথিবীকে মনে হলো পাপ,
মনে হলো হাবিয়া দোজখ; কেউ কি নেবে না তার এতুটুক দায়?

(গুণ; ২০২০: ১৫৩)

কিছু কাব্যগ্রন্থ ও কবিতায় নির্মলেন্দু গুণ শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি শতভাগ নিবেদন করেছেন। যেন তিনি তাদেরই প্রতিনিধি। তেমনই আরেকটি কাব্যগ্রন্থের নাম *চাষাভুষার কাব্য* (১৯৮১)। এই গ্রন্থে তিনি যেমন করেছেন সমাজ সংস্কারক "বিদ্যাসাগর বন্দনা", তেমনি রুশ বিপ্লবের নায়ক "লেনিন বন্দনা"। কীর্তিমান দুই দিগন্তের দুই ব্যক্তির ভিন্ন আলোকবর্তিকা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে ভিন্নভাবে। তবে "লেনিন বন্দনায়" তিনি মানবমুক্তির এক মহানায়ক হিসেবে তাঁর স্তুতি করেছেন। কিন্তু কেন স্তুতি করেছেন, তা-ই যেন স্পষ্ট হয়েছে "প্রলেতারিয়েত" নামক কবিতায়। যেন কেবল লেনিন নন, একজন আদর্শ রাজনৈতিক নেতা, যিনি সমাজের শ্রমিকের কল্যাণে, কৃষকের সংকট উত্তরণে অহর্নিশ থাকবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তিনি যেন 'শর্তসাপেক্ষ' সেই জয়গান গেয়েছেন। কারণ, শ্রেণিহীন সমাজের প্রতিনিধিদের আমরণ দুঃখলাঘবের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী কবি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নবীজ বপন করতে চেয়েছেন। তেমন নেতৃত্বেরই কবি সমর্থক। কবিচৈতন্যের এই পর্যায়ে দেখে মনে হয়, 'গ্লাসনস্ত পেরেস্ত্রোইকা-গর্বাচেভ চক্রের আঁতাতবাদী উল্লাসে লেনিনের মূর্তি ও স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে পড়লেও এখনো প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁর সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদে, মানুষের অজেয় উত্থানে।' (সূত্র: মিন্টু হক; ২০১৫: ১৮৮) তাই তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পায় তেমন নেতার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন :

যতক্ষণ তুমি কৃষকের পাশে আছো
যতক্ষণ তুমি শ্রমিকের পাশে আছো
আমি আছি তোমার পাশেই।
যতক্ষণ তুমি মানুষের শ্রমে শ্রদ্ধাশীল
যতক্ষণ তুমি পাহাড়ী নদীর মতো খরস্রোতা
যতক্ষণ তুমি পলিমৃত্তিকার মতো শস্যময়
ততক্ষণ আমিও তোমার।
এই যে কৃষক বৃষ্টিজলে ভিজে করছে রচনা
সবুজ শস্যের এক শিল্পময় মাঠ,
এই যে কৃষক বধূ তার নিপুণ আঙুলে
ক্ষিপ্র দ্রুততায় ভেজা পাট থেকে পৃথক করছে আঁশ;

(গুণ; ২০২০: ১৫৯)

এসবের বাইরে কবি শিশুশ্রম নিয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে বলেছেন এ কবিতায়। শিক্ষাবঞ্চিত, ন্যূনতম খাদ্যবঞ্চিত হয়ে শ্রমজীবনকে বেছে নেয় সমাজের 'প্রলেতারিয়েত' শিশুরা। এই অন্যায় শিশুশ্রমের বিরোধিতা করেছেন কবি। ছিন্নমূল মানুষের বাস্তব সংকট ও সংগ্রাম যে কবি প্রত্যক্ষ করেন অত্যন্ত সচেতন ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, তা-ই স্পষ্ট হয়; বিশেষত যখন তিনি বলেন :

আমি তোমার বিজয়গাথা করবো রচনা প্রতিদিন।
সেই শিশু শ্রমিকের কথা তুমি বলো, যে তার
দেহের চেয়ে বেশি ওজনের মোট বয়ে নিয়ে যায়,
ব্রাশ করে জুতো, চালায় হাঁপর, আর বর্ণমালাগুলো
শেখার আগেই যে শেখে ফিল্মের গান,
বিড়ি টানে বেধড়ক।...
যতক্ষণ তুমি দৃঢ়পেশী শ্রমিকের মতো প্রতিবাদী
যতক্ষণ তুমি মৃত্তিকার কাছে কৃষকের মতো নতমুখ
ততক্ষণ আমিও তোমার।

(গুণ; ২০২০: ১৬০)

মধ্য সত্তর থেকে আশির দশক অবধি ছিল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য এক ঘোর অমানিশার কাল। জনগণের প্রতিনিধির বদলে রাষ্ট্র পরিচালনায় তখন সামরিক বাহিনীর দখলদাররা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি তখন রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অভিভাবকহীন জনগণের হয়ে কবি মনোনিবেশ করছেন সাম্যবাদী কাব্যচর্চায়। বিপ্লব আর বিপ্লবাত্মক পন্থা ছাড়া কবির সম্মুখে তেমন বিকল্প নেই। একদা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত বিপ্লবী চেতনার গ্রন্থপাঠের স্মৃতিচারণা করে কবি রচনা করেছেন “লাল মলাটের বইগুলি”। এই প্রকাশনাগুলো তৎকালীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে শ্রমিকের অধিকারের প্রতি সরব হতে। কবিচেতনায় সমৃদ্ধি আনা সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে :

এই লাল জানে সর্বহারার
কাস্তে-হাতুড়ি-চাঁদের ছন্দ,
বুর্জোয়া সব করে কলরব
তোলে শিল্পের বাতিল দ্বন্দ্ব।...
কমরেড লাল চেতনার রঙে
রাঙা রক্তিম বিশ্বের,
পদধ্বনির বাজে আমার রক্তে
হুংকার শুনি নিঃস্বের।
বুঝি মজুরের কিষাণের হাতে
ঝলমল করা খড়্গের,
দিন আসে ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ
কাঁপে ঈশ্বর স্বর্গের।

(গুণ; ২০২০: ১৬১)

কবিতার অন্দরে এবং বহিরাবণে শ্রমজীবনকে উদ্ভাসিত করতে অত্যন্ত সাবলীল শব্দপ্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। অন্যত্র “শ্রমিক ও ঈশ্বর” কবিতার নামে বলতে চেয়েছেন, একজন শ্রমিকের জন্য উপাসনালয়ে ঈশ্বরকে খোঁজার চেয়ে ‘দিনের কাজের শেষে একটি আধুলি পাই হাতে/ ভালোবেসে পুজো করি, তাকে ঈশ্বর ভাবি রাতে’ উপলব্ধি বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনস্পর্শী বলেই। কেননা, অস্তিত্বের লড়াই, দিনমান তার সংগ্রাম ওই ‘আধুলির’ জন্যই। কেবল শব্দচয়নে নয় কবিতার গাঁথুনিতে একজন শ্রমিকের দিনব্যাপী লড়াইকে অনায়াসে চিত্রিত করতে পারেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। শ্রমিকদের জন্য জীবনমান ও জীবনসংগ্রামকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করলেই কেবল ভাবতে পারেন এবং পাঠককে আলোড়িত করতে “এক রিকশাচালকের গল্প” কবিতায় বিন্যস্ত করতে পারেন শিল্পিত শব্দমালায় :

ক্রিং ক্রিং শব্দে ছন্দ তুলে তুমি ছুটবে দুপুরবেলা জুড়ে
খোয়া ওঠা সরু পথ ধরে। তোমার পিঠে ঘাম, পায়ে ফোস্কা,
আহা হঠাৎ একটু বৃষ্টি যদি নামে? লুঙ্গি থেকে ভেসে আসা
পেচ্ছাপের ঘ্রাণে কুঞ্চিত-নাসিকা যাত্রী দেখে দেখে
হঠাৎ পড়বে মনে তোমার ঐ কালো কুচকুচে ছেলেটির কথা।

(গুণ; ২০২০: ১৬৫)

কখনো সময়ের তাড়নায়, কখনো ব্যক্তিগত বোঝাপড়ায় অথবা সাধারণ মানুষের প্রতি প্রবণতাজনিত আকর্ষণের কবিগণ সমাজের প্রতি, বিশেষত শোষিত-নিপীড়িত পেশাজীবী কিংবা শ্রমজীবীদের প্রতি অকৃত্রিম দায়িত্ব অনুভব করেন। ফলে যারা সভ্যতার গতিপথ সচল রাখে, তাদের প্রতি কবিগণ বাড়তি কর্তব্যবোধ দ্বারা উজ্জীবিত হন। *চাষাভুষার কাব্য* (১৯৮১) যেন তেমনই এক প্রতিশ্রুতির ফসল। সময়টা আশির দশক বলেই হয়তো তিনি এত বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তখন দুই সামরিক শাসকের সন্ধিক্ষণ। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও তখন ভগ্নদশায় পর্যবসিত। অন্যদিকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত শ্রমজীবী এবং তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখতে দেখতে নিরুপায় কবির খেদ ব্যক্ত হয় হতাশার সুরে :

ধানের হাসি মাঠের হাসি চাষীর হাসি নয়,
চাষীর বুকে চিরকালের দুঃখ নদী বয়।...
সভ্যতাকে বন্দী রেখে কতিপয়ের হাতে
চাষাভুষার কাব্য লিখে লাভ কি হবে তাতে?...
জীবন থেকে নিঃস্ব হাতে ফিরে যাবার আগে

যাদের বুকে মাঠের ছবি কাবা'র মতো জাগে
চাষাভুষার কাব্যে তুমি লিখো তাদের গান
দিয়ো তাদের রোজহাসরে বীরের সম্মান।
মাটি যেথায় লেখার খাতা, কলম যেথায় ফলা,
রক্ত যেথায় কবির কালি, সেই তো শ্রেষ্ঠ কলা।

(গুণ; ২০২০: ১৬৭)

লেনিনের রাজনৈতিক কর্মকৌশল দ্বারা উজ্জীবিত কবি সমাজ পরিবর্তনে কৃষক-শ্রমিকের ভূমিকাকে উচ্চকিত করতে চান এবং কতিপয় পুঁজিপতির প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। এর বিপরীতে কবিতার শব্দমালায় প্রকাশ করতে মনের গহিনে একধরনের স্ফুলিঙ্গ তিনি ধারণ করেন। তাই তিনি স্বপ্ন দেখতে চান সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার। তাই বলতে থাকেন :

আমার কবিতা চাষাভুষাদের
স্বার্থে শানানো নিপুণ অস্ত্র,
আমার কবিতা আকাশের তারা
বুঁটি কাজ করা তাঁতের বস্ত্র।
আমার কবিতা তাদের জন্য
যাদের গায়ের বিদ্রোহী ঘাম
এই ধরণীর ধূসর ধুলায়
লেখে প্রত্যহ সাম্যের নাম।

(গুণ; ২০২০: ১৬৯)

এই কবিতাতেই কবি সরাসরিভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন। তাঁর কবিসত্তা, তাঁর সৃষ্ট কবিতা যে সেই আস্থা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিশ্রুতিরই চিরকালীন ফসল। নির্মলেন্দু গুণ যে কাব্যপ্রতিমা নির্মাণের চেয়ে কাব্যভাষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেই অধিক মনোযোগী, সেই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। বিশেষত যখন তিনি বলেন, 'আমার কবিতা বাক্যেশ্বরী/ অনিবার্য সে বাঁচার মন্ত্র,/ আমার কবিতা সর্বহারার/ মুক্তিসনদ, সমাজতন্ত্র।' (গুণ; ২০২০: ১৬৯) শুধু তা-ই নয়, "তাঁর একটি খোলা-কবিতা"তে শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি যে পুঁজিবাদী সমাজব্যস্থায় সম্ভব নয়, সেটিও বলেছেন কোনো রাখঢাক না রেখে, 'পুঁজিবাদী শোষণের পথ খোলা রেখে/ সম্ভব নয় প্রকৃত মুক্তির স্বপ্ন দেখানো।' (গুণ; ২০২০: ২০৮) সম্ভব নয় বলেই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। রাশিয়া সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে তিনি তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন নিজের জন্মভূমিকে, যা সামরিক জান্তার কবলে পড়ে মানুষের অধিকার হারাতে বসেছে। সুতরাং তার সামনে যেন বিপ্লবের বিকল্প নেই। ভলগার বিশালতা এবং বিপ্লবী লেনিনের দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিকে একসঙ্গে এনেছেন কবিতার নামকরণে। তাই "ভলগা ও লেনিন" কবিতায় সোজাসুজি বলেছেন :

আজ বিপ্লবের লালচেলি পরেছে রাশিয়া
কাল তার বিজয় উৎসব।
দুঃসহ শোষণে শীর্ণ স্বদেশ আমার
তার গায়ে বিধবার শতচ্ছিন্ন শাড়ি;
তীরে জীর্ণবাস অপুষ্ট শ্রমিক,
বুভূক্ষু কৃষক আর ভাঙা ঘর-বাড়ি।

(গুণ; ২০২০: ২১০)

লক্ষণীয়, সাধারণ মানুষের ভাবনা থেকেই নির্মলেন্দু গুণ শ্রমিকের চিন্তায় বিভোর থাকেন এবং তাদের মুক্তি প্রত্যাশায় বুক বাঁধেন। আশিক দশকের সামরিক শাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কবি সারা বিশ্বের নিপীড়িত-বঞ্চিত শ্রমিকের প্রতিনিধির মতো করে যেন আর্তনাদ করছেন; ইতিহাসের ধারাবাহিক নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, 'আমরা ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের ক্ষুধা,/ আমরা ইতিহাস-খ্যাত দুনিয়ার মজদুর।' এই অবস্থা থেকে ক্রমশ উত্তরণ প্রয়াসই কবি গুণের কাব্যচিন্তার বিশাল অবয়ব দখল করে আছে। তাই বাণী-চিরন্তনের মতো করে সভ্যতা বিনির্মাণে যাদের অবদান অনস্বীকার্য, তাদের স্তুতি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে কবি বলেন, 'শুন হ শ্রমিক ভাই/ সবার উপরে শ্রমিক সত্য/ তাহার উপরে নাই।' (গুণ; ২০২০: ২৩৯-২৪০) নিজেকে শ্রমিকদেরই উত্তরসূরি মনে করেন কবি। যে-কারণে তাঁর বলতে দ্বিধা হয় না, 'আমি ভূমিহীন, ভাগ্যসূত্রে নাগরিক কবি।/ কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বটে, কিন্তু/ অনাগ্রহী ভগ্নস্বাস্থ্যদোষে...।' (গুণ; ২০২০: ২৯৭) কিন্তু শ্রমিকদের যে পুঁজিবাদী সমাজের নিয়ন্ত্রণেকরা আধুনিককালেও দাসের মতোই ব্যবহার করে। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন দাসানুদাস হয়েই থাকে, তার বন্দোবস্ত করতে শাসনপ্রক্রিয়ার নানা কসরতের যেন শেষ নেই। সেই শ্রমিকদের তিনি "দাসবংশ" বলেছেন। নিজেকেও তাদের সঙ্গে একাত্ম করে অত্যন্ত মনোবেদনা নিয়ে তিনি তুলে এনেছেন এক নির্মম সামাজিক বাস্তবতাকে। যেমন :

কৃষকের হাড্ডি জল-করা পিঠের চামড়া-পোড়ানো পাট,
আর ম্যান পাওয়ারের ছদ্মবেশে অগণিত সহজলভ্য দাস
বিদেশে পাচার করে, তেল চকচক গাড়ি, ফ্রিজ, রঙিন-টিভি
ও অলিভ অয়েল এনে মালিশ করেন যখন যেখানে খুশি
মন চায়; ভয় নাই, আমরা আছি, দাস বংশ, নফর গোলাম,
মেধাহীন কৃমিকীট আপনাগো দ্বীনের সেবায়।

(গুণ; ২০২০: ৩০৬)

এই ভূখণ্ডের কৃষক-শ্রমিকের হাজারো বঞ্চনার পরও তারা যেমন মানুষের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ করে না, তেমনি সংকট ও সংগ্রামকে মেনে নিয়েও তারা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সেখানেও প্রেম থাকে, খুনসুঁটি থাকে, দাম্পত্য জীবনের অপরিহার্য দুঃখ-আনন্দ থাকে। তারা ভূমিহীন অথচ কৃষক; নিজস্ব জমি নেই, কিন্তু অন্যের জমিতে চাষবাস করেই জীবন কাটে। কিংবা আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে কোনো পুঁজিপতির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে সর্বস্ব। এমন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত কবিতা “ক্ষেতমজুরের কাব্য”। একই সঙ্গে বেদনা, অপ্রাপ্তি, খুনসুঁটি এবং মানিয়ে নেওয়ার আত্মপ্রবোধ ব্যক্ত হয়েছে কবিতাটির অসাধারণ শব্দচয়নে :

মুগুর উঠছে মুগুর নামছে
ভাঙছে মাটির ঢেলা,
আকাশে মেঘের সাথে সূর্যের
জমেছে মধুর খেলা।...
মেঘ দিল ছায়া, বনসঙ্গমে
পুরিল বধুর আশা;
মনে যাই থাক, মুখে সে বলিল:
‘মরগে বর্গা চাষা।’...
শব্দটি তার বক্ষে বিঁধিল
ঠিক বর্শার মতো।
‘এই জমিটুকু আমার হইলে
কার কিবা ক্ষতি হতো?’
কাতর কণ্ঠে বধূটি শুধালো:
‘আইছ্যা ফুলির বাপ,
আমাগো একটু জমি হবে না?
জমিন চাওয়া কি পাপ?’...
পরম সোহাগে কৃষক তখন
বধূর অধর চুমি,
হাসিয়া কহিল: ‘ভূমিহীন কই?’
‘আমার জমিন তুমি।’

(গুণ; ২০২০: ১৮৭-১৮৮)

বিচিত্র বিষয়ে রচিত নির্মলেন্দু গুণের কবিতার সংখ্যা বিপুল। ষাটের দশকের অন্যান্য কবির তুলনায় তাঁর কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ এসেছে স্বতন্ত্র কায়দায়। তিনি নিজেকে কখনো কৃষক-শ্রমিকের সঙ্গে নিজের সৃষ্টিশীল বোধকে একাত্ম করেছেন, কখনো তাদের বঞ্চনার কথা ভেবে নিজে আলোড়িত হয়েছেন, পাঠককে আলোড়িত করেছেন স্বকীয় শব্দযোজনায়। কৃষক-

শ্রমিকের অধিকারের প্রসঙ্গে তিনি সোচ্চার হয়েছেন; হয়েছেন বেদনাহতও। পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টি-রঙিন প্রতিষ্ঠায় যে শ্রমজীবীদের মুক্তি নেই, তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে কেবল সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, সে বিষয়টি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শিল্পিত হয়েছে। শ্রমিকদের প্রতি অসীম অকৃত্রিম দরদ নির্মলেন্দু গুণের কবিতাকে আলাদা মাত্রা দান করেছে।

আবিদ আনোয়ার ষাটের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি। শব্দের ওপর অগাধ দখল, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে সুনিপুণ, কাব্যভাষায় স্বকীয় প্রসাদগুণ আনয়নের অত্যন্ত দক্ষ কারিগর তিনি। শব্দের কলাকৌশল রূপকল্প ও চিত্রকল্প নির্মাণে কত সাবলীলভাবে নান্দনিক শিল্পমান নিশ্চিত করতে পারে, তা আবিদ আনোয়ার নিশ্চিত করেন অনায়াসে। ষাটের দশক থেকে বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সাময়িকীগুলোতে কবিতা প্রকাশে নিয়মিত হলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তুলনামূলক বিলম্বে। *প্রতিবিম্বের মমি* তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। পরের কাব্যসমূহ প্রকাশিত হয় নব্বই দশকের পরে। নিভৃতচারী ও মুক্তিযোদ্ধা এই কবি বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যের পূজারি। বস্তুজগতের বিচিত্র বিষয় তাঁর কবিতার উপাদান হিসেবে স্থান পায়। চিত্রকল্পকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি কখনো কখনো নিরীক্ষাধর্মী কবিতা রচনাতেও মনোনিবেশ করেন। তাঁর বহু কবিতা শিল্পসার্থক রয়েছে, যেগুলো কেবল অনন্য চিত্রকল্প নির্মাণের ফলে পাঠকনন্দিত।

বাঙালি উত্তরাধিকার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আবিদ আনোয়ার যখন কেবল বলেন, 'যাদের মাংসল পেশী সুলতানের নিবিড় তুলিতে/ তাদেরই উত্তরসূরী আমি এই বিবর্তিত অধুনা প্রজাতি/ লোলচর্ম হয়ে আছি সময়ে কঠিন সংকটে' (আবিদ; ২০১৫ : ১৫), তখন চিত্রকল্প রূপায়ণের জন্য যেমন আলাদাভাবে শব্দ অপচয় করতে হয় না, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ চিত্রিত করার জন্যও পৃথক উদ্যোগ নিতে হয় না। আবার তিনি সুলতানের চিত্রশিল্পের সেই চিরায়ত মানুষদেরই উত্তরসূরি, তারও আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এমন মিতব্যয়ী শব্দবোদ্ধা কবি বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্যে বিরল। তেমনই অমিত দক্ষতায় তিনি রচনা করেন "হরিপদ'র দিনরাত্রি"। কল্পিত হরিপদ পেশায় জেলে। নদীর বুকে ভেসে থেকে আহরণ করা একেকটি মাছ তাকে স্বপ্নালু করে তোলে। কিন্তু সমস্ত দিনরাত শ্রম ব্যয়ের পর তার সেই ছেঁড়া জাল আর ভাঙা নৌকাও যেন নিয়তির শেষ কথা। তার প্রেমাস্পদকে সে আশ্বস্ত করলেও তার সে সামর্থ্য আর হয় না। এমনই অনটনের সংসারে ভোগা ধীবরের মনোবেদনায় আত্মলীন হয়েছেন কবি। প্রাণবন্ত চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে কবি যেন জীবন্ত করে তোলেন পুরো এক জীবন :

তরল হীরের নদী, সোনারঙ নৌকো দোলে দূরে—
স্বেচ্ছায় লাফিয়ে পড়ে ঝাঁক-ঝাঁক রুপালি ইলিশ...

সহসা স্বপ্নের ঘোরে হেসে ওঠে হরিপদ জেলে:
দেখে সে গঞ্জের হাটে আজ বড়ো ক্রেতাদের ভিড়,
নিবিড় ছায়ার মতো মলিনার চোখ মনে পড়ে,
বলে "ও জাইল্লার মেয়ে, আর ক'ডা দিন,
আগামী আশ্বিনে তোরে ঘরে তুলি নিমু..."
অথচ কোথায় ঘর!
স্বপ্নফেরা হরিপদ নিয়তির ঘাটে
ফুটো নৌকা, ছেঁড়া জাল নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
(আবিদ; ২০১৫: ১৭-১৮)

আবিদ আনোয়ার অত্যন্ত শিল্পসচেতন কবি হলেও সমাজভাবনা কখনো কখনো তাঁকে কাতর করে তুলেছে। সংখ্যায় কম হলেও ভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনাকালেও মাঝেমধ্যে তিনি শ্রমজীবীদের চিরায়ত জীবনসংগ্রামকে নির্মোহভাবে চিত্রিত করেছেন। যেমন শামসুর রাহমানের "স্বাধীনতা তুমি" কবিতার ছন্দানুকরণে রচিত "ঈদবিষয়ক পঙ্‌ক্তিমালা"য় সামাজিক বা ধর্মীয়—যে কোনো উৎসবই হোক, তা যে শ্রমিকের জীবনে সুখ বয়ে আনে না, সে-বিষয়টি অত্যন্ত নিবিড় ও সূক্ষ্মভাবে তুলে এনেছেন। তাঁর কাব্যবুননের দক্ষতা কারখানাশ্রমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবীদের নিরন্ন অবস্থার বাস্তবানুগ স্বরূপ যেন পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।

ঈদ তুমি বুড়ো জমিরের চোখে বছরে দু'বার সুরমা।
হা-করা হাঁড়ির বিরান হেঁসেলে খুশিখুশি সুকানু'র মা।।...
ঈদ তুমি দীন-ভিখিরির গূঢ় স্বপ্নে জমানো ফেৎরার টাকা
নিয়নশোভিত আলোকোজ্জ্বল মাতাল নগরী ঢাকা।
ঈদ তুমি চির এভিনিউবাসী নুলো-ঠুঁটোদের উল্লাস।
টার্মিনালের টইটুম্বুর দেশে-ফেরা মিল-শ্রমিকের বাস।।
(আবিদ; ২০১৫: ২৪)

বাংলাদেশের কবিতায় অত্যন্ত মিতবাক এবং অল্পসংখ্যক কবিতা রচনা করেও আবিদ আনোয়ার স্বতন্ত্র আসন তৈরি করতে পেরেছেন। অত্যন্ত আধুনিকমনস্ক এই কবি কবিতাযাপনে শতভাগ বাঙালির উত্তরাধিকারী। আবহমান বাঙলা ও বাঙালির কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি কাব্যবুননে নতুনত্ব এনেছেন এবং নিজস্ব উপায়ে কবিতাকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

গত শতকের ষাটের দশকে নব্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নতুন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার ঝোঁক বাড়তে থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব কবিরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। হয়তো সে-কারণেই তাঁদের সৃষ্টিতে গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক পেশাজীবন আস্তে

আস্তে উপেক্ষিত হতে থাকে। তাই পঞ্চাশের দশকের বেশির ভাগ খ্যাতিমান কবির মতো ষাটের দশকের কবিদের ক্ষেত্রেও সামগ্রিকভাবে বলা যায়, কবিতার প্রধান প্রবণতা হিসেবে কোনো কবির ক্ষেত্রেই কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অগ্রাধিকার পায়নি। তবে স্বকীয় দর্শনকে কবিতার শিল্পমাধ্যমে প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনো কোনো সময় কবিদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে স্থান পেয়েছে। কারণ, এ-সময়ের কবিগণকে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তুঙ্গ সময়ের গহ্বরে বসবাস করতে হয়েছে, তেমনি সংগ্রামী চেতনা এবং সৃজনশীল তাড়নাতে কৃষক ও শ্রমিককেও অবলম্বন করতে হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্তরের দশকের কবিতা

বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতার জন্য সত্তরের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তখন স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি দেশের স্বপ্ন ও স্বপ্নপূরণের আনন্দে বিভোর। এর মধ্যেই সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নব্য আবির্ভূত কবিগণ নিজেদের মেধা বিকাশে তৎপর হয়ে উঠেছেন। একদিকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিগণ নতুন করে নিজেদের কবিপ্রতিভাকে শানিত করছেন সময়ের অকৃত্রিম দাবিতে, অন্যদিকে এ-সময়ে কবিতা-ভুবনে আবির্ভূত হচ্ছেন নবীন কবিগণ। স্বাভাবিকভাবেই তরুণ কবিদের মধ্যে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন কবিতার পথ নির্মাণের সম্ভাবনা তৈরি হয়। নাগরিক চেতনায় সফল পূর্বসূরি কবিদের মতো এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিগণের মধ্যে নতুন সেই পথ ও শপথ লক্ষ করা গেলেও কৃষক-শ্রমিকের জীবন তাঁদের খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি। অথচ ষাটের দশকে যাত্রা শুরু হলেও মূলত স্বাধীনতাত্তোর কালেই পোশাকশিল্প বিকাশ লাভ শুরু করে। ফলে শহর ও শহরতলিতে গড়ে ওঠা পোশাকশিল্পের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বিশেষত, সমাজের নানা পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে পোশাকশিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপুল অবদান রাখে। কৃষিশ্রমিকের বাইরে নগরকেন্দ্রিক শিল্পায়নের ক্রমশ বিকাশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করে। আজ অবধি সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। পোশাক খাত বর্তমানে প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি দেশের জনশক্তি রপ্তানির আরম্ভও হয় সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের এই খাতে নানা সংকট ও সীমাবদ্ধতা ছিল শুরু থেকেই। বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনের এ-দুটি খাত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। বাংলাদেশের অর্থনীতি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে এ-দুটি খাত সম্পর্কে যেকোনো সচেতন নাগরিকেরই দৃষ্টিনিবদ্ধ হওয়ার কথা। কারণ, বাংলাদেশের নগরগুলোতে নব্য শিক্ষিত ও উপার্জনে সক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, সচেতন নাগরিক ও মধ্যবিত্তের বিকাশ, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন ইত্যাদির অনিবার্য অংশ এ-শ্রমিক শ্রেণি। অথচ প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো কায়িক শ্রম বিনিয়োগের এ-দুটি খাত নিয়ে শুরু থেকেই রয়েছে শ্রমমূল্য ও মজুরি নিয়ে অসন্তোষ এবং নির্যাতন ও বিবিধ বঞ্চনার অভিযোগ। শ্রমজীবীদের আত্মত্যাগ ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন একে অপরের পরিপূরক। পুঁজিপতিদের শোষণের ঘটনা কিংবা শ্রমিকদের জন্য একটা মানবিক কর্মপরিবেশ তৈরি করতে না

পারার মতো বিস্তর ঘটনা কবিদের মতো সংবেদনশীল মানুষকে প্রভাবিত করার কথা। কিন্তু তার ছাপ খুব একটা পাওয়া যায় না। এ-সময়ের কবিদের অনেকের কবিতা শিল্পবিচারে হয়তো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু তাতে কৃষক ও শ্রমিকজীবনের অনিবার্য সত্য উপেক্ষিত থেকেছে। স্মরণীয় যে, স্বাধিকার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের জুড়ি মেলাভার। কিন্তু এ-সময়ের কবিদের কবিতায় এসব প্রসঙ্গ অনেকটা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। যে-কজন কবির কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন নানাভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে, তাঁরা হলেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১), আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫), ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৫২-২০০৪), সমুদ্র গুপ্ত (১৯৪৬-২০০৮), আবু হাসান শাহরিয়ার (জ. ১৯৫৯) প্রমুখ।

সত্তরের দশকে বাংলাদেশের কবিতার দিগন্ত আলোকিত করা উল্লিখিত কবিগণের মধ্যে কয়েকজন প্রয়াত হয়েছেন, কয়েকজন এখনো কবিতায় সক্রিয় রয়েছেন। এ সময়ের কবিগণের মধ্যে প্রথম প্রয়াত হয়েছেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। কবিতাভূমে তাঁর সক্রিয় আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বাংলাদেশের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার উত্তরসূরি হিসেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। অনেক গবেষক 'ত্রিশোত্তর কবিতার উত্তরসূরি' হিসেবে তাঁদের কবিতা মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন। বাংলা কবিতার বাঁক-বদলে ত্রিশের কবিগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে ধরনের কবিতা সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তা হলো নজরুল-পরবর্তী চল্লিশের দশকের সমাজবাদী ও রাজনীতি-সচেতন কবিতার ধারা। মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনের সংকট, শোষিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনের পারম্পর্য, তাদের চাহিদা ও প্রাপ্তির ব্যবধান ইত্যাদি কবিতার কাঠামোয় উপস্থাপনা করাই শেষ-ত্রিশে আবির্ভূত কবি দিনেশ দাশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চল্লিশের সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের কাব্যচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের মতো করেই বাংলাদেশের সত্তরের দশকে আবির্ভূত কবিগণও কবিতানিষ্ঠ এবং রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের অঙ্গীকার ছিল একই সঙ্গে মানুষের ও শিল্পের কাছে। নিজেকে তাঁরা কখনোই শিল্প থেকে আলাদা করে দেখেননি। মানুষের প্রতি তাঁদের এ অঙ্গীকার ছিল মূলত অনিবার্য সমাজমনস্কতার জন্য। (সূত্র: সাজ্জাদ আরেফিন; ২০১৩: ৩০৭) এ-সময়ের কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্যচেতনা পুনর্জাগরিত সমাজবাদী আদর্শের যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করে শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে। নজরুল-দিনেশ-সুভাষ-সুকান্তর মতো পূর্ববর্তী উত্তরপ্রজন্মের এই কবিও ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন কবি-কর্মী। কখনো কখনো দ্রোহাত্মক চেতনায় তিনি তাঁর কাব্যভাষাকে

উচ্চকিত করেছেন। আর এই সূত্রেই তিনি কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের কথা, উপমায়-রূপকে-চিত্রকল্পে কৃষি ও কৃষককে অকৃত্রিম দক্ষতায় শিল্পিত করেছেন। প্রেমের কবিতাতেও তিনি কৃষি, কৃষক ও খেটেখাওয়া মানুষের নানা অনুষঙ্গ এনে কবিতাকে শিল্পসার্থক করে তুলেছেন। কবি নিজেকে 'শব্দ-শ্রমিক' হিসেবে গণ্য করেছেন। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা অকৃত্রিম ও স্বভাবজাত। মাধ্যমিকে অধ্যয়নকালে রুদ্র প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ। অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি-কর্মী হিসেবে তাঁর চৈতন্য একাত্তরের অভিঘাত এবং তৎপরবর্তী প্রভাবকে লালন করেছে। নয় মাসের দীর্ঘ সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত দেশের মানুষ ক্রমশ তাদের প্রাপ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। একের পর এক স্বৈরশাসন সাধারণ মানুষ তথা শ্রমজীবীদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছিল। রাজনৈতিক ঘটনাবহুল সেই কালপর্ব নিজের ক্ষোভ এবং প্রত্যাশাকে চিত্রিত করতে রুদ্রকে প্রভাবিত করেছে, প্রাণিত করেছে। তাঁর শিল্পীমন আমৃত্যু নিজের স্বপ্নসাম্যময় অভীপ্সাকে শব্দে-বর্ণে-চিত্রে রূপদানে ব্যাপৃত থেকেছে। শব্দচয়নে সারল্য সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টি তাঁর কবিতাকে ভিন্ন স্বাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সমকালীন প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় এনে রাজনীতির নামে অপকর্মের সঙ্গে লিপ্ত ব্যক্তিকেও যেমন তিনি শব্দবাণে বিদ্ধ করেছেন, তেমনি সব অন্যায়-অবিচার প্রত্যক্ষ করেও সচেতন বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের নির্লিপ্ততাকে তিনি কষাঘাত করেছেন তাদের ছদ্মবেশ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। কারণ, তাঁর অন্যতম চাওয়া ছিল বৈষম্যহীন সমাজ।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কিশোরবেলায় প্রত্যক্ষ করেছেন রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ আর কাব্য-অভিযাত্রার শুরু থেকে আমৃত্যু তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। সমাজের অধিকারহীন মানুষের বঞ্চনা তাঁর প্রতিবাদী সত্তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুদ্রর কলম যখন সক্রিয় হয়েছে, তখনই নির্মোহভাবে উঠে এসেছে শ্রমজীবীদের দুর্দশার চিত্র। গণতন্ত্রহীন সমাজে মানুষ বড় একা হয়ে যায়, ভেঙে পড়ে সংঘ-সমিতি-সংগঠন। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম হয় *উপদ্রুত উপকূলে* (১৯৭৯)। নামের মধ্যেই ধরা পড়েছে গভীর বাস্তবধর্মী ব্যঞ্জনা। উপকূল এবং উপকূলের মানুষ ও সম্পদ দুভাবেই উপদ্রুত হয়—মানুষ ও প্রকৃতি দ্বারা।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা মোংলা রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জন্মস্থান। সেখানকার আলো-হাওয়া-মানুষ, মানুষের বেদনা-বিরহ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তাঁকে আলাদা করে জানতে হয়নি। তিনি সেই পরিবেশকে ধারণ করে বেড়ে উঠেছেন। যে-কারণে জ্ঞানার্জন ও কর্মসংস্থানের জন্য তিনি নগরের বাসিন্দা হলেও তিনি উন্মুলিত হননি। তিনি উৎসস্থলকে মনেপ্রাণে সজীব রেখেছেন কিন্তু তিনি কৃত্রিমতার দিকে রূপান্তরিত হননি। ফলে কাব্যগ্রন্থের নাম তাঁর অভিজ্ঞতার

অংশ হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর উপলব্ধি করতে সমস্যা হয় না যে, 'তাঁতকল কেঁদে ওঠে ক্লান্তির আঘাতে,/ রাজপথ বুকে নিয়ে জেগে থাকে একাকি/ বান্ধবহীন এক ইস্পাত শহর।' (রুদ্র; ২০১৪: ২৪) এমনকি তখন সবচেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শ্রমজীবী তথা নিম্ন আয়ের মানুষ। তাই 'ওই কারা সারারাত শিশিরের মতোন/ নিশব্দে চোখ থেকে খুলে রাখে কান্না!' সে-সবের প্রতি কারও কোনো সুনজর থাকে না। তাঁর বিখ্যাত কবিতা "শব্দ-শ্রমিক"। যেকোনো পেশাদার লেখক, যাঁরা কেবল সৃষ্টিশীল রচনাকে পুঁজি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে 'শব্দ-শ্রমিক' ভাবতে পারেন। হয়তো একই দৃষ্টিকোণ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে কলমপেশা মজুর আখ্যা দিয়েছিলেন। রুদ্রও নিজেকে 'শব্দ-শ্রমিক' অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন। কারণ, তিনি শব্দ দিয়ে সেই ইমারত নির্মাণ করতে চেয়েছেন, যা প্রকাশ করবে শ্রমজীবী অধিকারের কথা, তাদের বেদনার কথা, তাদের ত্যাগের কথা, সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের অবদানের কথা। কেননা, তিনি তাদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করতে চান। সংগত কারণে তাঁর পক্ষেই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব :

আমি কবি নই শব্দ-শ্রমিক।
শব্দের লাল হাতুড়ি পেটাই ভুল বোধে ভুল চেতনায়,
হৃদয়ের কালো বেদনায়
করি পাথরের মতো চূর্ন
ছিঁড়ি পরান সে ভুলে পূর্ন।
রক্তের পথে রক্ত বিছিয়ে প্রতিরোধ করি পরাজয়,
হাতুড়ি পেটাই চেতনায়।...
আমি সেই পোড়া ভিত ভেঙে জেগে উঠেছি জীবনে,
আমি সেই কালো ঘোড়ার লাগাম ধ'রে আছি টেনে।
বুকে ভাষাকে সাজিয়ে রনের সজ্জায়,
আমি বুনে দিই শব্দ-প্রেরনা মানুষের লোহু মজ্জায়।।

(রুদ্র; ২০১৪: ২৮-২৯)

রাষ্ট্র যখন স্বৈরশাসকের অধীন পরিচালিত হয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু শ্রমজীবী পড়ে যায় অস্তিত্বসংকটে। রুদ্র সে-বিষয়ে ছিলেন সদা-সচেতন। স্বাধীনতাত্তোর সময়পর্বে বাংলাদেশের মানুষ বহুবিধ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। সেই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে রুদ্রের চেতনা শানিত হয়েছিল নিজের মতো করে বুঝে নেওয়া সাম্যবাদী দর্শনে। সংগতকারণে, সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ না দেওয়া রুদ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পক্ষে। (তপন; ১৯৯৮:

১৫) হয়তো সে-কারণেই 'শব্দশ্রমিক' রুদ্র কবিতায় শব্দকে ব্যবহার করেছেন হাতুড়ি পেটানোর মতো করে। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সেই স্বপ্ন অনিবার্য বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'প্রতিরোধ করি পরাজয়' আর 'হাতুড়ি পেটাই চেতনায়'। কারণ, 'বৃহত্তর জীবন পরিগ্রহণসূত্রে বাঙালি জাতিসত্তার উৎস, প্রত্নরূপ ও ধারাবাহিক প্রবাহের সঙ্গে আত্মসংযোগ গড়ে ওঠে। বিমূর্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে–যেটি লক্ষণীয় ছিল মার্কসীয় চিন্তাদর্শী কবিতার ক্ষেত্রে, কবিতা স্বদেশের ইতিহাসলগ্ন আবেষ্টনীতে দৃষ্টিপাত করে। সৌন্দর্যবোধ, নারীপ্রতিমা, দেশপ্রতীক, নিসর্গচেতনা ইত্যাদি কবিতায় রূপবদ্ধ হয়; আদি কৌমসমাজ, দ্রাবিড় রমণী, চাষবাসের উপকরণ-প্রক্রিয়াদি কাব্যানুষঙ্গরূপে গৃহীত হতে থাকে।' (সূত্র: সাঈদ; ২০০৩: ১৬-১৭) সম্ভবত মার্ক্সবাদী চেতনা লালন করেছিলেন বলেই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে শব্দশ্রমকে রুদ্র প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কারণ তিনি জানেন :

> পাণ্ডুর রমনী দেহে কালো কৃষকের বুকে
> শস্যের সম্পাত নিয়ে একফালি মুগ্ধ চাঁদ
> কাস্তের চিৎকারে দুলে তুলে দেবে নাকি কিছু ফেলে আসা শ্রম,
> শ্রমের ক্ষমতা।
> ক্ষুধার শয্যা পেতে এক মন্বন্তরের ক্ষুধিত শকুন
> মননের হাড় থেকে ছিঁড়ে খায় বোধি, প্রেম, সুস্থতার মাংশ
> (রুদ্র; ২০১৪: ৬০)

ছাত্রজীবনে সাম্যবাদী দর্শনে উৎসাহী হওয়া আর একই সময়ে কবিতাচর্চা করায় দুইয়ের মেলবন্ধন অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর মধ্যে সময়টাও ছিল বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনার বিপরীত। কার্ল মার্ক্স দুনিয়ার মজদুরের মুক্তির জন্য রাজনেতিক তত্ত্ব প্রণয়ন করলেও, এমনকি শ্রেণিসংগ্রাম জারি রেখে 'যুদ্ধের' ডাক দিলেও দুনিয়ার সমস্ত মজদুর যেমন মার্ক্সবাদী নয়, তেমনি মার্ক্সবাদের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে সংগ্রামে শামিল হলেই কেউ মাক্সবাদী হয় না। মার্ক্সবাদী তত্ত্বে যে-কেউ দীক্ষিত হতে পারে, কিন্তু দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ না করলে কেউ কমিউনিস্ট হয় না। সেই সূত্রে কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকেও মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী দর্শনে উজ্জীবিত বলা যায়। কেননা, মার্ক্সবাদের পথ ধরে নিজেদের মুক্তি এবং অত্যাচারীর রাজত্বের অবসান চান। অর্থাৎ তাঁর মতো শ্রমজীবীরাও যেন মনের অজান্তেই মার্ক্সবাদী। কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহও সেই সব মানুষদের বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে রচনা করেন "সাহস" এবং উচ্চারণ করেনঃ 'প্রয়োজন এসেছে আজ জ্ব'লে ওঠো আর্ত মানুষ,/ জ্ব'লে ওঠো বৃক্ষ, গ্রাম, জনপদ, শ্রমিক শহর/ অবরুদ্ধ লোকালয়।' (রুদ্র; ২০১৪: ৬১) এই দুর্বিনীত সাহসই

তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। আর বিশ্বাসই তো সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তাই তিনি শিল্পিত ভাষায় লেখেন "বিশ্বাসের হাতিয়ার"; যেখানে 'নিজের অজান্তেই' মার্ক্সবাদের প্রেরণাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যেন অভয় দিয়ে রুদ্র বলেন :

মৌশুম যায় অনাবাদী জমি প'ড়ে থাকে চাষহীন,
লাঙল আসে না, আসে নর্তকী খেমটা নাচনে ধেয়ে।
ধেনোমদ চায় বিদেশি বনিক, ধান চায় স্বদেশিরা...
গেরামের পর গেরাম উঠছে জেগে
শস্যের মাঠে লাঙলের কোলাহল,
খুনীর অঙনে বাজে প্রতিশোধ-মত্ত মাদল
জাগে সমতার পূর্ব লড়াই, পূর্বাভাসের বাঁশি।
কোথায় পালাবে?
মানুষ চিনেছে মুখোশের মুখ, মানুষ চিনেছে শত্রু,
হাতে হাতিয়ার বুকে বিশ্বাস ওই দ্যাখো ওরা আসছে।

(রুদ্র; ২০১৪: ৬৪-৬৫)

যেহেতু 'মানুষ চিনেছে মুখোশের মুখ', তাই কবি চাইতেই পারেন, এবার এ অঞ্চলের মানুষ ফিরে পাবে তাদের হারানো ঐতিহ্য, ফেলে আসা শানশওকত। ফলে তিনি সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলার সোনালি গৌরবের স্বপ্ন ফিরে আনতে চান এবং রচনা করেন *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম* (১৯৮১)। সদ্য স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রপিতার হন্তারকেরা যখন স্বৈরশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়, তখন দেশের মানুষকে অনিশ্চিত জীবন থেকে পরিত্রাণ করতে কবিতাই কবির কাছে মোক্ষম অস্ত্র। তিনি যেমন মানুষকে জাগিয়ে তোলার কথা ভাবতে পারেন, তেমনি পারেন অতীতের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত *উপদ্রুত উপকূলে* থেকে এ পর্বে কবির কবিতাভ্রমণে চিন্তা ও প্রত্যয়ে ধারাবাহিকতা থাকলেও প্রকাশে আছে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য। এ-পর্যায়ে কবি তাঁর কল্পনার মানসীকে দেখতে চেয়েছেন বহুরৈখিক চিত্রে। প্রেমিক হয়েও তিনি যেমন চাষা হতে চেয়েছেন, তেমনি চাষবাসের ষোলোকলা তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন প্রেমের শৈল্পিক কথনের মধ্য দিয়ে। নিজের প্রেমকে গাঢ় করে তুলতে উপমা হিসেবে তিনি কর্ষিত জমি, কৃষি ও কৃষকের যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। যেমন :

সমস্ত পরান জুড়ে যে-অঘ্রান ফলভারে নত
তুমি তার ঘ্রান পেয়ে এলে যেন শ্যামল কিষান,
এলে মাটির মরমে রেখে মনোরম মৌন ক্ষত।...
আঁধারে প্রস্তুত ছিলো অপরূপ স্নিগ্ধ অন্ধ প্রেম
শ্যামল কিষান তুমি খুলে দিলে দেহের শিকল,

হৃদয়ের রাত ছিঁড়ে এলো রোদ, ভালোবাসা, মুগ্ধ বোধ
ফসলের হেম।
(রুদ্র; ২০১৪: ৭৯)

রুদ্রের সমাজচেতনা যেমন প্রখর, তেমনি তাঁর প্রেমচেতনাতে আছে 'রুদ্রের' মতোই প্রচণ্ড তেজ। বাঙালির প্রত্নপেশা কৃষিজীবিতাকে সবার ওপর ঠাঁই দিয়েছেন তিনি। কারণ, সেই সুখ-সমৃদ্ধির অতীত ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞাতেই যেন তিনি কলম ধরেছেন। কবির জীবনযাপন ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের বাঙালির শেকড়ের পরিচয় তিনি রাখতেন খুব সুচিন্তিতভাবে। স্বল্পায়ুর এই কবি নিজ মননের বিকাশের লক্ষ্যে দেশের রাজধানী থেকে শুরু করে নিজের জন্মজনপদ পর্যন্ত গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর মধ্যে নাম ছিল 'রাখাল'। এই সংগঠনের প্রতিপাদ্য ছিল 'কবিতা ও রাজনীতি একই জীবনের দুইরকম উৎসারণ।' সাহিত্য যেন কোনো মানুষের জীবন অ-ঘনিষ্ঠ না হয়ে ওঠে, সেটাই ছিল রাখালের লক্ষ্য। কবিতা দেশ ও দেশের শেকড়ের কাছাকাছি থাকা মানুষদের ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন কবি।[২] অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে যেমন কবিতা ও জীবনকে তিনি অভিন্নভাবে দেখেছেন, তেমনি তাঁর সামাজিক জীবনের ওপরও কবিতার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। তাই নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সক্রিয়তার নজির যেন কবিতাচর্চাতেও থাকে, সেটাই ছিল রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর আন্তরিক প্রয়াস। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কবিতার মধ্য দিয়ে সামষ্টিক এক গন্তব্যে পৌঁছতে চান কবি। এ-গ্রন্থের ভূমিকায় কবি ঠিকই বলেছেন, 'স্বর্নগ্রাম আমাদের ইতিহাস, জাতিসত্তা, আর প্রেরণাময় ঐতিহ্যের প্রতীক। স্বর্নগ্রাম বাঙালির আত্মার নাম, রক্তের নাম।' (উদ্ধৃত : ভূমিকা, *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম*) আসলে এ কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে কবি এক নতুন কাব্যজগতের সন্ধান দেন, আবহমান বাংলা ও বাঙালির জীবনের চিরচেনা দুয়ার উন্মোচন করেন এবং পাঠককে সাহিত্যের বিশাল প্রান্তরে পৌঁছে দেন। বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও প্রেরণাময় ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারই কবির উদ্দিষ্ট। (তপন; ১৯৯৮: ৩১-৩২) সে-জন্য একজন কবিকে কতটা গভীরে গিয়ে তুলতে আনতে হয় প্রয়োজনীয় মণিমানিক্য, তা খাঁটি বাঙালি ও কৃষিজীবীর যোগ্য উত্তরসূরি না হলে সম্ভব নয়। তাই তাঁর পক্ষে অত্যন্ত শিল্পিত ভাষায় কৃষকের প্রতিটি আচার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া সম্ভব। রোদ-জলে পুড়ে-ভিজে একজন কৃষক যে কাঙ্ক্ষিত ফসল ফলিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তিনি সেই একনিষ্ঠ কৃষকের ফসল হতে চান। নিজের স্বপ্ন কী কিংবা তাঁর গন্তব্য কোথায়—তার পরিচয় পাওয়া যায় নিচের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পাঠ করলে :

সত্যের লাঙল চিরে এই পোড়া বুকের জমিন
আমিও ফসল হবো, হবো আমি শস্য ভরা ক্ষেত,
সোনালি অঘনে তুমি আঁটি আঁটি ধান তুলে নিও।
আবার নবান্ন কোরো, অতিথিরে নারায়ন জেনে
শাকান্ন, শিঙির ঝোল, আমসত্ব, খেজুর-পাটালি
কাঁসার থালায় এনে খেতে দিও শীতল পাটিতে।

(রুদ্র; ২০১৪: ৮৮-৮৯)

সত্তরের দশকে আবির্ভূত অন্যতম প্রধান কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার শৈল্পিক শরীরে অচ্ছেদ্য হয়ে আছে কাদামাটি, সোঁদা মাটির ঘ্রাণ, মাটিসংলগ্ন মানুষ এবং কারখানার পরিশ্রমী ও ঘর্মাক্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি, সুলতান চিত্রিত মেদহীন পেশিময় দেহ। (সূত্র: সাজ্জাদ আরেফিন; ২০১৩: ২৯৮-২৯৯) এসবের মাধ্যমেই কবি ক্রমশ অগ্রসর হতে চেয়েছেন একটা শ্রেণিহীন ভবিষ্যৎ সোপানের দিকে। তাঁর কবিতার মাধ্যমে ষাটের দশকের পাশ্চাত্য কাব্যচেতনা যেন ফিরে আসে বাংলাদেশের মাটিতে, বাংলাদেশের প্রকৃত শেকড়সন্ধানী মানুষের কাছে। সভ্যতা আলোকিত করা সেই মানুষগুলোর যাপিত জীবনে তিনি আলো নয়, অরণ্যের বহুপ্রতিকূল বিঘ্ন দেখতে পান :

একদা প্রান্তর-দিন তারপর তামা ও লোহায়
সভ্যতা বেড়েছে তার অন্তরের গাঢ় প্রয়োজনে।
করোটির ঘাম আর পাঁজরের বাঁকা ঋদ্ধ হাড়ে
মানুষের চর্ম, অস্থি ঘর্মময় শ্রমের ভাষায়
জীবন লিখেছে নাম নিখিলের অমর কাগজে।
আজ আর বৃষ্টি নেই আজ শুধু জ'মে আছে মেঘ
জীবন বিরোধী মেঘ,
অরন্য-জীবন নেই আজ আছে জীবনে অরন্য
পশুরা গিয়েছে বনে সে-ভূমিকা নিয়েছে মানুষ।।

(রুদ্র; ২০১৪: ৯৭-৯৮)

আকাশ থেকে 'জীবন বিরোধী মেঘ'কে বিদায় করাই যেন কবির কাব্যচর্চার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর সময়ের বাস্তবতায় তিনি দেখতে পান কেবল নেই আর নেই। ফলে তিনি খুঁজে ফেরেন "হারানো আঙুল"। কিন্তু 'নেই। সেইসব তাঁতের হৃদয় থেকে বেজে-ওঠা শ্রমের সঙ্গীত/ নেই। স্বপ্নের সেইসব শিল্পীর হাত থেমে গেছে অনেক অতীতে।' (রুদ্র; ২০১৪: ১০৩) লক্ষ্যযোগ্য সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর পথটা যে মসৃণ নয়, সে-সম্পর্কে অবগত কবি অতীতের ধ্বংসযজ্ঞের ওপরে যেন ফুল ফোটাতে চান। অতীত খুঁড়ে জীর্ণতাকে মাড়িয়ে তিনি ফিরে যেতে চান তাঁর মানসসঞ্জাত জগৎ তথা এই ভূখণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের কাঙ্ক্ষিত 'স্বর্নগ্রামে' :

ভাঙা ইট, ওই হাড়—ও-তো শুধু বেদনার ব্যর্থ অবশেষ,
আমি তবু সেই ধুলো খুঁড়ে খুঁড়ে শুঁকে দেখি ভেতরের মাটি
কেন দেখি? কেন সেই শিল্পীর কাটা-আঙুল খুঁজে পেতে চাই?
পেতে চাই তাঁতের হৃদয় থেকে বেড়ে-ওঠা শ্রমের সঙ্গীত
ঘরে ঘরে রেশমের গন্ধমাখা আশ্বাসের মসৃন বাতাস।
হৃদয়ে শিল্পের ভাষা
হারানো শ্রমের পেশী
হারানো উত্তাপ আমি খুঁজতে খুঁজতে কেন ওই বুড়ো অশথের নিচে
বাঁধানো দিঘির ঘাট, ওই ভাঙা দেয়ালের কাছে এসে থমকে দাঁড়াই।
কেন শুধু জীবনের হাড় থেকে ধুলো, বালি, ক্লান্তি, ঘাম, ব্যর্থতা সরাই?...
হারানো শিল্পের কাছে
হারানো প্রানের কাছে প্রয়োজনে নতজানু হবো,
হারানো শিল্পীর কাছে পুনরায় নতজানু হবো।
এই ধুলো, ক্লান্তি, ভুল, জীর্ন দুঃখগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে ফিরো যাবো স্বর্নগ্রামে।।

(রুদ্র; ২০১৪: ১০৪)

কবি কাঙ্ক্ষিত ‘স্বর্নগ্রামে’ ফিরতে চেয়ে ‘অঙ্কন’ করে ফেলেন *মানুষের মানচিত্র* (১৯৮৪)। এ-গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি নতুন কাব্যভাষা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন উপভাষার সঙ্গে ছন্দ প্রয়োগের কঠিন পথে। বিষয় হিসেবে শ্রমজীবীর মানুষের যাপিত জীবন এবং তাদের সম্পর্কের রসায়নকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শব্দ প্রয়োগে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে কৃষি বা কৃষকের নিত্য ব্যবহার্য নানা অনুষঙ্গকে এনে কাব্যবৈচিত্র্য বাড়িয়েছেন। তাদের কোনো প্রত্যাশাই বিনা বাধায় পূরণ হয় না, সেই চিরসত্যকে তিনি উপস্থাপন করেছেন চিরায়ত নরনারীর কামনা-বাসনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যেমন :

গতবার আষাঢ়ও পার হয়ে গেল তা-ও নামে না বাদল,
এবার জ্যোষ্টিতে মাঠে নেমে গেছে কিষানের লাঙল জোয়াল।
আমাদের মাঝে দ্যাখো জমির ভাগের মতো কতো-শতো আল্
এই দূর পরবাস কবে যাবে? জমিনের আসল আদোল
কবে পাবো? কবে পাবো আল্হীন একখন্ড মানব-জমিন?

(রুদ্র; ২০১৪: ১০৭)

এ রকম বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের আবেগ ও সংগ্রাম একাত্ম হয়েছে এ-গ্রন্থের কবিতাসমূহে। তাদের লড়াই ও প্রতিকূলতা সর্বদা প্রায় অভিন্ন থাকে। এ সম্পর্কে কবি নিঃসন্দেহ। তাই তিনি বলতে পারেন, ‘এই যুদ্ধ বড়ো চেনা, চোখের আড়ালে বাঘ, গোপন লড়াই/ কখন নিয়েছে পিছু, মরনে জড়ায়ে গেছি পাই নাই টের।’ (রুদ্র; ২০১৪: ১২২) এ-গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি

কবিতা 'বিষয়বস্তুর দিক থেকে আকর্ষণীয় ও প্রাগ্রসর চিন্তার সহগামী। বিবিধ বঞ্চনা ও শোষণের চিত্রগুলো ভালো ফুটেছে, সেই সঙ্গে শোষণ-নিপীড়নকে প্রতিহত করার সংগ্রামী প্রত্যয়ও পরিস্ফুট।' (আশরাফ; ১৯৯৪: ১৯২) কারণ, সময়টা আশির দশক। নতুন স্বৈরশাসক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। গণতন্ত্রহীন সমাজে কৃষক-শ্রমিকের জীবনকাল অতিবাহিত হয় দুঃস্বপ্নের মতো। ফলে 'জীবনের চাদ্দিকে হাত্ড়ায় মাঝি—আলো নেই, শুধু অন্ধকার' দেখে। নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী তথা যেকোনো শ্রমজীবীদের মতো জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত মানুষদের কাছে 'উষর জমিনে আজো, আজো মাঝি শুধে যায় জীবনের ঋন।/ জোয়ারের নাওখানি বার বার কাঁপে তার দুখের ভাটিতে।' (রুদ্র; ২০১৪ : ১০৯) উপায়ন্তর না দেখে এই শ্রেণির মানুষ হাত বাড়ায় সম্পদশালী মহাজনদের দিকে। কিন্তু জীবনের নিত্যবোঝা নিয়ে সেখানেও পায় না তারা সুখদ কিছু। সমাজের এই সঘন সংকট নিয়ে তাদের হয়ে কবির ভাষ্য :

> গেল বছর দেনা এ-বছর নিয়ে গেল খোরাকির ধান।
> এই সনে দেনা হবে আরো, হালের বলদ-গাই যাবে ব্যাচা,
> কার্তিকের অনটনে সংসারে ডাকবে ঘোর অভাবের প্যাঁচা
> মহাজন ভালো লোক, দেনার বদলে দেবে নাড়ি ধ'রে টান—...
> এ-কথা বিশ্বাস কোরে এতোকাল বেঁচে আছে মাঠের চাষারা,
> তামাদি হয়েছে সুখ, নোনা ধ'রে গেছে সারা জীবনের গায়
>
> (রুদ্র; ২০১৪: ১১০)

কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বংশপরম্পরায় শ্রমজীবী হয়ে আসা মানুষদের ভাগ্যের উন্নতি চান। তাই 'কবির এই প্রত্যাশা, শোষিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম আর দায়বদ্ধতারই ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছে *মানুষের মানচিত্র* নামের তৃতীয় কবিতাগ্রন্থে।' (সূত্র: আশরাফ; ১৯৯১: ৮৮) এ-কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি তাঁর 'দায়বদ্ধতার' প্রকাশ ঘটাতে চান। কারণ, অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনও তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একতরফা পদ্ধতির কারণে সভ্যতার হালধরা মানুষগুলো নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়েও কাঙ্ক্ষিত সচ্ছলতা পায় না। ফলে 'আল্লাহ তালার কাছে কপাল বন্ধক দেয়া' মনে হয়। নিজেদের কর্মফলকে তারা ভাগ্যবিড়ম্বনা বা 'পূর্বপুরুষের পাপ' বলে অভিহিত করে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাদের প্রভাব, যারা উৎপাদনপ্রক্রিয়া সময়মতো সম্পন্ন না করলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানও ভেঙে পড়তে পারে, তাদেরই একজন প্রতিনিধি হয়ে কবি তাদের জীবনচিত্র তুলে এনেছেন সুনিপুণভাবে। পাশাপাশি কৃষকদের প্রতি সমাজের উঁচুতলার মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শোষণচিত্রও স্পষ্টভাবে সংকেতিত হয়েছে কবির মিতব্যয়ী উচ্চারণে :

> হেমন্তের ধান ক্ষেতে নামে তার রুক্ষ থাবা, লোভে ভেজা হাত।
> চাষাদের মজ্জামাংশ, কটু ঘাম চিনে চিনে যে-ধানের চারা

বেড়েছে বাদলে রোদে, চাষার গহন ক্ষোভ জানে নাকো তারা,
ঝলমলে দিনেও কেন চাষাদের ঘরে থাকে পচা-গলা রাত।

(রুদ্র; ২০১৪: ১২৮)

চাষাদের ঘরের হাল কেন দুর্দশগ্রস্ত—এই প্রশ্ন উত্থাপন করাকে যেমন কবি নিজের দায়িত্ব মনে করেছেন, তেমনি এর উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রেও অগ্রগামী আরও প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। কারণ সমাজের সাম্যাবস্থা বিরাজমান থাকে, যাদের অবদানের কল্যাণে, প্রাপ্তির হিসাবে তারাই হয় অসাম্যের শিকার। কৃষিজীবীদের অবদান ও জীবনচিত্র তুলে ধরতে আবারও কবি প্রশ্নের আশ্রয় নিয়েছেন এভাবে :

সে খুব কঠিন মূল, শক্ত হাতে ধ'রে আছে সমাজের কল
শক্ত এক গাছের নাহান কামড়ে রয়েছে সে কঠিন মাটি।
তিন ভাগ জলের নিকটে তবু কতোটুকু শক্ত তার ঘাঁটি?
অন্যায় পাহাড় কবে ভাঙতে আসবে ফুঁসে দুর্বিনীত জল?

(রুদ্র; ২০১৪: ১২৮)

সমাজের নিচু স্তরের মানুষের সংখ্যার বৃদ্ধি আর মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঁজির দখলই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য। এক দিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অন্যদিকে সম্পদের পাহাড়। স্বাধীনতাত্তোর পর্বে বাংলাদেশ তখন স্বৈরশাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শিকার। কবি *ছোবল* (১৯৮৬) নামক কাব্যগ্রন্থের পাঠকপ্রিয় "ইশতেহার" কবিতায় শ্রমজীবীর দুর্দশা এবং সমাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে পুঁজিপতিদের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। কোনো রাষ্ট্রে স্বৈরশাসন চলমান থাকলে, বিষয়টি আরও প্রকট আকারে স্পষ্ট হয়। গোটা মানবজাতির ইশতেহারই যেন উঠে এসেছে সামাজিক সাম্যপ্রত্যাশী কবির শিল্পিত ভাষ্যে। কারণ, 'পৃথিবীর মানুষ তখনো ব্যক্তিস্বার্থে ভাগ হয়ে যায়নি।/ ভূমির কোনো মালিকানা হয়নি তখনো।/ তখনো মানুষ শুধু পৃথিবীর সন্তান।' (রুদ্র; ২০১৪: ১৩৩) এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য ছিল না। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে ছিল না প্রতিযোগিতা; ছিল না শত্রুতা। মাতৃপ্রধান সমাজের সেই ইতিহাস জেনে অনায়াসে বলা যেত :

অরন্য আর মরুভূমির
সমুদ্র আর মরুভূমির ভাষা তখন আমরা জানি।
আমরা ভূমিকে কর্ষন কোরে শস্য জন্মাতে শিখেছি।...
আমাদের নারীরা জমিনে শস্য ফলায়
আর আমাদের পুরুষেরা শিকার করে ঘাই হরিন।
আমরা সবাই মিলে খাই আর পান করি।

(রুদ্র; ২০১৪: ১৩৩)

যাকে আমরা আদিম যুগ বলে অভিহিত করি, সেই অনাধুনিক যুগ ছিল মূলত শ্রমনির্ভর। কবি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন সেই ইশতেহারের মধ্য দিয়ে। কারণ সেই সমাজে বৈষম্য ছিল না। আধুনিক ও নগর এবং যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার উন্নতি ও পুঁজির বিকাশ শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই যান্ত্রিক সভ্যতার চেয়ে আদিম সাম্যবাদী সমাজই সমতার নিরিখে গ্রহণীয়। কবির মতে :

আমাদের নির্মিত যন্ত্র শৃংখলিত করলো আমাদের
আমাদের নির্মিত নগর আবদ্ধ করলো আমাদের
আমাদের পুঁজি ও ক্ষমতা অবরুদ্ধ করলো আমাদের
আমাদের নভোযান উৎকেন্দ্রিক করলো আমাদের।

(রুদ্র; ২০১৪: ১৩৪)

পুঁজির কল্যাণে বিকশিত সমাজের আপাত দৃষ্টিনন্দন রোশনাই নিয়ে পুঁজিপতিরা সাফল্যের তৃপ্তি প্রকাশ করলেও তা যে কৃত্রিম, অন্তঃসারশূন্য ও অমানবিক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও নানা কারণে যে অর্থনৈতিক সাম্য অর্জিত হয়নি, তা স্পষ্ট করে বলার জন্যও কবি বেছে নিয়েছেন এই "ইশতেহার" কবিতাকে। স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য 'অর্থনৈতিক মুক্তি' যদি অর্জিত হতো, তাহলে কবিকে নিষ্ঠুর সেই চিত্র এভাবে তুলে ধরতে হতো না :

আমাদের কৃষকেরা
শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়।
আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত, হাড্ডিসার।
আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন।
আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুন।
আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর
দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে।

(রুদ্র; ২০১৪: ১৩৬)

"ইশতেহার" কবিতার মধ্য দিয়ে কৃষক-শ্রমিকের করুণ চিত্র যেমন কবি ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ শব্দশৈলী প্রয়োগ করে, তেমনি তাঁর আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন সুদৃঢ়ভাবে। সভ্যতা বিনির্মাণে মৌলিক অবদান রাখা এই জনগোষ্ঠী নতজানু এবং কেবল উচ্চবিত্তের কারুণ্য নিয়ে বেঁচে থাকুক, সেটা কবি চাননি। তিনি 'আমাদের শ্রম, উৎসব, আনন্দ, আর প্রশান্তির পৃথিবীতে' যেন বৈষম্য না থাকে, সেটাই চেয়েছেন। তাঁর প্রত্যাশা এক দিন :

আমাদের মর্যাদার ভিত্তি হবে মেধা, সাহস আর শ্রম।
আমাদের পুরুষেরা সুলতানের ছবির পুরুষদের মতো

স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ আর প্রচন্ড পৌরুষদীপ্ত হবে।
আমাদের নারীরা হবে শ্রমবতী, লক্ষীমন্ত আর লাবন্যময়ী।
আমাদের শিশুরা হবে পৃথিবীর সুন্দরতম সম্পদ।
(রুদ্র; ২০১৪: ১৩৭)

কবির এই প্রত্যাশা পূরণে বাধাবিঘ্নের শেষ নেই। তিনি সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত বলেই একই কবিতাতেই বলেছেন, 'কিন্তু—/ এই স্বপ্নের জীবনে যাবার পথ আটকে আছে/ সামান্য কিছু মানুষ।/ অস্ত্র ও সেনা-ছাউনিগুলো তাদের দখলে।' (রুদ্র; ২০১৪: ১৩৭) কবি জানেন, পুঁজি যার, ক্ষমতা তার। অস্ত্র যার, ক্ষমতা ও পুঁজির নিয়ন্ত্রণ তার। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে প্রধান অন্তরায় এই ক্ষমতালিপ্সু গোষ্ঠী। যেহেতু অস্ত্র আর সেনাছাউনিগুলো তাদের দখলে, তাই উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার চাবিকাঠি আর ভূমির মালিকানাও তাদেরই হাতে। ফলে শোষণপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিচালনাই তাদের উদ্দেশ্য। এর মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি ছাড়া বাকি সবাই যেন এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তবে 'কবি এও লক্ষ করেছেন, মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার কোনো পর্বেই মানুষ কখনোই প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিবেশকে প্রতিরোধহীন মেনে নেয়নি। ফলত সভ্যতার ইতিহাস হয়ে উঠছে শোষক শ্রেণীর সাথে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস। তাদের এ সংগ্রাম এমনকি বৈরী প্রকৃতির সাথেও পূর্বাপর অব্যাহত থেকেছে।' (সূত্র: আশরাফ; ১৯৯১: ৯০)

স্বৈরশাসকের সঙ্গে সচরাচর ওতপ্রোতভাবে ক্ষমতার অংশীদার হয়ে থাকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। তাদের সহায়তায় নির্যাতন, শোষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে বাক্-স্বাধীনতাহীন গণতন্ত্রহীন সমাজে। বাংলাদেশের মতো কৃষি ও শ্রমপ্রধান সমাজের পটভূমিতে বলা যায়, যেকোনো কর্মজীবীদের মধ্যে কৃষক বা শ্রমিকের সন্তানের সংখ্যাই অধিক। কেননা, এ দেশের আশি ভাগ মানুষই কৃষক; মাত্র পাঁচ ভাগ চাকরিজীবী। সেই দিকে ইঙ্গিত করে প্রকৃত মানবিক ও শ্রমিকবান্ধব কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বলেছেন, সরকারি চাকুরে কিংবা সেনাসদস্যরা যেন শেকড় বিস্মৃত না হন। অস্ত্র প্রয়োগের আগে যেন তাঁরা ভাবেন :

তুমি সেই আশি যোগ পাঁচজন মানুষের ছেলে—
তোমার পিতা একজন চাষা, ক্ষেতে লাঙল চালায়
তোমার পিতা একজন শ্রমিক, মিলে গতর খাটায়
তোমার পিতা একজন মজুর, একজন কর্মচারী
তোমার পিতা একজন পিয়ন, রেল শ্রমিক, কেরানি
তোমার পিতা একজন বাস শ্রমিক, বেশ্যার দালাল
তোমার পিতা একজন স্কুল শিক্ষক, রিকশাওয়ালা—

তোমাদের পিতার পাঁজরে তোমরা টার্গেট প্র্যাকটিস করছো...

দাঁড়াও নিজেকে প্রশ্ন করো—কোনা পক্ষে যাবে?

(রুদ্র; ২০১৪: ১৪৯)

কেবল সত্তরের দশকে আবির্ভূত কবিদের মধ্যে নয়, বাংলাদেশের কবিতার অন্যতম সেরা কবিগণও রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মতো করে একই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকের অবদান ও আত্মত্যাগ, ঐশ্বর্য ও নিষ্পেষিত অবস্থার কথা এতটা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেননি। স্বকীয়তা ও অর্জনে 'প্রত্যেক সহজাত কবিপ্রতিভারই একটা নিজস্ব শিল্পব্যাকরণ থাকে। এ-দেশের মাটি, রক্ত, শ্রম ও ঘামের মধ্যে লালিত-বর্ধিত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিসত্তারও একটা স্বতন্ত্র আয়োজন ছিলো, একটা নিজস্ব ব্যাকরণ ছিলো। সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার ন্যায়ের সম্মিলনে এই ব্যাকরণের সৃষ্টি।' (রফিকউল্লাহ; ২০০২: ১৮২) এই সূত্রেই বলা যায়, তাঁর কবিতার কণ্ঠে নতুন নতুন ভাষ্যে, অথচ শিল্পের নান্দনিকতা অক্ষুণ্ন রেখে যে জ্বালা উদ্ভাসিত হয়েছে, তা যেকোনো দেশের যেকোনো সময়ের শ্রমজীবীদের পক্ষেই কথা বলবে। তাঁর আবির্ভাব ও স্থিতি বাংলা কবিতার সমাজচেতনবাহী ধারায় নতুনত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫) বাংলাদেশের সত্তরের দশকে আবির্ভূত অন্যতম কবি। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এ প্রজন্মের কবিদের প্রাপ্তিকে মুহূর্তেই হতাশায় নিমজ্জিত করেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্ত আকাশের স্বাদ পেতে যখন তাঁরা কেবলই সৃষ্টিশীল মাধ্যমে অগ্রসরমাণ, তখনই এক কঠিন গ্রহণকালের সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। ফলে প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও ষাটের কবিদের মতোই হতাশা-বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। তবু সময়কে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে স্থাপন করে আত্মপ্রকাশ করেন *ঘাসের ঘটনার* (১৯৭৬) মধ্য দিয়ে। নিজস্ব শব্দচয়নে নতুন স্বাধীন দেশে সাহিত্য পরিমণ্ডলে সংযোজিত কাব্যটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের প্রতি বিতৃষ্ণ ও সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে বাস করেছেন সত্তরের কবিগণ। এর মধ্যে কৃত্রিম এক নাগরিক সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল। এ সত্ত্বেও রোমান্টিক ও লোকজ জীবনকে তিনি গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। সাম্যবাদী কবিদের মতো সমাজনিষ্ঠ কবিতা রচনায় মনোযোগী না হলেও তাঁর কবিতাতেও শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এসেছে। স্বীয় কবিতার স্বার্থে বিষয় হিসেবে আবির্ভূত তেমন কবিতাতেও যে শ্রমজীবন সাবলীলীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তার প্রমাণ "ভবিষ্যৎ বাড়ি"। হয়তো সেটি প্রকৃত অর্থেই নিজের বাড়ি নির্মাণের গল্প। নিত্যদিনের সেই নির্মাণদৃশ্য শিল্পিত এক কাব্যপ্রতিমা হয়ে উঠেছে কবিতার প্রসাদগুণে। অথবা তাঁর দিগন্ত বিস্তৃত

দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নির্মাণের আনন্দ ও মুগ্ধতা। সেই আনন্দ ও বিস্ময়ানুভূতি শ্রমজীবনের আরশিতে নিজহৃদয়ের চিরন্তন রূপকল্প হিসেবে ধরা পড়েছে :

রাজমিস্ত্রিদের ঝাঁক রোদের ভিতর পিঠ দিয়ে
গেঁথে দিচ্ছে থরে-থরে ইটের শরীরে ইট. পাথরের ভিতরে পাথর
প্রতিষ্ঠার শব্দ হচ্ছে, স্থাপনের ধুম—
নিজের ভিতের ওপর আমার বাড়ি তৈরি হতে থাকে।...
দিনের ভিতরে স্তব্ধতার মতো কাজ করে চলে
শ্রমিকেরা পাথরের মানুষের মতো,
বলিষ্ঠ মজ্জায় ভরা এই মৃত্তিকার পাশে বসে-বসে ওরা কাজ করে,
কখনো ওদের শরীরের পোড়া ঝামা-তামা ছিঁড়ে
রোদ্দুরে ঝলসে ওঠে, কাঁপে পেশি, ওদের ঘর্মাক্ত কাঁধে,
নির্জন পিঠের আয়নায় কখনো হঠাৎ ছায়া পড়ে দূর-পল্লবের;
(আবিদ; ২০০৮: ২৪)

স্বপ্নের মতো গড়া একটা স্থাপনা কবি তাঁর এই কবিতাভাষ্যে নির্মাণ করেছেন; নাগরিক পারিপাট্য ও লোকজ কল্পদৃষ্টির সম্মিলন ঘটেছে। এতে শ্রমিকের কাজের বিবরণ থাকলেও তাদের স্বার্থ বা অধিকারের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়নি—সেই উদ্দেশ্যও কবির ছিল না।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবি ও কবিতার তুলনায় সত্তরের দশকে আবির্ভূত কবি, কবিতা ও কবিতাপত্র বা ছোটকাগজের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। নতুন দেশ, নতুন স্বপ্ন, নতুন ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করেই হয়তো কবি-সাহিত্যিকেরা নতুন পথে স্বপ্ন-সাফল্যের সিঁড়ি নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁদের এই নতুন পথনকশার মানসভিত্তি রচিত হয়েছিল তাদের কৈশোর বা তারুণ্যের প্রথম প্রহরে ষাটের দশকজুড়ে সংঘটিত সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির পরিবর্তমান উত্তাল পরিক্রমায়। ফলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও আবারও যখন স্বৈরশাসকের কবলে পড়তে হয়, যখন স্বপ্নের দেশটাকে সঠিক গন্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে স্বদেশ, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন কবি। দেশের জাতীয় প্রতীকের স্মারক হিসেবে স্থাপিত প্রস্ফুটিত শাপলার উন্মোচিত পাপড়ির প্রতিটি কণায় যাদের অবদান রয়েছে, তিনি তাদের প্রসঙ্গ এনে রচনা করেছেন "নির্মিত কহ্লারে যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশ"।[৩] দেশের কেন্দ্রীয় প্রতীক যতই রাজধানীকে কেন্দ্র করে উঠুক না কেন, তাতে থাকে জনমানুষ তথা শ্রমজীবীদের অকৃত্রিম অবদান। কবির সূক্ষ্ম অনুভূতি সেই বাতায়ন দেখা যায় এভাবে:

সারা গ্রাম-বাংলার বুকের ধবল দুঃখের মতো
বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ফুটে উঠল সাদা শাপলাফুল।...
এই সাদা ফুলের ছায়ায় ফুটে আছে আমাদের কুঁড়েঘর

যে কুঁড়েঘরের চালগুলি বহুদিন শুনেছে যুদ্ধবিমানের গর্জন
যে কুঁড়েঘরগুলি বর্ষারাতে কান পেতে শুনেছে মর্টারের শব্দ
যে কুঁড়েঘরগুলি উঠানে দাঁড়িয়ে খড়ের গাদার পাশে শুনেছে লাজুক কিষানির আর্তনাদ
যে কুঁড়েঘরগুলি জ্যোৎস্নারাতে দেখেছে চকচকে বন্দুকের নল।

(আবিদ; ২০০৮: ১০৭-১০৮)

কবির প্রত্যাশা দেশের প্রতিটি প্রান্তের এগিয়ে চলার সঙ্গেই মিশে আছে শ্রমিকের অবদান, তাতে 'যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশ'। নির্দিষ্ট কোনো দিকের প্রতি নয়, আবিদ আজাদের কবিতা সর্বত্রগামী। একটি কবিতায় বেশ কয়েকটি বিষয়ের ইঙ্গিত থাকে। ফলে আলাদা করে কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ এনে কবিতা রচনায় তাঁকে অগ্রসর হতে দেখা যায় না। তবে তাঁর কবিতায় দেশ বা সমাজ বা রাজনীতিকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধের কোনো বার্তা প্রতিফলিত হলেই ক্ষীণভাবে হলেও কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ এসে যায়। শ্রমজীবীদের সেই অবিচ্ছেদ্য রূপই উঠে আসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ "এখন যে কবিতাটি লিখব আমি" কবিতায় :

এখন যে কবিতাটি লিখব আমি
এক্ষুনি সেই কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করা হবে...
চেক করা হবে বেতার-ভবনের গেটে ঘোষিকার কণ্ঠ
তরুণ কবির বুক পকেট
বলপেনের দাগভরা আঙুলের ভাঁজ
কেরানির খাতা
অধ্যাপকের উড়োচুল
কৃষকের কোঁচড়
শ্রমিকের চোখ
পাড়াগাঁর ইস্কুল
গঞ্জের ক্যানভাসারের গলা

(আবিদ; ২০০৮: ১৭৩-১৭৪)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির সময়ের প্রভাব কবিভেদে তাঁদের বিষয়গত কাব্যময় প্রকাশ ভিন্ন হলেও সবাই যে নেতিবাচকতাকে পেরিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট সুন্দর আগামীর দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, এ সময়ের 'কবিরা এমন এক দুঃসময়ের অধিবাসী যখন তাদের কাছে বিশুষ্কতা ছাড়া কিছুই মুখ্য হয়ে ওঠে না।...বাঙালির জাতীয় জীবনচৈতন্যের সামগ্রিক উত্তরণের লক্ষ্যে এ সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেই সব প্রতিবাদী, আত্মবিশ্বাসী ও শিল্প-অভিজ্ঞানমণ্ডিত কবিকণ্ঠ, যাঁরা হৃদয়াবেগ ও জীবনাবেগের সমন্বিত পরিচর্যায় কবিতাকে পরিণত করতে সক্ষম বিক্ষোভের শিল্পিত শব্দরূপে, যাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন এমন একটি অনিবার্য

চিত্রকল্প, যা জনজীবনের সমগ্রতার অঙ্গীকারে হয়ে উঠতে পারে তরঙ্গিত, স্পন্দিত ও অব্যর্থ।' (রফিকউল্লাহ; ২০০২: ৫৫) আর সভ্যতার অগ্রগামিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমজীবীরাই সেই 'স্পন্দন ও অব্যর্থতা'র মূল কারিগর। এ-সময়ের কবিদের অনেকের কবিতার মধ্যেই তা পৃথক প্রণতা প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদেশের সত্তরের দশকের কবিতার অন্যতম প্রধান কবি ক্ষণজন্মা কবিপুরুষ ত্রিদিব দস্তিদার (১৯৫২-২০০৪)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লড়াকু এই কবির কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের মতো একধরনের গতি লক্ষণীয়। তাঁর সময় যেন খুব সীমিত। কবিতাযাত্রা সত্তরের প্রারম্ভে হলেও বোহেমিয়ান এই কবি গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব করেন। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে। সামগ্রিকভাবে প্রেম ও দ্রোহচেতনাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কবিতা রচনায়। তিনি যখন কবিতার প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করেছেন, তখনই দেখেছেন স্বাধীন দেশের জন্মবেদনা। সামরিক শাসনে পর্যুদস্ত দেশের ওপর চালানো জবরদস্তিতে তাঁর প্রজন্মের অন্য কবিগণের মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কলম তুলে নিয়েছিলেন তিনি। অন্যদের চেয়ে তিনি ব্যতিক্রম, দেশমাতৃকার প্রয়োজনে হাতে নিয়েছিলেন অস্ত্রও। তাই 'কবিতায় ত্রিদিব দস্তিদার শিল্পের জন্য শিল্পে বিশ্বাসী হলেও তার বেশির ভাগ কবিতাতে সমাজ বাস্তবতা ও সচেতনতাও পরিলক্ষিত হয়।' (সূত্র: ত্রিদিব: ভূমিকাঃ বেলাল, ২০০৫: ০৫) কবির পাশাপাশি প্রেমিক পরিচয়ে শ্লাঘা অনুভব করতেন ত্রিদিব; পরিস্থিতিতির বিবেচনায় তীব্র প্রতিবাদী এক কণ্ঠও বিরাজমান থাকত। তাঁর বাক্‌রীতি তাঁর সময়ের অন্য কবির তুলনায় একেবারে ভিন্ন, যাতে স্বতন্ত্র কবিকণ্ঠ সহজেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তাঁর সম্পর্কে সহজেই বলা যায় :

> চির তরুণ, বর্ণিল, বোহেমিয়ান কবি ত্রিদিব দস্তিদার। সত্তর দশকের উত্তাল কালপর্বে এই রক্তিম তরুণ নিজেকে সমর্পিত করেন মাটি, মানুষ ও কবিতার অগ্নিমন্ত্রে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ১৯৭২-এ তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ। যেন, এই কাল-পারম্পর্যই তাঁর সার্বভৌম জীবন ও শিল্পসত্তার অনিবার্য নিয়ামক। আমৃত্যু স্বাধীন, সংসারহীন ছিলেন তিনি—তাই গেরস্থালি পেতেছিলেন কবিতার সঙ্গে। গৃহহীন বলেই হয়তো সমস্ত স্বদেশ ছিল তাঁর ঘর। (সূত্র: ত্রিদিব; প্রসঙ্গত: হিমেল; ২০০৫: ০৭)

তাই মূলত সমাজচেতনা ও প্রেমচেতনা নিয়ে কবিতায় মগ্ন থাকার মধ্যেই কিছু কবিতায় কবি সমগ্র দেশের বঞ্চিত শ্রমজীবীর প্রসঙ্গ এনেছেন সচেতনভাবে, যেখানে কৃষকের সন্তান বা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের শেকড়কে নিশ্চিত করেন। স্বতন্ত্র শব্দভাষ্যে আত্মপরিচয়

অটুট রাখতে সৃজন করেন অবিকল্প এক চিত্রকল্প, যা পুনঃপুন ব্যবহারে শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে প্রতীকধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

আমার গায়ে আমন-গন্ধ
পায়ে থাকগে কাদা, —আমি কোন হাঁদা যে
তোমার কথায় আতর মেখে যাবো?

আমার আতর শস্য-ঘ্রাণে, শস্য-বীজে রেখো
বাবার আতর আমিই এখন, ফুল্ল-ফলে
মাঠটি শুধু দেখো।
তোমার আতর পৌরসভা, নগরায়ণের রেখা
নবান্ন উৎসবে তুমি, হও যে বড় একা

(ত্রিদিব; ২০০৫: ৬৭)

কবি একধরনের রোমান্টিক ভাবনাতেও কৃষিজীবীর প্রসঙ্গে এনেছেন শৈল্পিক নিপুণতায়। প্রচলিত লোকবিশ্বাসকে আধুনিক কবিভাষায় উপস্থাপন করেছেন "শস্যের ভুবন" কবিতায়। কৃষিজীবীরা অনেক সময় কিছু লোকবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন। তার কোনো কোনোটা কবির জীবনাভিজ্ঞতাকেও স্পর্শ করে থাকবে। তেমন একটা প্রসঙ্গ সামনে এনে খাদ্য ও খাবার নিয়ে পুঁজিপতিদের মনোভাবও তিনি স্পষ্ট করেছেন "শস্যের ভুবন" কবিতায়। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ আর সঞ্চয়কারীদের পাশাপাশি রেখে একেবারে বিপরীত, অথচ বাস্তব সমাজচিত্র তুলে এনেছেন তিনি। পুঁজিপতিদের আচরণকে বলেছেন, 'ধনবান ঢেউ'। কবি যে নিবিষ্ট এক কৃষকসন্তান, তার প্রমাণও এই কবিতা :

তোমার পায়ের নিচে যদি একটি শস্য-দানা পড়ে
তবে জিভ কাটো
অভুক্ত মানুষের নামে জিভ কাটো
পৃথিবীর শস্যের দানা মুখে তুলে নিতে
যাদের ঘর্মাক্ত শরীর
তাদের হাতে তুলে দাও সেই দানা
উদ্বৃত্তের অন্ন যদি মাটিতে গড়ায়
তবে সকল শস্যের অমঙ্গল হবে
উৎপাদনে ব্যাহত হবে শস্যের ভুবন।
কিছু উদরে নাও, কিছু ফেলে দাও
উচ্ছিষ্ট ভেবে ভেবে পায়েতে মাড়াও
এও তোমাদের এক ধরনের ধনবান ঢেউ।

(ত্রিদিব; ২০০৫: ১৫৮)

মুক্তিযোদ্ধা ও শতভাগ দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত কবি বিপ্লবে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে চান। তাই পুঁজিপতিদের শব্দবাণে বিদ্ধ করতে চান অনায়াসে। দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল হিসেবে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই বাঙালিকে এক দুঃস্বপ্নে পতিত হতে হয়। জনককে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি তাদের অর্জিত সাফল্যও হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘ দিন দেশ পরিচালিত হতে থাকে অগণতান্ত্রিক পথে। যে কৃষক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সারা দেশ স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই উৎপাদকেরা আবারও গভীর অনিশ্চয়তার খাদে পড়ে। ফলে লড়াকু কবি বলতেই পারেন "বিজয় হারিয়ে গেছে"। কারণ, শৈশবকালে তিনি ছিলেন বিজয়বান্ধব: 'বিজয়, বিপ্লব আর আমি/ স্কুলজীবনে একই বেঞ্চিতে বসতাম/ একই স্কুল থেকে কলেজে/ তখন চলেছে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান/ বিজয় বীরদর্পে মিছিলে।' (ত্রিদিব; ২০০৫: ১৫৯) এই মিছিলের অংশী 'বিজয়' বিজয়ী পতাকা আনে। কিন্তু কবির উপলব্ধি, সেই বিজয় যখন ৩০ লক্ষ শহিদের ইতিহাসে পরিণত হলো, তারপর থেকে বিজয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যেন একাত্তরে অর্জিত সেই বিজয়কেই তিনি ভবিষ্যতের পথনির্মাণের জন্য খুঁজছেন:

> বিজয় বুক উঁচিয়ে ভাষণ দিচ্ছে
> বাংলাদেশ আমার ৩০ লক্ষ শহীদের ইতিহাস
> রক্তের ফল্গুধারা
> এর বীজ-রক্তে আমাদের মানুষের আগামী ফসল
> বিজয়ের এসব কথা শুনে
> ফসলহীন সাধারণ মানুষের স্রোত ভেঙে মিলে গেলো—
> অন্যস্রোতে, বিজয়ও বিচ্ছিন্ন হলো ওদের কাছ থেকে
> আমি এখন বিজয়কে খুঁজছি...
> নিরাশার এই ভঙ্গুর জনস্রোত ছাড়িয়ে বিজয় কোথায় যেতে পারে?
> না বিজয় এখনো ফসলহীন সাধারণ মানুষের স্রোতের উদ্দেশে
> শোনাচ্ছে আগামী ফসলের কথা,
>
> (ত্রিদিব; ২০০৫: ১৫৯-১৬০)

ত্রিদিব দস্তিদার যে কটি কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ এনেছেন, তার প্রতিটিতেই একধরনের লড়াকু মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিপতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বেদনা নানাভাবে প্রতীকায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন "বর্ণমালা" কবিতায় ভাষা আন্দোলনের শহিদদের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করছেন, ওই ছাত্রজনতা আসলে ছিল গ্রাম থেকে উঠে আসা কৃষক-শ্রমিক-মজুরেরই সন্তান :

বর্ণমালারা ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলো
আমরা রফিকের ভাই
আমরা সালামের বোন
আমরা বরকতের ছেলে
ওরা শুধু ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো
বর্ণমালারা এবার নিজেদের ক্ষত দেখিয়ে বললো
—এই যে রক্ত
মুহূর্তে পেশী বলে উঠলো, এটা আমার
ফসল বলে উঠলো, এটা আমার
হাতুড়ি বলে উঠলো, এটা আমার

(ত্রিদিব; ২০০৫: ১৬৪)

সংগ্রামী এই মানসিকতা কবির অন্যান্য কবিতাতেও প্রতিফলিত। এমনকি তিনি যখন প্রেমের কবিতা লিখেছেন, তখনো যেন প্রেমের প্রচলরূপের বাইরে গিয়ে রীতিবিরুদ্ধভাবে মনস্কামনা পূরণ করতে চেয়েছেন। যেমন: 'মারতে মারতে কোথায় নেবে?/ কবি তো ভাই আছেই মরে প্রেমিক তো ভাই আছেই মরে/ তোমার প্রেমের যম-দুয়ারে।' (ত্রিদিব; ২০০৫: ১৪১)

নব্বই দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে তৈরি পোশাক খাত। অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের শ্রম বিক্রি করে আমাদের নিম্ন আয়ের মানুষেরা। এদের অধিকাংশ নারী। সমাজের মানুষের প্রতি অত্যন্ত খোলা দৃষ্টি বিদ্যমান বলেই পোশাকখাতে নিবেদিতপ্রাণ নারীরা তাঁর কবিতার মাধ্যমে হয়ে ওঠেন সম্মানিত। ত্রিদিব দস্তিদারের শৈল্পিক মুনশিয়ানায় সেই নারী পোশাকশ্রমিকদের জীবন হয়ে উঠছে চিত্ররূপময়। "পোশাক-কন্যা" তেমনই একটি কবিতা। তার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

জীবিকার অনিবার্য তাড়নায়
তোমার নির্ধারিত স্যুইং মেশিন নড়ে ওঠে
স্বল্প আয়ের শ্রম-বিনিয়োগ চুক্তিতে
তোমার প্রাত্যহিক জীবনের স্টিচিং মুদ্রার বিনিময়
যেন শীতের সান্ধ্য পুলওভার বোতামের চাঁদ...
—হে পোশাক-কন্যা
তোমার শ্রমের অপ-বিভোর এই দেশে
কারা ধরে রাখে পুঁজিবাদের লুকানো ছোবল
পোশাকের প্রতিটি সুগন্ধি-ভাঁজে
তোমার শ্রমের ঘামে ভেজা আমাদের সময়
অথচ অর্থহীন লিখে রাখে কারা
পোশাকের একটি নাম 'রপ্তানিযোগ্য' মনোহর মণ্ডল?

(ত্রিদিব; ২০০৫: ১৮০)

পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতে, অগণতান্ত্রিক শক্তির কাছে সাধারণ মানুষ অসহায়। সেই অসহায়ত্ব জয় করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন যে বিজয়ের স্বপ্ন ত্রিদিব দস্তিদারের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত, তার নামই মুক্তি—অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি কৃষক-শ্রমিকের জন্য কবিতায় শৈল্পিক শব্দযোজনার মধ্য দিয়ে সেই বিজয় তথা মুক্তির পথনির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলাদেশের কবিতায় দিনেশ দাশ-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যধারার আরেকজন কবি সমুদ্র গুপ্ত (১৯৪৬-২০০৮)। জনচেতনাকে কবিতার শিল্পিত অবয়বে স্থান দেওয়ায় ছিল তাঁর বিশেষ অঙ্গীকার। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে কবি ও কবিতার অংশগ্রহণে ছিল প্রভূত আগ্রহ ও অঙ্গীকার। তাঁর কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের এমন স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে শোষণমুক্ত পৃথিবী রয়েছে। কবিতাকে সমৃদ্ধ করতে তিনি কৃষক-শ্রমিককে কেবল প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং কৃষক-শ্রমিকের স্বপ্ন-বাসনা এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে এ-শিল্পমাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। তিনি কবিতার শব্দভাষ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেন। এর জন্য কবি যূথবদ্ধতা এবং জাগরণের প্রত্যাশা ও সম্ভাবনাকে আগলে রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে যেভাবে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনা ক্রমশ বেহাত হয়ে গেছে, সেটা কবির সামগ্রিক উপলব্ধিকে প্রভাবিত করেছে। একাত্তরে ভৌগোলিক স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত মুক্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তি যে মানুষ পায়নি, সে-বিষয়ে কবি সচেতন ছিলেন। যে-কারণে তিনি চেয়েছেন সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং তারুণ্যকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'আরো বেশি স্বাধীনতার জন্যে তুমি যুদ্ধ করো।' গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে তিনি বলেন, শরীরে যৌবন থাকতে পরাধীনতাকে তিনি মেনে নিতে চান না। সমুদ্র গুপ্ত ব্যক্তিজীবনে প্রগতিশীল বিভিন্ন সংগঠনে সক্রিয় থেকেছেন এবং শোষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে লিপ্ত থেকে পৃথিবীটাকে বদলাতে চেয়েছেন; যে পৃথিবী হবে শ্রমজীবীর স্বপ্নরাজ্য। তাঁর কবিতা সমকাল পেরিয়ে বর্তমানকালেও জনগণের মুক্তিচেতনার পতাকা বহন করে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মতো আন্দোলনের মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর কবিতার বিষয় ও আন্দোলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটেনি। আর বিরোধ ঘটেনি বলেই যাদের জন্য আন্দোলন, সেই কৃষক-শ্রমিকের কল্যাণভাবনা তাঁর কবিতার অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। তাই বলে মিছিল বা আন্দোলনের ভাষার মতো বাঁধভাঙা আবেগে ভেসে যায়নি তাঁর কবিতা। শিল্পভাবনায় সজাগ কবি আবেগ ও অঙ্গীকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। আবেগ ও বক্তব্যকে সংযত করে কবিতাকে সর্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে শব্দচয়নে যেমন উচ্চকণ্ঠ হননি, তেমনি ম্রিয়মাণও হয়নি তাঁর কবিতার স্বর। শিল্পের প্রতি নিবেদিত থেকে কবিতার স্বকীয় এক কাব্যভাষাও নির্মাণ করে গেছেন সত্তরের

অন্যতম এই কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রোদ ঝলসানো মুখ*; প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। এ-কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে সাম্যবাদী চেতনা। মানুষের তুমুল জাগরণের ভেতর দিয়ে যে সমাজ গঠিত হতে পারে, সেই সমাজের প্রত্যাশী কবি বলেন :

> প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীতে সামাজিক ঘূর্ণিঝড় চাই
> চাই সেই বেগবান বায়ু
> যে বাতাসে পত্রবৎ উড়ে যাবে ঘৃণ্য মানুষ তা শেকড় সমেত...
> প্রতিষ্ঠিত ভুল সত্যের ভিত্তিমূলে খাপ খোলা তলোয়ারের মতো ঢুকে যাবে
> যুদ্ধরত কর্মজীবী মানুষের হাত...
> এবং জীবনের বিপরীতে মৃত্যুর অট্টহাসি কলরোল
> অস্বীকার করে আমি তাই
> সামাজিক ঘূর্ণিঝড় চাই, চাই সেই বেগবান বায়ু
> যে বাতাসে পত্রবৎ উড়ে যাবে ভুল সত্য
> ভেঙে যাবে ভিত্তিহীন মিথ্যে স্বাধীনতা
>
> (সমুদ্র; ২০০৯: ২৭)

মানুষের সমতায় বিশ্বাসী কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলেছেন, 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!/ আসছে নবীন—জীবনহ-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!/ তাই সে এমন কেশে বেশে/ প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—/মধুর হেসে!/ ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!' (নজরুল; ১৯৯৬: ৬) কবি সমুদ্র গুপ্তের 'সামাজিক ঘূর্ণিঝড়' যেমন সমাজের সমতাবিধানের জন্য, সমাজকে নতুন—করে গড়ার জন্য অপরিহার্য, তেমনি কবি নজরুলের ভাবনায় ছিল, পুরোনোকে, অচলকে অমানবিকতাকে ধ্বংস করেও কেবল কাঙ্ক্ষিত সাম্যের সমাজ গড়ে উড়তে পারে। দুই কবিকেই সমাজের প্রচলনের বিরুদ্ধস্রোতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই 'সামাজিক ঝড়ের' তাড়নায় কবি অবলোকন করতে পারেন শ্রমে-ঘামে দিনাতিপাতে জীর্ণ স্বাস্থ্যের শ্রমজীবীকে, যিনি জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেন জিইয়ে রেখেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত শ্রেণিসংগ্রামকে। কেননা, 'বাংলার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তাদের শ্রমে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। সভ্যতার পিলসুজ জ্বেলে রেখেছে তারাই।...বাংলার কৃষক সুদিনে মানবসমাজের আদর্শ। দুর্দিনে সে সহনশীল, শান্ত, সংযত। সম্পদে সে উদার অতিথিপরায়ণ। মানবতার মহান গুণাবলীতে তারা গরীয়ান। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সবসময় তারা প্রতিস্পর্ধী। কাল বিবর্তনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আজও তাদের চরিত্র বদলায়নি।' (হায়দার; ২০০৪: ৯-১০) পুঁজিবাদী সভ্যতা এগিয়ে গেলেও যুগের পর যুগ কালের চিহ্ন বহন করে যারা, তারা কবির কাছে সভ্যতা বিনির্মাণের অবিকল্প কারিগর। তাদের বয়সী-শরীরের ভাঁজে

ভাঁজে থাকে জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা, থাকে কবির শ্রেণিসংগ্রাম পাঠের জীবন্ত উপাদান। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন :

স্বপ্নের সেই সোনালি বৃদ্ধকে আমি
অভিবাদন জানাবো
যিনি আমাকে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে
দিন দিন শিক্ষিত করে তোলেন, যিনি
তাঁর কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজ
একটি একটি করে খোলেন, আর
আমাকে দেখান
মানুষের কব্জির যাবতীয় কাজ ও কারুকাজ
তিনি দেখান আর বলেন কোমল স্বরে
শ্রেণিযুদ্ধের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস
(সমুদ্র; ২০০৯: ২৯)

নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের আগে প্রকৃতির সঙ্গে যেমন, ঘন জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় যেমন, তেমনি নানা দৈত্য-দানবতুল্য জীবজন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে। সভ্যতার নানা বাঁক পেরিয়ে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদৌলতে জীবনযাপনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু ‘পুঁজিবাদী’ সমাজের সেই লড়াকু মানুষের ওপর চেপে বসেছে পদ্ধতিগত ‘দানব’। কিন্তু কবি সমুদ্র গুপ্তের আশাবাদী চোখ তাঁর সেই “আমার স্বপ্নের সেই সোনালি বৃদ্ধ”কে দাঁড় করিয়ে বলতে চায়, ‘মানুষের ইতিহাস ক্রমশ এগোয় সম্মুখে/ সমৃদ্ধতর এবং বেঁচে থাকার দিকে।’ (সমুদ্র; ২০০৯: ২৯) এভাবেই কবি এগোতে থাকেন “জীবনের দিকে”। এখানে তিনি শ্রমিকের জীবনের কর্মময়তাকেই উচ্চকিত করেছেন। এক্ষেত্রে রচনকালও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটলেও যখন অর্থনৈতিক মুক্তি অনর্জিত থেকে গেছে, তখন দেশ নিমজ্জিত হয় অন্ধকার গহ্বরে—পঁচাত্তরের মধ্য-আগস্টে স্বাধীনতার স্থপতিকে হত্যা করা হয়।

মূলত একাত্তর থেকেই কবির *রোদ ঝলসানো মুখ* কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলি রচিত হতে থাকে। এমন অবস্থায় সমাজতন্ত্রী কবির উপলব্ধি সুতীক্ষ্ণ ও গভীর হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে ইতিহাসের নতুন বাঁক প্রত্যক্ষ করে করে তিনি ধাবিত হতে চান জীবনের খোঁজে; যেখানে জীবন ঘষে ঘষে আগুন যেমন জ্বালাতে হয়, তেমনি জীবনের বিনিময়ে জাগে প্রাপ্তির প্রত্যাশাও। তাই তাঁর বার্তা খুব স্পষ্ট :

চতুর্দিকে জনযুদ্ধ ঝলসাচ্ছে এখন
যুদ্ধের সুতীব্র ঝলকে কিষাণের হাতে কাস্তে চমকাচ্ছে যেনো
রোদ পিছলানো জয়ের নিশান
শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেয়া রাইফেলে বুলেটে যেনো

বিজয়ের মহাসঙ্গীত
শ্রমিকের রক্তে যেনো চিরকালের বাঁধভাঙা তুমুল তুফান
আমার তোমার এবং
তোমার আমার মতো কৃষকের শ্রমিকের বাপভাইবোন
মা এবং কমরেড শহীদের লাশ যেন লাশ নয়
আমাদের ন্যায়যুদ্ধে বিজয়ের ভীষণ বিশ্বাস।

(সমুদ্র; ২০০৯: ৩৭)

রক্তের বিনিময়ে, ত্যাগের বিনিময়েও যেন আত্মতৃপ্তি পেতে চান কবি। 'যুদ্ধ এবং দুঃখ' জীবনসংগ্রামের দুই অনিবার্য উপাদান; আবার শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুগ যুগ ধরে চলমান এ লড়াইয়েও জীবনের ঘাটতি হবে না। তবু রক্তপাত থেকে আমাদেরকে তিনি নিয়ে যেতে চান জীবনেরই দিকে। কারণ, চারদিকে 'ঝলসানো মুখ' দৃশ্যমান হলেও 'ধানের চারার মতো উঠে আসছে জীবন।' এভাবে শ্রমিকদের জাগরণ ঘটিয়ে কবি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন। হয়তো সেই কারণেই রচনা করেছেন "শ্রমিক ইশতেহার" এবং শ্রমিকদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেই তিনি পৌঁছে যেতে চান যাপিত সময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—সমাজের সর্বত্র। এক্ষেত্রে সভ্যতার শুরু থেকেই যেমন শ্রমিককে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়েছে, তেমনিভাবে সমস্ত দুর্যোগের বিপরীতেই তিনি জারি রাখতে চান শ্রমশক্তিকে। স্বাবলম্বী শ্রমিকের সুখস্বপ্নকে তিনি কাব্যসত্যে পরিণত করতে চান অনিবার্য শব্দযোজনায় :

সামগ্রিক অত্যাচার ও বিরোধিতা পর্যুদস্ত করে
গ্রানাইট ভাস্কর্যের মতো মাথা তুলছি
শক্তি সাহস এবং শিল্পের ভাষায়
আমাদের বিস্তৃত হাত এখন পৌঁছে যাচ্ছে
সমাজের সর্বস্তরে...
বিশাল আকাশের মতো
আমাদের হাতের আওতায় এখন সমগ্র পৃথিবী

(সমুদ্র; ২০০৯: ৪১)

কবির এই আত্মবিশ্বাস আমাদের সমাজবাস্তবতায় অনেকটাই রোমান্টিক কল্পনাপ্রসূত। নইলে তিনি 'আমাদের হাতের আওতায় এখন সমগ্র পৃথিবী'র মতো উচ্চাভিলাষী স্বপ্নের ভাবনাকে কবিতায় আরোপ করতেন না। আসলে কবি ব্যতিরেকে শ্রমিকদের নিয়ে এমন সুখস্বপ্নের ভাবনা ভাবা অন্য কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মাঠে-ময়দানে আন্দোলনের সক্রিয়তাই হয়তো কবি সমুদ্র গুপ্তকে কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ লাঘবের দিকে অগ্রগামী হতে সাহসী করে তুলেছে। ফলে কবিতার অবয়ব গঠনে

তিনি নিজস্ব শব্দচয়নে অগ্রসর হয়েছেন। তেমনই আরেকটি কবিতা "সময়ের কবিতা"। কিছু কবিতা বিষয় ও শব্দবয়ানের যৌক্তিকতায় কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। এ-কবিতার ক্ষেত্রেও নির্দ্বিধায় তেমনটি বলা যায়। পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক। তা সত্ত্বেও তারা যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, বঞ্চিত, নিগৃহীত। কবির কালে চলমান সেই চিত্রকে কবি এমনভাবে ধারণ করেছেন, যেন কোনো চলচ্চিত্রের নিপুণ দৃশ্য। প্রতীক-উপমায় ঋদ্ধ অন্তর্গত আবেগকে কবি ধারণ করেন এভাবে :

গ্রামে প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাচ্ছে কালোহাত, আর
লাল হয়ে যাচ্ছে সব মাটির মানুষ
টকটকে লোহার মতোন
জ্বলে যাচ্ছে গোলাঘর ফাঁকা বুলি
মিথ্যা দেশপ্রেমের প্রতি অন্ধবিশ্বাস
শ্রমিকের খুনের সাথে কারখানায় জ্বলে যাচ্ছে শোষণের ফাঁকি...
গ্রামে প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাচ্ছে কালোহাত, আর
লাল হয়ে যাচ্ছে সব মাটির মানুষ
টকটকে লোহার মতোন
এবং সেই মানুষের জন্ম দিচ্ছে স্বাধীনতা
(সমুদ্র; ২০০৯: ৫৬)

কবি লক্ষ করেছেন, সভ্যতার অগ্রগতিতে শ্রমিক রেখে যাচ্ছে অকৃত্রিম অবদান। স্বাধীন ভূখণ্ডপ্রাপ্তিতে যেমন শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য, তেমনি অনবদ্য অর্থনৈতিক শক্তির সচলতায় শ্রমিকের অবদান। দেশের মানুষের খাদ্য উৎপাদনে যেমন রয়েছে শ্রমিকের ভূমিকা, তেমনি নিত্যব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানিতেও নির্ভর করতে হয় শ্রমিকের ওপরই। তাই কবির মতে, তারাই অর্থাৎ 'সেই মানুষেরা জন্ম দিচ্ছে স্বাধীনতা।' কারণ, অবহেলিত গ্রামীণ জনপদের কৃষক-শ্রমিকেরা কেবল 'প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাচ্ছে' আর 'শহরেই শুধু শীতল বাতাসে/ জমে যাচ্ছে ঘর বাড়ি নগর দালান।' (সমুদ্র; ২০০৯: ৫৬) এভাবেই যেহেতু প্রতিনিয়ত জন্ম দিচ্ছে সত্যিকারের স্বাধীনতা, তাই কবি কবিতাশিল্পের ওপর ভর করে মৃদু ক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন তাঁর মনোবেদনা। তাঁর পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে গণমানুষের চেতনায় নিজেকে উজ্জীবিত রাখার কারণে। তিনি গণমানুষের জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবিতাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। তাই 'প্রতিনিয়ত জীবনের সত্যকে তুলে আনার প্রয়োজনে যে কঠিন সংগ্রাম ও সময়ের মুখোমুখি হতে হয় তাদের, সেই সংগ্রাম ও সময়কেও কবি চিত্রিত করেন পরম বিশ্বস্ততায়।...শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্বপ্নের কথা বলে যাচ্ছেন যে কবিরা, সমুদ্র

গুপ্ত সেই ধারাবাহিকতাতেই রচনা করেছেন তার নান্দনিক পঙ্ক্তিসমূহ।' (মুনীর; ২০১৩: ২৭) তাই আন্তরিক অবলোকন প্রয়াসে শোষিত-বঞ্চিত সেই মানুষদের তিনি বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন। একজন কৃষকের স্বপ্ন বেড়ে ওঠে যে চষা-জমিতে, সেখানে তার শরীর কীভাবে কাজ করে, তার জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়; যেন তিনি নিজেও এক স্বপ্নবান ক্রুদ্ধ কৃষক :

স্বপ্নের হাত ধরে পথে নামতেই
কোথা হতে আসে সেই হাতটা
নিমেষেই বিলকুল সব সেই হাতে গেঁথে যায়
স্বপ্নের কাঠামো নিয়ে বাড়ি ফিরি
চিরকেলে বাংলা কিষাণের মতো
আদুল গায়ে চিমসে পেট
হাঁটুভাঙা দ-এর মতো বসে থাকি গালে হাত
চোখে শুধু প্রাণের চিহ্ন
এক টুকরো ক্রোধের আলামত

(সমুদ্র; ২০০৯: ৭১)

সমুদ্রের কবিতায় বাংলার কৃষক আসে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের কৃষকদের একাংশ প্রতিবছর ঋণের কবলে পড়ে এবং তারা সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে লুকিয়ে থাকা 'কালো হাত' তাতে অমানবিকতাকে উসকে দেয়। ফলে জনপ্রতিনিধিদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের কল্যাণের বদলে অকল্যাণ নিয়ে আসে। কবি সে-কথাও বলেন জটিল বাস্তবতায় :

কৃষিঋণের মতো মহার্ঘ্য স্বপ্নটাকে
যতোবার প্রায়ই বাগিয়ে ফেলি
চেয়ারম্যান মেম্বর
মাতব্বর টাউটের স্বরূপ ধরে
কোথা থেকে উদয় হয় হাতটা
ভুয়া শরিকানার জাল জমির রেকর্ড
লোন অফিসে দাখিল করে
বারোটা বাজিয়ে দেয়

(সমুদ্র; ২০০৯: ৭২)

কেবল বিষয় হিসেবেই কৃষক স্থান পায় না সমুদ্রের কবিতায়—কৃষকের জীবন, সংকট, ক্ষোভ ও নিত্যপ্রয়োজনও কবিতার শব্দসম্ভারে অনায়াসে যুক্ত হয়। কবিতার প্রতি সমুদ্রের দায়িত্বশীলতা যে

দায়বদ্ধতার হাত ধরে উপনীত হয়, তা-ই বারবার প্রতীয়মান হয়। এই চেতনার হাত ধরেই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> যুদ্ধ এবং জনযুদ্ধের কথা, বৃক্ষ এবং শিকড়ের কথা, মার্ক্সীয় নান্দনিক চেতনার নিরিখে শ্রমজীবী মানুষের কথা, যুগ-যন্ত্রণা, ক্ষুধা এবং সংগ্রামের পটভূমিতে প্রেম এবং ভালোবাসার কথা, যা কেবল ব্যক্তিক অনুভূতির আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিসিজম নয় এবং এই সমস্ত বাধাগ্রস্ততা অতিক্রম করে তারপরও স্বাপ্নিক এবং স্বপ্নদ্রষ্টা কবি। স্বপ্ন দেখেন মানুষের মঙ্গলের, বিজয়ের এক অসম্ভব সুন্দর সমাজ অর্জনের যা অনাবিল শান্তির আধার এবং স্বপ্নই তার রোমান্টিসিজম যা তাঁর মানসপটকে তুলে ধরে অনেক উঁচুতে। (মুনীর; ২০১৩: ২৭)

তাঁর কবিতায় কৃষকের-শ্রমিকের ক্ষোভ-সংকট-সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হলেও পৃথিবীর প্রতিটি সংগত অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের প্রতি তিনি ছিলেন আশাবাদী। ন্যায়যুদ্ধ মানেই বিজয় সুনিশ্চিত। কারণ তিনি মনে করেন :

> কবিই পৃথিবীকে প্রথম দেখিয়েছেন
> সকল শোষণ নির্যাতন বৈষম্য এবং
> অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত বিদ্রোহের বিজয় নিশ্চিত
> যতোই দুরূহ দীর্ঘ অসম্ভব মনে হোক
> ন্যায়যুদ্ধের গন্তব্য বিজয়ের দিকে (সমুদ্র; ২০০৯: ৭৫)

সবচেয়ে বড় কথা কবি সমুদ্র গুপ্ত যেভাবে তাঁর কবিতায় কৃষকদের আদ্যোপান্ত চিত্রিত করেছেন, সে রকম চিত্রায়ণ বাংলাদেশের খুব কম কবির কবিতাতেই দেখা যায়। যেমন বাংলার অভাবগ্রস্ত কৃষকদের চেহারা কেমন, কেমন তাদের শরীরের গঠন, গায়ের বর্ণ, চোখের দৃষ্টি, কেমন তাদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মানসিকতা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয় পরম মমতায়। (মুনীর; ২০১৩: ২৭) তাই কবিও তাঁদেরই একজন হতে পারেন এবং তাঁর কাছে কৃষকেরাই সবচেয়ে সভ্য মানুষ। তাঁদের জীবনে দুর্ভিক্ষ আছে, সংকট ও সংগ্রাম আছে, তবু দিনশেষে তিনি কৃষকদের নিয়ে আশাবাদী। *এখনো উত্থান আছে* (১৯৯০) কাব্যগ্রন্থের নামকরণে তিনি হয়তো সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন :

> এইতো এখনো আছি
> ন্যুজ পিঠ, দেব ছোটখাটো কৃষ্ণ আয়তনে
> প্রাণপণে কি-যে ব্যস্ত ফসলের টানে
> আমি জানি কতো শক্তি কতো সত্য শস্যদের গানে
> তোমরা তো সভ্যমানুষ
> খাদ্যের বিনিময়ে আমাদের কৃতার্থ করো

পুরুষ পুরুষ ধরে সুদে ঋণদানে...
সামনে দুর্ভিক্ষ পেটে ক্ষুধা তবু
আমি তো এখনো আছি বাংলার কৃষক

(সমুদ্র; ২০০৯: ১০৩)

ঠিক এভাবেই দেশমাতৃকার সবচেয়ে গর্বিত সন্তান কৃষক ও নিজের অস্তিত্ব অভিন্ন গাঁথুনিতে ভাস্বর হয় কবিপ্রাণের অকৃত্রিম মায়ায়। কারণ খুব ছোট কলেবরের কবিতায় তিনি তেমনই এক সর্বজনের গ্রহণযোগ্য কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর একটি কবিতার নাম "জানি"। এখানে তিনি বলেছেন :

নিজহাতে জমি চাষে লাগিয়েছি একখানি সূর্যের চারা
প্রত্যেক সকালে দেখি তার মূলে রক্তের ফোয়ারা
আমি জানি সেই রক্ত কার
সেই রক্ত আমাদের দেশমাতৃকার

(সমুদ্র; ২০০৯: ১০৩)

কবি কখনো নিজেকে কৃষকের পরমাত্মীয়, কখনো কখনো নিজেই কৃষক হয়ে ওঠেন সমহিমায় ভাস্বর কবিতায়। ফলে কৃষককে নিয়ে কবি যখন পরিহাস করেন, তখন মনে হয় নিজেকে নিয়েই পরিহাসে জীর্ণ করছেন নিজেকে। তীর্যক পরিহাসে কৃষকজীবনের বাস্তব অবস্থার চিত্রায়ণ করার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রচণ্ড খাটুনির ফলে কৃষকের পুষ্টিহীন শরীরের যেমন হয়, তারই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা যেন "কোদাল কাব্য" :

ওহে চাষার পো
কি এমন খুচুর খুচুর করে চালাও কোদাল
মাটিতো ওঠে না যেনো মাটির থুতু
পাঁজরের হাড্ডি তো গোনা যায়
এমন বেরিয়ে আছে যেনো চাঁছাছোলা ফাল্টা বাখারি
মাথার মধ্যে ঘিলু তো শুকাতে শুকাতে
পাকা বেলের মতো নড়ে চড়ে...

(সমুদ্র; ২০০৯: ১০৯)

দেশের বেশির ভাগ কৃষকের শরীরের এমন বর্ণনায় যখন জীবন্ত হয়ে ওঠে তাদের জীবন, সামন্তযুগের জমিদারি শোষণের মতো খাজনা আদায়ের প্রচলন না থাকলেও কৃষিঋণের বোঝায় আক্রান্ত কৃষকের পুঁজি থাকে সুদখোর মহাজনের কাছে। উপায় হিসেবে যা বলেছেন

কবি, তাতেও রয়েছে তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষ। এই অনিবার্য সত্য ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তব জীবনের সুচারু দৃষ্টিসম্পন্ন কবি সমুদ্র গুপ্ত :

গোরু দিয়ে আর আর কিইবা হবে
ও চাষার পো
কৃষিঋণের অফিস থেকে
জবরদস্ত দুটো অফিসার এনো
ক্ষেতে লাঙল দিয়ো মই দিয়ো
খড় ভূষির বদলে
ক্ষেতের ধান আর জমি বেচে
লোনের সুদ খেতে দিয়ো

(সমুদ্র; ২০০৯: ১০৯-১১০)

কবি সমুদ্র গুপ্ত প্রকৃতপক্ষে অন্তরাত্মা দিয়ে কৃষকের দুর্দশা এবং তাদের জীবনের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই এমন আন্তরিক উচ্চারণে জীবনঘনিষ্ঠ কবিতা নির্মাণ করতে পেরেছেন। কেবল 'আবহমান কাল থেকে শোষিত নিপীড়িত কৃষক অধুনাকালেও কিভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, তা সমুদ্র ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।... ঋণসহায়তা দেয়ার নামে এইসব অফিসারগণই যখন অভাবগ্রস্ত কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তখন নির্দ্বিধায় তাদের উপর নির্দয়ভাবে চড়াও হন।' (মুনীর; ২০১৩: ৩০) এসব বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছেন বলেই বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনবাস্তবতা নির্মাণে কবির এই স্বকীয়তা আলাদা মর্যাদায় অমর হয়ে থাকবে।

আবু হাসান শাহরিয়ার (জ. ১৯৫৯) বাংলাদেশের কবিতার অন্যতম পরিচিত এক নাম। কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ গত শতকের সত্তরের দশকে। তাঁর শেকড় গ্রামীণ পটভূমিতে প্রোথিত। তিনি এখনো কবিতাচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। নাগরিক জীবন তাঁকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিলেও শেকড়-সংশ্লিষ্ট শব্দসম্ভার তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধি দান করে। কবিতাযাপনে নর-নারীর প্রেম এবং নিজস্ব স্বপ্নধরায় বিভোর থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য করেন। প্রেম, প্রকৃতি, রূপকথা, প্রেমাস্পদের নানামাত্রিক উপস্থাপন তাঁর কবিতাকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। সত্তরের উপর্যুক্ত সমাজ-সচেতন কবিদের মতো করে সমাজভাবনা তাঁকে আকৃষ্ট করে না। ফলে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থাকা নানা অনুষঙ্গ উঠে এলেও কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষের জীবন, সংগ্রাম, সংকট, স্বপ্ন তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পায়নি। মুষ্টিমেয় কবিতায় তিনি কৃষক ও শ্রমিকের ইমেজ ব্যবহার করেছেন, তবে তা বিষয় হিসেবে নয়। বরং তা করেছেন কবিতার বিষয়ের শিল্পসৌন্দর্য বৃদ্ধির

উদ্দেশ্যে। সুতরাং সমাজের দায় মেটানোর জন্য নয়, শিল্পের দায় মেটাতে শ্রমজীবী মানুষকে কবিতায় কেবল শব্দের দ্যোতনা হিসেবে যথোচিত ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘জীবন কুড়াই জীবনের প্রতিটি সংঘর্ষ থেকেও। সেই জীবনেরই সামান্য প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি আমার কবিতা। জীবনের ছবি থেকেই তুলে আনি কবিতার চিত্রকল্প। জীবনের হাসি-কান্না হাহাকার থেকেই উঠে আসে আমার কবিতার ধ্বনিময়তা।’ (শাহরিয়ার; ২০১৭: ০৯) গ্রামীণ শেকড়ের অবিচ্ছিন্ন থাকা এই বোধ থেকেই তিনি রচনা করতে পারেন “মাটি-বংশধর” এবং গাঁথতে পারেন এমন পঙ্ক্তিসমূহ :

আমি লুঙ্গি-বাউলের নাতি, শাড়ি-কিষানির ব্যাটা
আমার বাপের নাম কে না জানে—চাষা-মালকোঁচা
আমি গামছা-কুমোরের প্রতিবেশী, আরও জ্ঞাতি খড়ম-তাঁতিরা
আমি লুঙ্গি-বাউলের নাতি, শাড়ি-কিষানির ব্যাটা।...
মাটি ভাষাভাষী শস্য, লতাগুল্ম, বৃক্ষ, বনরাজি
আমাকে শেখায় বীজমন্ত্র; আমি শরীরের মাটিভাষা জানি
মাটি মাতৃভাষা; আমি সে-ভাষায় সোঁদাগন্ধ পুথি পাঠ করি
যা পড়ি শিকড়ে পড়ি; বাকলে লিখি না নাম তর্জমাবশত।
(শাহরিয়ার; ২০১৭: ৪১)

আবু হাসান শাহরিয়ারের কবিসত্তার বিকাশ নাগরিক পরিবেশে স্পষ্ট হলেও তিনি মাটির নিকটবর্তী থাকতে চেয়েছেন। কবিতার শব্দ নির্বাচনে সেটি স্পষ্ট। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের পোশাক, পোশাক পরার ধরন যখন কবিতায় সমীপ্যবর্তী হয়, পোশাক পরা কিংবা তাদের আচরণের কারণে যখন তাদের নামকরণ হয়, তখন তাতে কবির অকৃত্রিম উপলব্ধিই ভাস্বর হয়ে ওঠে। কবি যখন প্রেমের কবিতা রচনা করেন, প্রাধান্য না পেলেও কৃষক-শ্রমিক এসে যায় স্বতঃস্ফূর্ত আলংকারিক ব্যঞ্জনায়। তাতে কবিতা হয়ে ওঠে শৈল্পিক সুষমায় পরিপূর্ণ :

তুমি হও তুমি—তার চেয়ে আরও বেশি,
মনোভূমি জুড়ে অপার সুখের খনি;
শ্রমিক আমি সে-খনিতে তোমাকে খুঁজি
শাবল চালিয়ে। আজও পাওনি সে-ধ্বনি! ’
(শাহরিয়ার; ২০১৭: ২৩)

কবির এই প্রয়াস অব্যাহত অন্যান্য কবিতাতেও। মানুষের মন, শরীর, মাটি, কৃষক, ফসল এক অভিন্ন সুরভিতে ভরে ওঠে তাঁর কবিতা। কবির মননে-সৃজনে এর প্রভাব রয়ে গেছে শেকড়-সংশ্লিষ্টতার কারণে। তাঁর শব্দস্বরে যে নতুনত্বের প্রকাশ, তাও সম্ভব হয়েছে যাপিত জীবনে গ্রাম-

নগরের মিশ্র-প্রভাবের কারণে। নইলে এমন 'শরীরতত্ত্ব' তিনি খুঁজে পেতেন না, যেখানে বোধের সম্মিলন ঘটতে পারে। এমনকি ভালোবাসার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে 'ভূমিহীন চাষা'র সঙ্গে নিজেকে তুলনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না ওই সম্পৃক্তি না-থাকলে। তবে এভাবেই তিনি রচনা করে ফেলেন এক-একটি রোমান্টিক কবিতা। এতে পাশাপাশি তাঁর দৃষ্টি এবং দিকভঙ্গিও চিহ্নিত হয় :

দেখো, বোধের জলমহালে
ভালোবাসার চর জেগেছে।
এবার বুঝি বসত হবে।
তাই ভূমিহীন চাষা চোখে তোমার ধানি শরীর নাচে।
আয় নবান্ন চাষার ঘরে।
আয় নবান্ন নতুন ভিটেয়।

(শাহরিয়ার; ২০১৭: ৩৪)

আবু হাসান শাহরিয়ারের খুব কমসংখ্যক কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে কৃষক বা শ্রমিকের আগমণ ঘটেছে। তাতে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত থাকে। কবিতার সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য শব্দ-উপাদান হিসেবে তিনি কৃষক-শ্রমিককে উপস্থাপন করেন।

পঞ্চাশের কবিগণকে যেমন ভাষা আন্দোলনের প্রজন্মসন্তান বলা হয়, তেমনি সত্তরের কবিদেরও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মসন্তান বলা যায়। এই কবিগণ ষাটের দশকের স্বৈরশাসন এবং স্বাধিকার আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে করে বেড়ে উঠেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক সংকট সামনে নিয়ে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন; সাক্ষী হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের। তাঁদের দেখতে হয়েছে স্বাধীনতার স্থপতির সপরিবার খুন হওয়া, প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে স্বৈরশাসনে নিমজ্জিত স্বাধীন দেশে ধাতব হুঙ্কার। ফলে প্রতিরোধ-প্রতিশোধস্পৃহার কারণে এ-সময়ের অনেকের কবিতা স্লোগান-ধর্মী হয়ে উঠেছিল। অনেকে আবার কবিতায় রাজনৈতিক সংকটকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ তথা শিক্ষিত শ্রেণিকে উজ্জীবিত করার মানসে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন কেউ কেউ। হয়তো এসব কারণেও এ-দশকের কবিতাতেও কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ গুরুত্ব হারিয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশির দশকের কবিতা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আশির দশক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পঁচাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে সামরিক ছত্রচ্ছায়ায় যেভাবে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছিল, তা তখনো জনমনে স্থিতিশীলতা আনতে পারেনি। এরই মধ্যে সামরিক বাহিনীর সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক রাষ্ট্রপতিও খুন হন আততায়ীর হাতে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যায় আরেক সামরিক স্বৈরশাসনের দখলে। স্বাধীনতার পর জনমানুষের জীবনে স্বস্তির পরিবর্তে এসেছিল ভীতিকর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অনিঃশেষ অনিশ্চয়তা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় গন্তব্য। ষাটের দশকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াকু এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কবি-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা তখনো সক্রিয় নিজ কর্মক্ষেত্রে। তাঁদের অনেকেই নতুন প্রজন্মের সামনে নতুন দায়িত্ববোধ নিয়ে সৃষ্টিশীল মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছেন। আশির দশকে আবির্ভূত কবিদের সেই সময়ের উত্তাপ ও উন্মাদনা কবিদের সৃষ্টির পথকে বহুধাবিভক্ত করেছে। নগর-ঢাকাকে কেন্দ্র করে তখন মধ্যবিত্তের নতুন লড়াই চলমান। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের তরুণদের তখন নাগরিক জীবনের খোঁজে রাজধানী অভিমুখে ‘অনিশ্চিত’ যাত্রা। আধুনিক শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন, তথা অধ্যয়ন শেষে কর্ম-ধর্ম বেছে নেওয়ার মানস সত্ত্বেও যাঁরা লেখক হওয়ার বাসনায় উজ্জীবিত, তাঁদের সামনে তখনো সক্রিয় পূর্বসূরিদের সচল লেখনী। তাই কেউ কেউ ষাটের দশকের নতুন আবির্ভূত কবিদের মতো হতাশা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতাকে সঙ্গী করে কবিতা রচনা করেছেন। কেউ কেউ স্বকীয় ব্যক্তিত্বের আবেগের অন্দরমহলে অবগাহন করেছেন। কারও কারও কবিতায় কিঞ্চিতভাবে এসেছে সভ্যতা গড়ার কারিগর কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ। এ-সময়ের সমাজে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও মানুষ নগরমুখী হয়েছে আগের চেয়ে বেশি। সাধারণ মানুষের ভেতরে তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে আগের চেয়ে অধিক। এ-সময় শহুরে পরিবেশের বাইরে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা সাধারণ মানুষকে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী করে তোলে। এই প্রবণতা স্বাধীনতালাভের পরপরই শুরু হয়। সামাজিক-রাজনৈতিক নানা সংকটের পর কর্মসংস্থানের অভাবে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই প্রভাব পড়ে সৃষ্টিশীল মানুষের ওপর। গ্রামপ্রধান দেশের কবিগণ তাঁদের শেকড় ছেড়ে অধিকমাত্রায় নগরমুখী হওয়ার প্রয়াসে যূথবদ্ধ হয়েছেন। কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠালাভই হয়তো তাঁদেরও লক্ষ্য ছিল। ফলে কবিগণও তাঁদের সৃষ্টিতে নিজেদের নতুন তৈরি নাগরিক মনকেই প্রাধান্য দেওয়া শুরু

করেন। হয়তো এ-কারণেই পূর্বেকার দশকের কবিতার চেয়ে আশির দশকে শ্রমজীবী মানুষ উপেক্ষিত হতে থাকে। শুধু শ্রমজীবী মানুষই নন, এ সময়ের কবিগণ অত্যন্ত সচেতনভাবে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকের কবিতার উত্তরাধিকার অস্বীকার করে, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করে নতুন কবিতাপথ নির্মাণে অগ্রসর হন। প্রচল-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতায় নতুন পথ নির্মাণে প্রয়াসী হলেও তাঁরা বিভিন্ন ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে একধরনের গোষ্ঠী বা সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়েই নিজেদের কাব্যযাত্রা আরম্ভ করেন। এ-কবিপ্রজন্মের আবির্ভাব অনেকটা 'ত্রিশের আধুনিক' কবিগণের মতোই। সমাজ-সংস্কৃতি-দেশ নয়, তাঁদের কবিতায় প্রাধান্য পেতে থাকে কলাকৈবল্যবাদী দর্শন। এ-সময়ের কবিদের মননবৈশিষ্ট্য নিরূপণ-চেষ্টায় নিচের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক :

> সত্তরের কাব্যাদর্শে জাতিসত্তার পরম মুখচ্ছবি অঙ্কনের যে রোমান্টিকতা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকবিকে করেছিল উল্লসিত ও বিস্তারপ্রবণ, এ সময়ের কবি সেই অবস্থানে আর নেই। তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তিতার ছকে জাতির স্বরূপ ও জনমানুষের প্রতিচ্ছবি ও আবেগ ধারণে উন্মুখ হতে চাইলেন, ফলত সত্তরের উচ্ছ্বাসপ্রবল কাব্যময়তার প্রতি দেখা যায় নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনীহা। শিল্পসৃজনের ক্ষমতায় দাঁড়ানোর অভীপ্সা ও সেসঙ্গে বাংলা কবিতার মৌলরূপ চর্চার ঘোষিত সংকল্প দ্বারাও আশির কবিতা উচ্চাভিলাষী। (সূত্র: সাঈদ; ২০০৩: ২১)

বিষয় নয়, বিচিত্র চিল্পকল্পসমেত নতুন শিল্পভাষা নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক কবিই যেন তাঁদের প্রতিজ্ঞার অবিচলতা নিয়ে সামনে এগিয়েছেন। বিষয়কে গৌণ করে আঙ্গিককে তাঁরা যেন ঢেলে সাজাতে চাইলেন। মানুষের প্রতি কিংবা সমাজের প্রতি একধরনের ঔদাসীন্য নিয়ে তাঁদের উদ্দিষ্ট বাস্তবায়নে তাঁরা সাধনা করে গেছেন। তাঁদের কবিতায় ব্যবহৃত নতুন এ-শব্দযোজনা ও প্রকরণকৌশল এবং স্বাদের বৈচিত্র্যের কারণে পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

> কবিতায় নিবেদিত তরুণ প্রজন্মকে উল্লিখিত পরিস্থিতির প্রভাবই কবিতার ভিন্ন ভাবনার ভুবনে পৌঁছে দেয় যেখানে ব্যক্তিচেতনার টান প্রবল, নেতিবাদিতার প্রতি আগ্রহ ও বিরূপতা দুইই সমান মাত্রায় শক্তিমান। ইতিবাদী চেতনার পথ ধরে এদের আধুনিকতায় উত্তরণের চেষ্টা ইঙ্গিতময়তা ও শব্দচাতুর্য উভয় দিকের নিরীক্ষায় পরিস্ফুট। শব্দের ভিন্নতর ব্যবহারের দিকে এদের আগ্রহ দেখা দেয় সব চাইতে বেশি। (রফিক; ২০০১: ২১৯)

এই 'শব্দচাতুর্য'ই ত্রিশের কবিতার মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনাকে শানিত করেছে। ফলে তাঁদের কবিতা বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনা থেকে দূরে সরে গেছে। বাংলাদেশের সাধারণ কিংবা শ্রমজীবী মানুষ তখনই কবিতায় প্রাধান্য পায় কিংবা কবিতাকে তারা সমৃদ্ধ করে, যখন কোনো-না-কোনোভাবে কবিগণ থাকেন জন্মভূমির মাটি বা শেকড়ের প্রতি

অকৃত্রিমভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সচরাচর সামষ্টিক সৌন্দর্যের নান্দনিকতা নির্মাণের লক্ষ্যে কবিগণ সচেতনভাবে সৃষ্টিকর্মে সোচ্চার থাকেন। কিন্তু যাঁরা থাকেন না, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই তাঁদেরও থাকে ভিন্ন ভাবনার যুক্তি। বিকল্প ভাবনা-চেতনায় প্রতীক-সংকেত-উপমায় তাঁরা বিষয়কে নান্দনিক অবয়বে উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। তাই পূর্বসূরিদের সরাসরি উত্তরাধিকার তাঁরা বহন না করলেও বাংলাদেশের কবিতার ধারাবাহিকতা থেকে তাঁদের সৃষ্টিপ্রতিমাকে একেবারে বিচ্ছিন্নও বলা যায় না। বরং এ-দশকের কবিতার পরম্পরাও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পাঠকমনে বহমান। এ প্রসঙ্গে আশির দশকের অন্যতম কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সত্তরের দশক, ষাটের দশক কিংবা আরো দূরবর্তী কোনো সময়ের কাব্যবীজের বিলম্বিত উদ্ভিদ আশির দশকে পাতা মেলেছে হয়তো; হয়তো নব্বই-এর দশক কিংবা আগামী শতকের অজাত-অজ্ঞাত কোনো শোভনবৃক্ষের অঙ্কুর সূচিত হচ্ছে আশির দশকের কবিতা-ভূমিতে। পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নেই, নেই কোনো পিতৃহীন জন্ম। আশির দশকের কবিতা বাংলা কবিতার প্রবহমান ধারারই একটি উৎসারণ: এর নিজস্বতা ও নতুনত্ব এক চলমান ঐতিহ্যেরই নবীন কিন্তু পূর্ণতর উত্থান। (সূত্র: আরেফিন; ২০১৩: ৩৩৯)

অথচ এই দশকেও সক্রিয় ছিলেন পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের প্রধান কবিগণ। এমনকি পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের হাতে রচিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্মারক হিসেবে বিবেচিত 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'-এর মতো ঐতিহাসিক কবিতা। সেই রাজনৈতিক উদ্ভিন্ন পরিস্থিতিতে শিল্পমাধ্যমে সময়ের আরও অনেক স্মারক নির্মিত হয়েছে। তবুও আশির দশকে আবির্ভূত নতুন কবিগণ হেঁটেছেন নতুন ধারায়। এ-ধারায় নিজেদের কাব্যনির্মিতিই অগ্রজ কবিদের থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। সেই পার্থক্যসূত্রেই স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেন আশির কবিকুল।

পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকের কবিতায় যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, তার থেকে নতুনত্ব আনতেই আশির দশকে আবির্ভূত কবিগণ ব্যতিক্রমী ও ভিন্ন, স্বকীয় ও মৌলিক পথ খুঁজে নিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁরা কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে চাননি। তাই কাব্যজগতে স্থায়ী আসন পেতে নতুন পথ ব্যতিরেকে বিকল্পও ছিল না তাঁদের। এতে তাঁদের দৃষ্টিতে শেকড় প্রাধান্য না পেলেও কবিতাশিল্পের সমৃদ্ধি প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন প্রসারিত দৃষ্টির অধিকারী। এটা স্পষ্ট, সমাজ ও দেশাত্মবোধের দায় কবিতা-মাধ্যমে মেটাতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না; ছিলেন 'আত্মগত, প্রাজ্ঞ, সুবেদী এবং সুস্থির।' তবে 'এই সময়কার কবিরাও জীবনলগ্ন, সমাজঘনিষ্ঠ এবং দীপ্ত, কিন্তু তা কোনো অগভীর প্রয়োগবাদী অর্থে নয়।...এই দশকের কবিতায়

লক্ষ্য করা যাবে তাৎক্ষণিক পরিপার্শ্বের প্রতি যতটা না অনুরাগ, তারও চেয়ে বেশি চিরকালীনের প্রতি টান এবং অস্তিত্বের গভীর, গভীরতর সমস্যা ও মানবমনের রহস্যময় প্রধাবনসমূহের উন্মোচন।' (সূত্র: আরেফিন; ২০১৩: ৩৪২) ব্যতিক্রমী সৃষ্টিপ্রবণতা সত্ত্বেও হাতেগোণা কয়েকজন কবির কবিতায় এসেছে ঐতিহ্য, রাজনীতি, সমাজ ও মানবমনের প্রাত্যহিক এবং চিরকালীন বাস্তবতা, যা স্থানিক হয়েও বৈশ্বিক আবেদনে উচ্চকিত। এ-সময়কার কবিদের কবিতাসংখ্যা কম, গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের, কিন্তু তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন আত্মপরিচয় নির্মাণে কিংবা নতুন কবিতা-জগৎ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। তাই আবির্ভাবকালের চেয়ে পরবর্তীকালে কবিতার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আশির দশকের কবিদের অবদান অনন্য। আঙ্গিক কলাকৌশলে ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যিক পরম্পরা রক্ষার প্রতি প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতার সামগ্রিক বিষয় ও প্রাকরণিক চিন্তার অন্যতম ধরন নির্দেশ করে বলা যায় :

> আশির কবিদের ঐতিহ্যচেতনার একটি দিক তাদের কবিতায় মীথের পুনর্ব্যবহার। ভারতীয় কিংবা বৈশ্বিক মীথ যেমন, তেমনি ইসলামী মীথের ব্যবহারও ঘটেছে কারো কারো কবিতায়। বেহুলার ভাসানের পাশাপাশি এসেছে সখিনার আর্তনাদ, ইউরিডিসের পাশে দ্রৌপদী, হারকিউলিসের পাশাপাশি হরিশচন্দ্র। বিশ্বভিখারী আধুনিক মানস-ভূগোল পৃথিবীব্যাপ্ত; তার খনক-আঙুল আলম্বিক ইতিহাস-ভ্রমণ আর আনুভূমিক ভূগোল-পরিক্রমায় নিরলস ও অলজ্জ। এই বৈশ্বিক ভ্রামণিকতা এ-সময়কার বেশ কয়েকজনের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আশির দশকের কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ। লোকজ জীবন থেকে কাব্যবিষয় আহৃত হয়েছে তেমনি নাগরিক জীবনের বিবিধ অনুষঙ্গও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। প্রেম ও রিরংসা এবং তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ঘটনা আশির দশকের কবিতায় প্রায় গৌণ। (সূত্র: আরেফিন; ২০১৩: ৩৪২-৩৪৩)

আশির দশকের কবিতায় 'তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ঘটনা' কেবল উপেক্ষিত হয়েছে তা-ই নয়, 'আশি-দশকের প্রধান কবিদের কেউই তথাকথিত ও সমাজমনস্ক-রাজনৈতিক ধারার কবিতা লেখার চেষ্টা করেননি।...বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশে, রাষ্ট্রের এবং সমাজ-পরিবর্তনের নিরিখে সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে আমাদের রাজনীতি হয়ে পড়েছিল নিয়তি-নির্ভর। ফলে নতুন প্রজন্মের কবিরা সমাজ, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি হয়ে ওঠে বিরূপ ভাবাপন্ন।' (সূত্র: আরেফিন; ২০১৩: ৩৮৯) কারণ তত দিনে তাঁরা কবিতায় আত্মসমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন কাব্যভাষা, নতুন অবয়ব ও নববিচিত্র প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, এ-সময়েও 'সমাজমনস্ক-রাজনৈতিক ধারার কবিতা' লেখায় সক্রিয় ছিলেন পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের কবিগণ।

এই দশকের অন্যতম কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের (১৯৫০-২০১৩) কবিতায় কালের নতুনত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। শব্দচয়ন, ভাষার নতুনত্ব, প্রকাশের বৈচিত্র্য, বিষয় নির্বাচনের মুনশিয়ানায় তিনি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের এই যোদ্ধা-কবির কবিতায় সংখ্যায় কম হলেও উপমা-প্রতীকের আড়ালে উঠে আসে রণাঙ্গন ও বাস্তব সমাজসত্য। নিজের কাব্যপ্রবণতার বাইরে না গিয়েই কবি কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নিজেকে তাদের সগোত্রীয় হিসেবে উপস্থাপন করে। তাঁর কবিতাযাত্রার শুরু রোমান্টিক ভাবনাচিত্র বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। তাঁর কবিতা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান। তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনাকে আমৃত্যু পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কাব্যশিল্পজগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ তুলনামূলকভাবে বিলম্বে ঘটে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তিন রমণীর ক্বাসিদা*তে তিনি কাব্যবুননে নতুনত্ব এনেছেন। এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত “এলিয়েন” কবিতায় তিনি স্বকীয় কল্পলোকের চোখে নতুন ভঙ্গিতে দেখেছেন পৃথিবীকে। ঠিক ভিন্ন জগতের কোনো প্রাণী মানুষের পৃথিবীকে অবলোকন করলে যেমন দেখা যায়, তেমনি তিনিও দেখার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার মধ্যে ছিল বেদনা। ব্যজস্তুতির কৌশলে তিনি দায়িত্বশীল মানুষের অস্বীকার করার প্রবণতাকে উন্মোচন করেছেন। ‘এলিয়েন’ হয়ে সমাজকে নিয়ে তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ-রকম :

> আমি তোমাদের নগর চিনি না, পুষ্পিত বাগান চিনি না,
> চিমনির ধোঁয়া, শ্রমিকের স্বেদ আর বেশ্যার হাসি
> চিনি না—তোমাদের প্রেম-ঘৃণার পার্থক্য বুঝি না। অচেনা
> এ নগরীতে নামলাম মধ্যরাতে—
> করোটির দাঁতের মতো একসারি নিয়ন চোখে নিয়ে নামলাম।
>
> (আশরাফ; ২০১১: ৩৪)

এই কবিতাভাবনায় কোনোভাবেই কৃষক বা শ্রমিক কিংবা কায়িক শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত মানুষ প্রাধান্য পায়নি। কবির উদ্দেশ্যও তেমন ছিল না। তাঁর সৃজনপ্রয়াসে ছিল ভিন্ন প্রকল্পনা। কিন্তু কবিতার অনিবার্য উপাদান হিসেবে শ্রমিকের প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি। এতে সমৃদ্ধ হয়েছে স্বকল্পিত কবিতার অবয়ব। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *পার্থ তোমার তীব্র তীর*। এ-কাব্যগ্রন্থে তিনি আগের চেয়ে শব্দপ্রয়োগ ও ভাবনাবিন্যাসে অনেক পরিণত এবং সচেতন বলে মনে হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থের মতো এ-কাব্যের নামকরণেও তিনি পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এবং তৎপরবর্তী সমাজকে নানা সংকেতের মাধ্যমে তুলে এনেছেন কবিতার শরীরে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান নিয়ে সরাসরি

কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এ-কাব্যে। তবে তাঁর কবিতা বক্তব্যধর্মী নয়, রূপক-সংকেতে অত্যন্ত নান্দনিক। তেমনই একটি কবিতা "কার অশ্বমেধ ঘোড়া"। কবিতার নামকরণেও তিনি পুরাণের[৪] ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক সংকেতের আড়ালে তিনি যে জনমানুষের নানাবিধ কর্মচাঞ্চল্যে ক্রিয়াশীল সমাজকে এনেছেন, সেখানে জনতা উপেক্ষিত। এই দুঃসহ পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করেই হয়তো কবি অনুল্লেখিত প্রশ্ন রেখে তা মিলিয়ে দিয়েছেন পাঠকের সমীপে 'কার অশ্বমেধ ঘোড়া' :

> জীবনের বাহুমূলে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে সোমত্ত মানুষ
> চিরকাল, প্লাবন ঝড়ের মুখে বৈঠার আঘাতে
> উঠেছে ঘোড়ার মতো উজ্জ্বল আর্শির মতো ফেনা
> কারখানার চুল্লিগুলো বানিয়েছে টেরাকোটা মাটির মানুষ।...
> আমি তো যাবো না
> বরং হাতের লেসো নীরবে বিন্যস্ত করি শিরার উত্তাপে—
> অশ্বমেধ ঘোড়া হবে একদিন আমাদের খামারের শস্যগন্ধী জীব।
> (আশরাফ; ২০১১: ৬৪-৬৫)

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম *জীবনের সমান চুমুক*। নামকরণের ক্ষেত্রে এবার তিনি আগের চেয়ে বেশি বাস্তবমুখী। এতে স্পষ্টভাবে আরও একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর কবিতাবুননের কৌশল এগিয়ে যাচ্ছে আরেক রূপান্তরের দিকে। এবার তুলনামূলক কম অলংকারবহুল শব্দের দিকে তাঁর ঝোঁক। কৃষক-শ্রমিককে নিয়ে কবিতা রচনায় আগের মতোই কম মনোযোগী। তবে এ-কাব্যগ্রন্থের "শ্রাবণযাপন" কবিতার বিষয়ের সঙ্গে কবি নিজেকে একাত্ম করেছেন বলে মনে হয়। বাংলার প্রকৃতিতে শ্রাবণ মাস বিশেষ বৈশিষ্ট্য যোগ করে থাকে। শ্রাবণের বর্ষণ খুবই প্রয়োজনীয়। চষা জমিতে কৃষক কাঙ্ক্ষিত বর্ষণ পেলে নতুন ফসলের পরিকল্পনা করে থাকে। বর্ষার বিরামহীন তৎপরতায় জনজীবন, বিশেষত কৃষক-শ্রমিকের জীবনে এর বিপুল প্রভাব পড়ে। নিজেকে কৃষকের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে শ্রাবণের সৌন্দর্যকে আত্তীকরণ করেছেন তিনি। যেমন :

> আজ বিকেলে বৃষ্টি এলো
> শ্বেতবরণ এক ধোঁয়ার চাদর ধুচ্ছে কারা নদীর ঘাটে
> জলের ফেনা জড়িয়ে যাচ্ছে গুলবদনীর মুখ ও চোখে
> ছিটকে পড়ে সাবান গুঁড়ো, কলাপাতার বক্ষ বেয়ে
> নামছে সুখের অশ্রুপ্রপাত, বৃষ্টি এলো ইরির ক্ষেতে
> ভটর ভটর শব্দ তোলা ডিপটিবলের জলপিপাসা

আমার ঘরের খিড়কি বেয়ে
বৃষ্টি এলো
নতুন ধানের কণ্ঠনালির খোয়াব দেখা
বাতায় গোঁজা কাস্তেটাকে শানিয়ে দিয়ে।

(আশরাফ; ২০১১: ১১৮)

এই কাব্যগ্রন্থের "হায় পার্থ" কবিতার নামে কবির অজান্তেই যেন দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নামাংশ এসে গেছে। কবিতার চরণেও তাঁর এ প্রয়াস লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, কবিতাটিতে 'পার্থ' বলে মূলত তাঁরই এক বন্ধু ওয়ালিউলকে সম্বোধন করেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে কেন্দ্র করে খুব সন্তর্পণে হাতুড়ি ও শ্রমিকের সৌন্দর্য চিত্রিত করেছেন তিনি। এখানেও তিনি নির্মাণকলার কারিগর হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন এবং বলেছে 'হাতুড়িকে বন্ধু বলে হেঁটে যাই।'

দ্বাদশ নির্মাণকলা আমাকে শিখাও না!
এই হাতে হাতুড়িও কোনদিন মানাবে না জানতাম;
চতুষ্কোণ আঙুলের শ্রমিকেরা ঠুকঠাক দেয়াল ভাঙছে
সান্ত্বনা-প্রলেপ ঢেকে রাখে ইঁটের সমূহ ক্ষত;
আমি তো এখন হাতুড়িকে বন্ধু বলে হেঁটে যাই—
পর্বত-ডিঙানো উরু আমাকে দিলে না,...
আমি নিজেকে বিস্তৃত করতে এক সময় ছিন্ন হয়ে যাই
ইস্পাতের দিলে না কঠিন বুক, তবুও তো হাপরের
দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে বাঁচাতে পারতাম এক
নির্জন আগুন।

(আশরাফ; ২০১১: ১২৭)

কবিতাটির মধ্যে গূঢ় সংকেত হয়তো আছে। কিন্তু এর ভাষা আগের দুটি কাব্যগ্রন্থের কবিতা থেকে আলাদা। সরল কথায় সংকেতিত করে তুলতে গিয়ে কবি মনোনিবেশ করেছেন সভ্যতা নির্মাণের কাছাকাছি থাকা মানুষের জীবনের দিকে। তাতে নিজেকে তাঁদের সঙ্গে লীন করতে পেরেছেন আবার কবিতার নান্দনিকতাও সমৃদ্ধ করেছেন। কৃষক-শ্রমিকের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার না হলেও তিনি যে তাঁদের আত্মীয় মনে করে কবিতায় তাদের তুলে আনেন, সেটি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতার বিশেষ দিক। পরবর্তী সময়ে রচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে তাঁর এই প্রবণতা খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

আশির দশকে কবিগণ যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, তা ছিল অনভিপ্রেত। ওই পরিস্থিতিতে সত্তরের উত্তাল সময় পেরোনো এই কবিগণ যেমন কবিতায় নতুন পথ খুঁজছিলেন,

তেমনি নতুন আবির্ভূত কবিগণও নিজেদের মতো করে নতুন পথ খোঁজার প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে ত্রিশের কবিদের মতো পুরোনোকে অস্বীকার করার প্রবণতা ছিল। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা করতে গিয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। এর মধ্যে 'কিছু সংখ্যক প্রবীণ-নবীন কবি লেখক ও সাংবাদিকের শাসক-রাজের আনুকূল্যে বিকিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কবি-লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের বৃহৎ অংশ স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়।' তাঁদের কবিতাচর্চার ধরন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> দশকের প্রথম দিকে পূর্ববর্তী দশকের শেষার্ধের মতই কবিতা আত্মপরতার টানে ব্যক্তিচেতনার বৃত্তে অবস্থান নেয়। পূর্ব ঐতিহ্যমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তত্ত্বের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে, পরাবাস্তবতার দুর্বল অনুসরণে কবিতা নতুন পথ-সন্ধান নিশ্চিত করতে পারে না। তবু দশকের মাঝামাঝি সময়ে একগুচ্ছ তরুণ কবি'র তৎপরতা ছিল লক্ষ্য করার মত। এরা মঞ্চে ওঠেন, কবিতা পড়েন, নতুন কাগজ বের করেন এবং কবিতার অভিনবত্বে সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সংখ্যায় এরা অনেক। (রফিক; ২০০১: ২১৮)

এই কবিকুল গোষ্ঠী বিরোধিতার নামে আরও গোষ্ঠীবদ্ধ বা আরও বিভাজিত হওয়ার বাইরে অন্য কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাননি; 'তাঁরা চমৎকার স্ববিরোধী এক-একজন।'
এ সময়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য নাগরিক চেতনার প্রভাব। যদিও ক্ষুদ্র তবু প্রবল শক্তিধর বিত্তবান, এলিট শ্রেণির ফাঁপা অনাচারী চরিত্রের প্রভাব সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নানা নেতিবাদী মূল্যবোধের যে প্রকাশ ঘটায় তার প্রতিক্রিয়া তারুণ্যের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পূর্বোক্ত দশক বা সময়পর্বের তরুণদের সঙ্গে এদের মানসিক প্রভেদ হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট।

আশির দশকে আবির্ভূত অন্যতম প্রতিভাধর কবির নাম মাসুদ খান (১৯৫৯)। সত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক আবেশ পেরিয়ে কবিরা যখন সাধারণ জনতার মতো এক রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বকাল অতিক্রম করছিলেন, সেই সময়পর্বেই তিনি সক্রিয় হন কবিতার সৃষ্টিযাপনে। কবি হিসেবে তাঁর বিকাশপর্ব আশির দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীর পাতায় হলেও তাঁর কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেতে থাকে নব্বইয়ের দশক থেকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পাখিতীর্থদিনে* (১৯৯৩)। কবিতায় বিজ্ঞানমনস্ক শব্দের সঙ্গে লোকজ শব্দের গাঁথুনি, ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালের মিশ্রণ, শৈল্পিক চিন্তার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রকল্প সৃজন তাঁকে সমসময়ের কবিদের মধ্যে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে। সাধনার সঙ্গে আবেগের পরিকল্পিত ব্যবহার যে শিল্পকে আলাদামাত্রায় উন্নীত করে, মাসুদ খানের কবিতা পাঠান্তে তা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। কারণ, তিনি নিজেই বলেছেন, 'ভাষাকে চিরে-ফেড়ে, বিশৃঙ্খল করে দিয়ে, নেমে আসে কবিতা। ভাষার ভিতরে ঘটিয়ে দেওয়া

এক তুমুল রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে কবিতা।' (মাসুদ; ২০১৮: ০৯) মননে-সৃজনে এভাবেই তিনি কবিতারাজ্যে পরিভ্রমণ করেন। তবে তিনি যে অঞ্চল বা ভূগোলে এবং যে প্রাকৃতিক পরিসীমায় গড়েছেন নিজের অস্তিত্ব ও স্বকীয় মনোভূমি, তাতে তাঁর কবিতা অন্তত শহুরে কবিতা না হওয়ারই কথা। আবার পললভূমিতে বেড়ে উঠলেও তাঁর কবিতা যে কৃষক বা কৃষিশ্রমিকের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল, তাও তাঁর সচেতন এক প্রয়াসেরই ফসল। তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতার* (২০১৮) 'স্বগোতক্তির খসড়া'য় পাওয়া যায়, তাঁর জন্মাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য :

> শুকনা মৌসুমে সেখানকার কর্কশ লাল মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ধূলি ওড়ে খরখরে হাওয়ায়। আবার বৃষ্টি হলেই কোমল কাদা। সে-কাদা লাল, সান্দ্র, আঠালো। আবার আমার শৈশব কেটেছে নরম পলিমাটি-গড়া যমুনা-ধোয়া অববাহিকায়।...প্রমত্ত যমুনার বিচিত্র লীলাবিজড়িত সেই অঞ্চল। প্রচুর আলো ও ছায়া, অক্সিজেন, গাছপালা, পশুপাখি, প্রাণবৈচিত্র্য আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা মুখর এক জনপদ। পানি, স্রোত, বালু আর পলিমাটি। নদী সেখানে ভাঙে, আবার গড়ে। তালে-তালে তাই মানুষকেও ভাঙতে হয় অনেক কিছু, গড়ে তুলতে হয়। (মাসুদ; ২০১৮: ০৭)

বিস্ময়ের বিষয়, যে মানুষদের সহায়-সম্পদের ভাঙনের প্রসঙ্গ কবি এনেছেন অত্যন্ত ঋজু ও হার্দিক কণ্ঠে, সেই মানুষগুলোই প্রকৃতির সন্তান। জন্ম ও কর্মসূত্রে যারা কায়িক শ্রম ও কৃষিকর্মকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তারা তাঁর কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। যে মাটি ও আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন, সেসবের কোনো ইঙ্গিতই তাঁর কবিতাকে খুব বেশি স্পর্শ করেনি। তা সত্ত্বেও শৈল্পিক কবিতাপ্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং নিজের জগৎ তৈরি করে এগিয়ে গেছেন সফলতার দিকে। তাঁর মুষ্টিমেয় কিছু কবিতায় অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উঠে এসেছে শ্রমজীবনের প্রসঙ্গ। তার মধ্যে *পাখিতীর্থদিনে* কাব্যগ্রন্থের "লাল" কবিতা একটি। কবিতাটিতে অত্যন্ত সুকৌশলে কবি সভ্যতা গড়ার কারিগরদের প্রসঙ্গ এনেছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্য-শ্রমজীবনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে গড়ে ওঠা ইমারতের কথা বলতে গিয়ে তিনি কবিতাটিকে নির্মাণ করেছেন অকৃত্রিম শৈল্পিক কায়দায়। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে আধুনিকতার ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে। এর সুফল ভোগ করে সর্বস্তরের মানুষ। সমাজের সম্প্রীতিও গড়ে ওঠে এই প্রক্রিয়ায়। তবে পৃথিবীর সকল শান্তিহরণ ও বিশৃঙ্খলার নেপথ্যে থাকে ক্ষমতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইন্ধন। এই উপমহাদেশের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি; ক্ষমতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে মানবতা বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে। এখনো নানা মোড়কে তেমন ধারা অব্যাহত রয়েছে। দায়ী না হয়েও এর সবচেয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ,

বিশেষত শ্রমজীবী মানুষ। তাই সর্বজনীন বেদনাবোধ থেকে কবি অত্যন্ত প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন যুগ যুগ ধরে ক্ষতবিক্ষত শ্রমঘনিষ্ঠ মানুষের রক্তচিহ্ন—'লাল' :

প্রভূত খনন শল্যক্রিয়া থেমে গেলে
অফুরন্ত শব্দ আর গর্জনের বায়ব-বুদবুদ
খনিজের রূপ ধরে উঠে আসে।

হরপ্পার কোষে কোষে হাতুড়িগর্জন, হ্রেষা, সিংহের বৃংহণ
শাবল মোহর শিশু সিন্ধু সুরকি পাখি লেদ লায়ারের মিশ্রিত কূজন
আরো বহু শব্দ ছিল
যাবতীয় শব্দ ক্রমে কাষ্ঠীভূত হয়ে
তবে ওই সারি-সারি সাজানো বৃক্ষ।...
জনান্তিকে বলে রাখি—

এইমাত্র দৃশ্যাবলি যথার্থই হল্য, হিন্দু ও বৈড়াল।
হৈমবালা ছোট ভাই-কোলে মির্জাপুর চলে যায়

(মাসুদ; ২০১৮: ৩২)

এরপরের কবিতা "প্রজাপতি"ও হয়ে উঠেছে শ্রমজীবীদের অধিকারহীনতার প্রতীকী চিহ্ন। শ্রমজীবীরা যে দেশের সুবিধাভোগী নাগরিকের মর্যাদা পায় না, তাদের জীবনযাপন অনেকটা প্রজা বা দাসের মতো, কবির ইতিহাস-সঞ্চারী মন সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছে। দৃষ্টান্ত :

প্রজাদের ঋতুরক্ত রেণুকায়
ভূগোল ভিজতে থাকে
সীমানাবিলাস ভণ্ডুল হয়ে যায়।
এমন জননদিনে কোথায় রইলে প্রজাপতি?

(মাসুদ; ২০১৮: ৩২)

আশির দশকে পরপর দুজন স্বৈরশাসককে দেখতে হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে। এই সময় দীর্ঘ আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অর্জিত স্বাধীনতা-বিরোধীদের পুনর্বাসন করা হয়। রাজনীতিকে জায়গা করে দেওয়া হয় স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে। ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়; সংখ্যায় গরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ নির্যাতিত হয় সংখ্যায় লঘিষ্ঠ ধর্মানুসারীরা। অত্যন্ত বেদনাদায়ক এই সব ঘটনায় অনেকে উদ্বাস্তু-জীবন বেছে নেয় এবং অনেকে বংশপরম্পরায় বসবাস করা পিতৃভূমি ত্যাগ করে। তারই বাস্তবতার ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন উপর্যুক্ত কবিতায়।

এই কাব্যগ্রন্থেরই একটি কবিতার নাম "চেরাগজন্ম"। সচরাচর হঠাৎ প্রাপ্ত কোনো সাফল্যকে 'আলাদিনের চেরাগ' হিসেবে গণ্য করা হয়। কল্পিত এই প্রদীপপ্রাপ্তির সমাপ্তিও হয় আকস্মিক। সেই পর্যবেক্ষণ থেকেই কবি রচনা করেন আলোচ্য কবিতাটি। যে-সময়পর্বে কবিতাটি রচিত, সে-সময়টি বাংলাদেশের স্বৈরশাসকের হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্তির। এমনকি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন-আন্দোলন যেভাবে রাজপথকে আলোড়িত করেছিল, সেই বাস্তবতা হয়তো কবিকেও উন্মুখর করে তুলেছিল। ফলে তিনি প্রাপ্যের চেয়ে অধিক ক্ষমতায় আসীন হওয়া ব্যক্তির অত্যাসন্ন পরিণতির কথা বলতে গিয়ে শ্রমজীবীদের কর্মস্থলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'চিমনি চিরে যায় আজ'। কারণ, 'মন্দ গাইছে লোকে দিকে দিকে' বঞ্চনা থেকে মুক্তির পাশাপাশি চেরাগজন্মের সুবিধাভোগীকে ভর্ৎসনা করেছেন কবি—

ও চারণ, তোমার চেরাগজন্ম বৃথা যায় যায়...
মন্দ গাইছে লোকে দিকে দিকে পুনর্বার
চিমনি চিরে যায় আজ এ উন্মার্গ জলের ছিটায়
লোকের সকল মন্দ সুগন্ধ চন্দনচূর্ণ করে বলো—
এ-ই মাখিলাম এই অখণ্ডমণ্ডলে।

রে চারণ, তোমার চেরাগজন্ম বৃথা যায় যায়
চিমনি চির খায় আজ এ উন্মার্গ জলের ছিটায়
চিমনি চিরে যায় আজ দিকচক্রবাল থেকে
তেড়ে আসা অভিশাপে, ভর্ৎসনায়।

(মাসুদ; ২০১৮: ৪৮)

সাধারণ মানুষের জাগরণ ঘটলে 'চিমনি চিরে' ধোঁয়া বের করা মানুষও জাগে। কবির শৈল্পিক দৃষ্টিতে 'বাতাসে ভাসিয়া যায় প্রচুর ব্যঞ্জনধ্বনি' সেই জাগরণের কথাই হয়তো বলছে রূপকের আড়ালে। রাজনীতির প্রতি নিরাসক্ত থাকলেও তার ছিটানো উত্তাপ থেকে কবি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। তাই সমকাল-সমাজ-ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ও মিথের সম্মিলনে তিনি কবিতাকে রূপকাশ্রয়ী করেছেন। বিষয় নির্বাচনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম চেতনার অধিকার এই শিল্পী-কবি খুব নির্বাচিত শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমজীবীকে যেভাবে তুলে এনেছেন, তাতে তাদের প্রতি কিছুটা হার্দিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও তাঁর উদ্দেশ্য শিল্প রচনা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। শ্রমজীবনের করুণ চিত্র তুলে এনে তাদের স্বার্থের পক্ষে দাবি আদায়ও কবির উদ্দেশ্য ছিল না।

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *নদীকূলে করি বাস* (২০০১)। অত্যন্ত পরিমিত শব্দচয়নে দক্ষ কবি মাসুদ খান এখানে যখন "ইতিহাস" লেখেন, তখনো নিজস্ব কৌশলই প্রয়োগ করেন স্বতন্ত্র কায়দায়।

অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক শব্দের শৈল্পিক উচ্চারণে সংজ্ঞায়িত করে ফেলেন পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাস রচনার ধরনকে। তাঁর ভাষায়, 'ভূমণ্ডল হতে এযাবৎ যত আলো বিকীর্ণ হয়ে চলে গেছে সে-সবের মধ্যেই/ মুদ্রিত হয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাস, কালানুক্রমিক।' (মাসুদ; ২০১৮: ৮০) প্রথানুগ ইতিহাস মূলত ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নিয়ে কিংবা রাজা-রাজড়াদের জীবন ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে, তাদের সময় ও শাসনব্যবস্থার ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে। সেই ইতিহাসের আলো থেকে বঞ্চিত থাকে বস্তুপৃথিবীর বঞ্চিত মানুষ বা শ্রমজীবীগণ। সভ্যতার চাকা সচল রাখা আলোহীন মানুষেরা ইতিহাসের আলো থেকেও বঞ্চিত। দুনিয়ার সব দেশের ক্ষেত্রে সর্বজনীন এই প্রশ্ন, 'তবে কি সত্যিই অসম্ভব সঠিক ইতিহাস?' প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করা কবিতার শেষও তিনি করেছেন এক অনিঃশেষ প্রশ্ন দিয়েই, 'তাহলে কি কালো ও তামাটে মানুষদের ইতিহাস নিরন্তর ঝাপসাই থেকে যায়?/ পৃথিবীতে? এবং প্রকৃতিতে? আলো নেই, তাই ইতিহাসও নেই?" (মাসুদ; ২০১৮: ৮১) তাঁর প্রশ্নের মাঝেই লুক্কায়িত আছে উত্তরের অবারিত ব্যাখ্যাও। এ-কাব্যে "কামার প্রসঙ্গে" শিরোনামে একটি কবিতা স্থান পেয়েছে। আদতে কবিতাটির শিরোনামে লোহা-লক্করের হাতিয়ার নির্মাণের মতো কারিগরি পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত পেশাজীবীর নাম সামনে এলেও এটি মূলত একটি প্রতীকী কবিতা। এখানে শ্রমজীবীদের জীবনের প্রসঙ্গ নেই। এর বাইরে এ কাব্যগ্রন্থের আর কোনো কবিতায় কবি শ্রমজীবী কিংবা কৃষক বা কৃষিজীবীদের প্রসঙ্গ ধারণ করেননি।

আশির দশকের অন্যতম কবি কাজল শাহনেওয়াজ (জ. ১৯৬১)। এ-দশকের কবিতা যে কারণে অন্যান্য দশকের তুলনায় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, তাঁর কবিতাও সেসব বৈশিষ্ট্য-খচিত। তবে তিনি কবিতা যাপন করেছেন নিজস্ব পথে। কবিতা গড়ায় তাঁর যুক্তি ও পদ্ধতিই সমকালে আবির্ভূত অন্য কবিদের চেয়ে তাঁকে আলাদা করে চেনার সুযোগ করে দেয়। কারণ, তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে কবিতা মানে হল রহস্য খোলা! প্রতিদিন কাঁটার মধ্যে থাকতে কেমন লাগে তা বলার জন্যই হয়তো আমার মধ্যে কবিতা জন্মেছিল। আমি চেষ্টা করেছি তা থেকে কাব্যরূপ বের করার। বাংলা ভাষা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, বাংলা সাহিত্য আমাকে ভাষা দিয়েছে।' (কাজল; ২০১৮: ৭) তাঁর এই ভাষ্য থেকে একধরনের প্রতিশ্রুতির আভাষ পাওয়া গেলেও তা সমাজ-সংস্কৃতি কিংবা মানুষের প্রতি নয়। বরং তা কেবল শিল্পের প্রতি শতভাগ নিবেদিত থাকার অঙ্গীকার। এই প্রতিজ্ঞা নতুন শব্দযোজনায় নির্মিত নতুন উপস্থাপন কৌশলের। আশির দশকের অন্যান্য কবির মতো তাঁরও লক্ষ্য জীবনের জন্য শিল্প কিংবা সামাজিক দায়বদ্ধতার শিল্প নির্মাণ নয়; বরং সৌন্দর্যের শিল্প নির্মাণই তাঁর আরাধ্য। তাই নাগরিক জীবনের উন্মূলতা শিল্পিত কবিতা নির্মাণে তাঁকে সাফল্য দিলেও তাতে সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া ভার। তাই বিষয় হিসেবে তাঁর কবিতায় যা স্থান

পায়, তাতে জীবনসংগ্রামে মুখর সাধারণ মানুষ তথা শোষিত বঞ্চিত মানুষের ঠাঁই হয় না। তবে শব্দযোজনায় দক্ষ এ-কবি কোনো সময় উপমান-উপমিতকে একাকার করে ফেলেন। হয়তো সে-কারণে কখনো কখনো কোনো চিত্রকল্প সৃজনে ব্যবহার করেন শ্রমজীবনকেন্দ্রিক শব্দাবলি। এমন চিত্রকল্পে সুনির্দিষ্ট কোনো বার্তা না থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতি যে শ্রমিকের হাত ধরে হয়, তাতে তেমন ভাবনার ইঙ্গিত ছড়িয়ে থাকে। যেমন :

নদী ও রেললাইনের মাঝামাঝি মহকুমা জেলায়
একসার ওয়ার্কশপের কাছে
খালি পিপার পাহাড়।...
মালা বদল লেনায় দেনায়
দেশী কারখানায় শুরুর সাথে হাত ধরাধরি
এক পা ছায়ায় ধরে চৌকো বুনো পাতা
এক পা অগ্রগতির রুরাল জনসভায়

(কাজল; ২০১৮: ২৫-২৬)

কবির চোখ সাধারণ দর্শকের চেয়ে আলাদা। সে-কারণেই তাঁদের চিত্রকল্প ও বিষয় ভাবনায় এমন কিছু ধরা পড়ে, যা সাধারণভাবে মনে কোনো আবেদন তৈরি করে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেটের জাফলং। এ-অঞ্চলের অন্যতম 'সৌন্দর্য' জীবিকার তাগিদে কর্মতৎপর থাকা খাসিয়াদের জীবনসংগ্রাম। জাফলংয়ের নৈসর্গিক দৃশ্যকে যদি কবিতার সাথে তুলনা করা হয়, তবে তার ছন্দ অবশ্যই খাসিয়াদের শ্রম-চাঞ্চল্য। কবির ভাষ্য, 'কবিতার ছন্দ হবে খাসিয়া ছন্দ অর্থাৎ যে ছন্দ/ গড়াগড়ি খাওয়া কমলা এবং নদীর বুক ভর্তি/ পাথরের রূপ ভেদ করবে।' (কাজল; ২০১৮: ৬৮)। পরবর্তী সময়ের কাব্যগ্রন্থগুলোতে কাজল শাজনেওয়াজ আরও কিছু নিরীক্ষা করেছেন, সফল হয়েছেন। কিন্তু কৃষক-শ্রমিক কিংবা সমাজ-সংস্কৃতি বা মানুষের সংগ্রামকে তিনি কবিতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেননি।

এ-দশকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (জ. ১৯৬৫)। অনেকের মতে, তিনি আশির দশকের সেরা কবি আর বাংলাদেশের অন্যতম কবি। এ-সময়ে ছোটকাগজকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার যে জোয়ার এসেছিল, তিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম সক্রিয় কর্মী-কবি। নিজস্ব কাব্যভাষা, বিষয় নির্বাচন ও তার উপস্থাপনগুণে তিনি এখনো অনন্য অবস্থানে রয়ে গেছেন। আশির অন্যান্য কবির তুলনায় তাঁর কবিতা সহজবোধ্য ও লক্ষ্যভেদী পাচ্য। তৎসম শব্দ; কখনো সংস্কৃত শ্লোক, আরবি-ফারসি শব্দের পাশাপাশি লোকজ বা কথ্য-ধাঁচের শব্দের সমন্বয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর কবিতাকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। *নাগপঞ্চমী* (২০০৬) তাঁর নির্বাচিত

কবিতার সংকলন। সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি প্রতিশ্রুতি তাঁর কবিতাতেও দেখা যায় না। বিষয় হিসেবে কৃষক-শ্রমিকের ব্যক্তিক বা সামূহিক জীবন কিংবা তাদের সংগ্রামকে কবিতা সৃষ্টিতে বেছে নেননি তিনি। কিন্তু চিত্রকল্প নির্মাণের জন্য কবিতায় কৃষক-শ্রমিককে আশ্রয় করলেও তাতে নিজের শেকড় অনুভূত হয়। আশি দশকের কবিতার ধাঁচ অক্ষুণ্ন রেখেও তিনি যেন জনমানুষের নানা অনুষঙ্গ কবিতায় তুলে আনতে সক্ষম হন অপার দক্ষতায়। কবিতাকে সমৃদ্ধ করার মানসে মাঝেমধ্যে বক্তব্যের তুলনা-সুবিধার্থে তিনি কৃষির অনুষঙ্গ আনেন। "অণিমা" তেমনই একটি কবিতা। আপাতভাবে পাঠকের সংশয় হতে পারে, এ-বুঝি বাস্তব জীবনের কোনো তরুণীর নামের উল্লেখ। কিন্তু একটু গভীর অভিনিবেশ নিয়ে ভাবলে দেখা যায়, নাম এসেছে কবিকল্পনার ইমেজের অংশ হিসেবে। তাতে বিষয়টি স্পষ্ট, শেকড়ের জন্য কবির নস্টালজিয়া আছে, কিন্তু হাহাকার নেই। তাই নস্টালজিয়ায় ভর করে চলে যান কৃষকের আনন্দযাপনের কাছে। যেমন :

নবান্নের ধেনো গন্ধ নস্টালজিয়ার মতো হুহু ক'রে ফেরে,
বোগদাদি চোর এক ঢুকে পড়ে এ-মনের অলিতে-গলিতে—
কী যেন সে দিতে চায়, কী যেন-বা চায় কেড়ে নিতে...

অণিমাকে দেখে দেখে টের পাই প্রাণের আপদ্,
অথচ অণিমা যেন চিরকাল মিলিয়ে এসেছে
জীবনের জাবেদার সকল গলদ—
শুধু তাই ভাবি।

(সুব্রত; ২০০৬: ২৫৬)

শিল্পের চাষ করতে কবির কাঙ্ক্ষিত ও নিশ্চিন্ত অধিবাস চাই। সেই অধিবাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় শ্রমজীবিতার অকৃত্রিম অনুষঙ্গ। চিত্রকল্পের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ এবং এ-অঞ্চলের মানুষের ভিত্তিকে ইঙ্গিত করে তিনি আশির অন্য কবিদের বিপরীতে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান সুসংহত করে ফেলেন। এতে প্রমাণিত হয়, তিনি উন্মূল নন, শেকড় অনুসন্ধানী; শেকড়ের সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্য তাঁকে 'দেশের' কবির জাত চিনিয়ে দেয়। নইলে 'হাইতি দ্বীপে' গিয়ে তিনি তাঁর মাতৃভূমির প্রসঙ্গ উচ্চারণ করতেন না। তবে এতটুকুই। কারণ, তাঁর মুষ্টিমেয় কবিতাতেই কেবল তেমন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন:

হাইতি দ্বীপের ছায়ার শরীর
উদাম শরীর সবুজ নারীর—
বাংলাদেশের গরদ শাড়ির
ঝিলমিল ঢেউ। কে চিলমারির
বন্দরে যায়, কোন্ গাড়িয়াল?

ছায়া-শরীরের নিখাদ ফলদ
জমিন চ'ষছে সুনীল বলদ;
দিনভর সেচ, রাতভর হাল।
আমি সেচ চাই, আমি চাষ চাই,
মৌরুসি নয়, আমি খাস চাই,
নয়ান্‌শ্রী গাঁ'র মেঠো ঘাস চাই,
তোমাতে আমার অধিবাস চাই।

(সুব্রত, ২০০৬: ২২২-২২৩)

শব্দ ও ছন্দের ওপর অগাধ দখল এবং তা প্রয়োগে ঈর্ষণীয় সাফল্য সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের। সৃজন-সাফল্যের কারণেই বাংলা কবিতার জগতে তাঁর আবেদন ও প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। তবে উপর্যুক্ত কবিতার বাইরে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের তেমন কোনো কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের অনুষঙ্গ পাওয়া যায় না। কারণ, সাহিত্য দিয়ে সাহিত্যের বাইরে তেমন কিছু সৃষ্টির প্রবণতা না থাকাতেই তাঁর বিশ্বাস।[৫] কাব্যসৃষ্টির বিষয় হিসেবে শ্রমজীবীদের নির্বাচন করাও তাঁর প্রতিপাদ্য সৃষ্টির বহির্ভূত।

আশির দশকের কবিতা যাদের সক্রিয় সৃষ্টিমুখরতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক 'গভীর নির্জন' নাম কবি শোয়েব শাদাব। বাংলাদেশের ইতিহাসে আশির দশক কবি-চিন্তক-প্রগতিবাদী চেতনার মানুষদের কাছে ছিল অনাহূত অসহনীয় এক কাল। তুমুল সৃষ্টিশীল কবি যখন দেখেন সমাজে-সংস্কৃতিতে-রাজনীতিতে চেপে বসেছে এক জগদ্দল পাথর, যা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, তখন মানুষের জাগরণও হয়ে ওঠে সংশয়াচ্ছন্ন। ফলে একে যেকোনো কবি আখ্যায়িত করতেই পারেন 'পাথর-সময়' বলে। হয়তো সেই কারণেই কবি শোয়েব শাদাবের কাব্যগ্রন্থের নাম হয় *অশেষ প্রস্তর যুগ* । তাঁর সম্পর্কে অনায়াসে বলা হয়েছে :

> বিষয়-আশয়ে শোয়েব শাদাব তাঁর কবিতায় বেছে নিয়েছেন আদিম মানব সমাজ, প্রকৃতি, আদিম চিত্রকলা, টোটেম-ট্যাবু, গুহাচিত্র, লোকসংস্কৃতি, নারী এবং এস্কিমোদের অনুষঙ্গ। তাঁর কবিতা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ অথচ বক্তব্যে সরল, স্পষ্ট। প্রাজ্ঞ-পাঠক মাত্রই জানেন শাদাবের কবি-মনে রয়েছে উড়াল দেবার কী প্রচণ্ড শক্তি। কবি ও তাঁর কবি-মন অতীতকে বর্তমানের চোখে দেখে নতুন করে তার নির্মাণ করেন, আর এভাবেই মানব ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় সত্যের আবিষ্কারে তাঁর কবিতায় অবিনাশী সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মোচন পরিলক্ষিত হয়। বলাই বাহুল্য, এ প্রচেষ্টাই মূলত আশির দশকের কবিতায় শোয়েব শাদাবকে স্বতন্ত্র এবং মৌলিক অবস্থানে নিয়ে আসে। মানব ইতিহাস ও প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কাছে অবনত ইতিহাস সচেতন এই কবি ইতিহাসের ঐতিহ্যিক-জেনেটিক প্রত্যয়কে পাথেয় করে আদিম এষণে; ক্রমাগত খুঁজে বেড়াচ্ছেন আদিম মানুষ, তাদের যূথবদ্ধতা, প্রিমিটিভ জীবন-জীবিকা, অন্তর্গত অসহায়তা এবং সংগ্রামের জীবন চিত্র কখনো শিকারের মধ্য দিয়ে,

> কখনো সিংহের থাবা ও কেশরের উদ্দামতায়, কখনো হাঁড়ের হার্পনে তিনি পথ হাঁটেন আর শিং-এর গাইতি ও হাতির দাঁতের সুপ্রাচীন হাতিয়ারে চূর্ণিত করেন নক্ষত্র। লোকজ যাত্রায় শোয়েব শাদাবের পথ হাঁটা—কবি এভাবেই বর্তমান সময়ের উৎপত্তি থেকে হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছে যাচ্ছেন সভ্যতার আদিউৎসমূলে। (সূত্র: সাগর নীল খান; *শোয়েব শাদাবের কবিতাসংগ্রহ*; ২০০৯: ৬)

গণমাধ্যম তথা প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার যে যাত্রাদর্শ শুরু করেছিলেন আশির দশকের কবিগণ, সে-পথে বেশির ভাগ লেখকই আর থাকতে পারেননি বা থাকেননি। যাঁরা দু-একজন ছিলেন কিংবা না থাকতে পেরে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন কায়মনোবাক্যে, তাঁদের একজন শেয়োব শাদাব। আশির দশকের কাব্যপ্রবণতা এবং শোয়েব শাদাব সম্পর্কে এভাবে বলাও প্রাসঙ্গিক :

> আশির দশকে এক দল সাহিত্যকর্মীর পদচারণা ঘটেছিল এই বঙ্গে যাঁরা সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকে আপাদমস্তক ধারণ করে নিরন্তর কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। যুগের অসুখকে তাঁরা টের পেয়েছিলেন, এবং তথাপি, যুগ-সমাজের ভয়ংকর চাপের মুখে মুষড়ে পড়েছিলেন। তাই, আশির দশকের কবিদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায়, সমাজ-সংসার-মানুষ থেকে পলায়নরত; অনেকে যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায় আতিবাহিত করছেন গভীর নির্জন দ্বীপে বন্দী জীবন। কবি শোয়েব শাদাব এদেরই একজন। (সুস্মিতা; রাশপ্রিন্ট: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৩)

কিন্তু শোয়েব শাদাব তাঁর কবিতায় প্রস্তর যুগ বা প্রাচীন যুগকে কবিতায় অন্তঃশীলা প্রবাহে স্থাপন করে মূলত আধুনিক জীবন ও সভ্যতার নানা অনুষঙ্গ ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে নান্দনিক উপায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন। তাতে সেই সময় কিংবা তাঁর সময়ের তেমন কোনো পেশাজীবীর প্রসঙ্গ কবিতায় পাওয়া যায় না। সুবিন্যস্ত ভাষায় পাওয়া যায় তাঁর যুগ ও নিসর্গের অম্লান চিত্র। তাই শব্দ ও ভাবনার দখলে শিল্পিত কবিতায় তিনি বলতে পারেন, 'অন্তশীল ঘুণপোকা কুচি কুচি জলছবি/ বীভৎস আদিম রাত দীপহীন জংলি।' (শোয়েব; ২০০৯: ২০) সেই 'জংলি' স্বভাব নিয়ে সভ্যতার সশস্ত্র বিদ্রোহ থামানো গেলেও আগ্নেয়গিরির আগুন-ত্রাসকে কোনো হাতিয়ার দিয়েই থামানো যায় না। যে আগুন আবিষ্কার না হলে সভ্যতা বিনির্মাণের পথে ন্যূনতম অগ্রগতিও হতো না, সেই আগুন সম্পর্কে কবির উপলব্ধি, যদি 'হঠাৎ গর্জন/ কোথাও আগ্নেয়গিরি ফাটে/ ধেয়ে আসে আগুন লক্ষচ্যুত/ সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়/ বল্লমে রোখা যায় বাঘ বা বিদ্রোহ;/ আগুন হারে না।' (শোয়েব; ২০০৯: ২৪) আশির দশকের বেশির ভাগ কবির মতো শ্রমজীবীদের নিয়ে আলাদা কোনো চিন্তা শোয়েব শাদাবের কবিতা পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় না। তবে নিজেকে তিনি আদিম যুগের ক্রীতদাসদের উত্তরসূরি হিসেবে গণ্য করেন :

> দেয়ালে ঝুলছে ছবি
> অথচ ছিলাম সমুদ্রের নীল শৈবালে

অস্ফুট অমাময়ী পপির স্বপ্নে।...
আমি তার বনস্পতি চন্দ্রিমা পাবো না।
মরুভূমি মরূদ্যান কিছুই পাবো না।
কারণ, যে বন্যতা আমাদের বিচলিত রক্তে
কুকুরের—আত্মার গন্ধ—
আমি সেই সাম্রাজ্যের প্রাচীন ক্রীতদাস।
আমি সেই রথাশ্বের নিষ্পেষিত ইতিহাস।
আমাদের মৃত্যু হবে নাস্তিকের মতো।

(শোয়েব; ২০০৯: ২৫)

ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসের অংশ যারা, তারাই তো সুনাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যারা সভ্যতার আলোক রাশির বিপরীতে অবস্থান করতে বাধ্য হন সমাজেরই প্রভাবে, স্রষ্টা ও ধর্মের সংস্কার তাদের কাছে তুচ্ছ। আশির দশকের সমাজ-সময়-রাজনীতি তাঁর কবিতায় সরাসরি না এলেও সময়ের একধরনের অস্থিরতা উপর্যুক্ত কবিতা-পঙ্ক্তিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে সংশয় নেই। আর শ্রমজীবীর চেয়ে সভ্যতার ক্রীতদাস বলে নিজেকে আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন কবি শোয়েব শাদাব। এভাবেই যেন তিনি নিজেকে বেশি করে আবিষ্কার করতে চান—সেই প্রস্তরযুগ থেকে; যখন শিকারীদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। সেই ইতিহাস-স্মৃতিকে সামনে এনে এই গ্রহে তিনিও টিকে থাকতে চান শিকারীর একান্ত অনুভবে। হয়তো সে-কারণে তাঁর কবিভাষাকে কালোত্তীর্ণ মনে হয়। কেননা, সমকালকে তিনি সভ্যতার অতীতে স্থাপন করে কাব্যপথ নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন।

শোয়েব শাদাবের কাব্য নিবিড়ভাবে পাঠ করলে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয় যে, কৃষক-শ্রমিক কিংবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিষয়কে অবজ্ঞা করার প্রবণতা আশির দশকের কিছু কবির মতো তাঁর কবিতাতেও পরিলক্ষিত। কারণ, তাঁদের কবিতাতেও নেই শ্রমজীবীদের নিয়ে উপলব্ধির ন্যূনতম প্রয়াস। সেই সময় *গাণ্ডীব*, *পেঁচা*, *সংস্কৃতি*, *নিসর্গ* প্রভৃতি ছোটকাগজের প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা যে আলোড়ন তুলেছিল বাংলাদেশের সাহিত্যে, তার উত্তাপ এখন আর অনুকৃত হয় না। এখন ছোটকাগজের মাঝে প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা নয়, বরং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে টিকে থাকার বিসদৃশ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। গুরুত্বের দিক থেকে সেই সময়ের স্বকীয় কবি হিসেবে সাজ্জাদ শরিফ, ফরিদ কবির, শান্তনু চৌধুরীর মতো আরও বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। কালেভদ্রে তাঁদের কাব্যস্ফুলিঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে যথারীতি তাঁদের কবিতায় সময় ও সমাজ উপেক্ষিত। তাই আশির দশকের কবিদের কাব্যপ্রবণতা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, দেশহীন, সংস্কৃতির সৌগন্ধবিহীন, মানুষের প্রতি দায়বোধহীন কাব্যপ্রবণতা এক অস্থির সময়ের এবং বিচলিত কবিগণের উদ্দেশহীন কাব্যযাত্রার স্মারক হয়ে রইল।

টীকা

---

১ অর্থের ধারণাগত ঘাটতির কারণে অনেকেই মাঝি ও জেলেকে অভিন্ন পেশাজীবী হিসেবে গণ্য করে থাকেন। অথচ মাঝি হলো নৌকার চালক। তিনি জেলে হতেও পারেন, নাও পারেন। জেলে হচ্ছেন পেশাদার মৎস্য-শিকারী বা মৎস্যজীবী, যাঁরা জাল বা আনুষঙ্গিক দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে মাছ ধরে বা আহরণ করেন এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তাই নামকরণের ক্ষেত্রে যথার্থতার প্রশ্নটি থেকেই যায়।

২ কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন রেজা সেলিম রুদ্র সম্পর্কে বলেছেন, 'দিনের প্রকাশ্য আলোয় আমার দেশকে ভালোবাসার মাধ্যম, সে অনুপ্রেরণা আমাদের দিয়েছে রাখাল আর রুদ্র।' 'রাখাল' নামক ক্ষণস্থায়ী সংগঠনটির যতটুকু সাফল্য, তার বেশিরভাগ কৃতিত্বই রুদ্রের। দ্র. তপনবাগচী, *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯-৩০

৩ কবিতাটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত আবিদ আজাদের *বনতরুদের মর্ম* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। তাই ধরে নেওয়া যায়, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় স্বৈরশাসকের শাসনকালে দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে যে মনোবেদনা তাঁর মধ্যে প্রবহমান ছিল, সেটিই উপর্যুক্ত কবিতায় স্থান পেয়েছে।

৪ প্রাচীন ভারতে রাজারা বিভিন্ন ধরনের মনস্কামনা পূরণের জন্য দেবতাকে তুষ্ট করতে নানা রকম যজ্ঞের আয়োজন করতেন। তার একটি ছিল অশ্বমেধ। সবচেয়ে সুন্দর একটি ঘোড়াকে এক বছরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। একে কেউ বাধা দিলে তার সঙ্গে রাজসৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। আর যেসব রাজ্যে ঘোড়াটি প্রবেশ করত, সেই রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে হয় বশ্যতা মানতে হতো অথবা যুদ্ধ করতে হতো। এভাবে ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে বছরকালের চক্র সম্পন্ন হতো নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় শত অশ্বমেধ সম্পন্ন হলে রাজাগণ ইন্দ্রত্ব লাভ করতেন। (সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, সুধাময় দাস সম্পাদিত *পৌরাণিক অভিধান*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯)

৫ সাহিত্য-বিষয়ক ওয়েবজিন 'বিন্দু'তে ১৪ মার্চ ২০২১-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে সুব্রত অগস্টিন গোমেজ তাঁর লেখালোখি ও সাহিত্য বিষয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর প্রতি প্রশ্ন ছিল, 'সাহিত্য দিয়ে কেউ দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে চায়, কেউ স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে চায়, কেউ সন্ত্রাস-মৌলবাদ ঠেকাতে চায়, আরো নানাকিছু করতে চায়। আপনি কী করতে চান?' উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি চাই... সাহিত্য দিয়ে যারা এইসব করতে চায়, তাদের বধ করতে... কিলবধ। ভেবেই পাই না, সাহিত্য দিয়ে সাহিত্য-ছাড়া কিছু করতে পারার প্রবণতার উৎস কোথায়। সাহিত্য করা কি যথেষ্ট "করা" নয়? যদি কেউ প্রশ্ন করত, ডাক্তারি দিয়ে ডাক্তার কী করতে চায়, কী বলতেন

ডাক্তারকুল?' সূত্র: https://www.bindumag.com/2021/03/Subrata-Augustine-Gomes-interview.html

সহায়কপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

আবিদ আজাদ (২০০৮)। *কবিতাসমগ্র*। শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা

আবিদ আনোয়ার (২০১৫)। *কাব্যসংসার*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (২০১৬)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। ভাষাচিত্র, ঢাকা

আল মাহমুদ (১৯৭১)। *আল মাহমুদের কবিতা*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

(২০১৩)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৪)। *কবিতাসমগ্র ১*। গতিধারা, ঢাকা

আশরাফ্ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান [সম্পা.] (১৯৫০)। *নতুন কবিতা*। ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা

কাজল শাহনেওয়াজ (২০১৮)। *কবিতাসমগ্র*। আগামী প্রকাশন, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৯৬)। *নজরুল রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১১)। *কবিতা সংগ্রহ*। শিখা প্রকাশনী, ঢাকা

ত্রিদিব দস্তিদার (২০০৫)। *কবিতাসমগ্র*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

দিলওয়ার (২০১১)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা

নির্মলেন্দু গুণ (২০২০)। *নির্বাচিতা*। কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা

মহাদেব সাহা (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মাসুদ খান (২০১৮)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৯৮)। *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যসংগ্রহ*। প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা

মোহাম্মদ রফিক (২০১১)। *কবিতাসমগ্র*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

রফিক আজাদ (২০০৭)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (২০১৪)। *কবিতাসমগ্র*। অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

শহীদ কাদরী (২০১০)। *শহীদ কাদরীর কবিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৬)। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শোয়েব শাদাব (২০০৮)। *শোয়েব শাদাবের কবিতা সংগ্রহ*। উলুখড়, ঢাকা

সমুদ্র গুপ্ত (২০০৯)। *কবিতাসমগ্র*। মুক্তচিন্তা, ঢাকা

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (২০০৬)। *নাগপঞ্চমী*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৯৯)। *কবিতা সংগ্রহ ১*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০১)। *কাব্যসমগ্র*। সময় প্রকাশন, ঢাকা

সহায়ক গ্রন্থ

অনু হোসেন (২০০৫)। *শিল্পের চতুষ্কোণ*। ঐতিহ্য, ঢাকা

আহমদ রফিক (২০০১)। *কবিতা : আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*। অনন্যা, ঢাকা

—(২০২১)। *রুশ বিপ্লব স্তালিন বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জুলফিকার মতিন (২০০১)। *বিনাশী সময় অবিনাশী কাল*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

জুলফিকার হায়দার (২০০৪)। *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

তপন বাগচী (১৯৯৮)। *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বায়তুল্লাহ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০১০)। *নিয়তির পক্ষ-বিপক্ষ ও বিবিধ প্রবন্ধ*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

মালেকা বেগম (২০১১)। *ইলা মিত্র : নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুব হাসান (২০০৫)। *কবিতায় পরম্পরায়*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

মিনার মনসুর (১৯৯৯)। *হাসান হাফিজুর রহমান : বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুনীর সিরাজ (২০১৩)। *সমুদ্র গুপ্ত'র কবিতা : তুলনামূলক বিচার*। মুক্তচিন্তা, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৩)। *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

—(২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*। একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

—(২০০৭)। *কবিতা ও সমাজ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৩)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সিকদার আবুল বাশার (২০০৩)। *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন সাহিত্য*। বাতায়ন, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯৩)। *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*। শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা

সৌমিত্র শেখর (২০১১)। *ষাটের কবিতা: ভালোবাসার শরবিদ্ধ কবিকুল*। বিভাস, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০০)। *আধুনিক কবি ও কবিতা*। সময় প্রকাশন, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *নিঃসঙ্গ শেরপা/ শামসুর রাহমান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

সংকলন ও সম্পাদিত গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.] (২০০১)। *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম [সম্পা.] (১৯৭১)। *আধুনিক কবিতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুধীরচন্দ্র সরকার (২০১৯)। *পৌরাণিক অভিধান*। সুধাময় দাস (সম্পা.), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান [সম্পা.] (১৯৫৩)। *একুশে ফেব্রুয়ারী*। সময় প্রকাশন (পুনর্মুদ্রণ ২০১৬), ঢাকা

সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

বেগম আকতার কামাল (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা'। *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* [সাঈদ-উর রহমান সম্পা.]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মতিউর রহমান (২০১৬)। 'পিয়ারু সরদার : ইতিহাসের সাহসী এক চরিত্র'। *প্রথম শহিদ মিনার ও পিয়ারু সরদার* [সম্পা. আনিসুজ্জামান], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Syed Manzoorul Islam (1996). *Contemporary Bengali Writing: Bangladesh Period*. The Achievement of Shamsur Rahman [etd. Khan Sarwar Murshid]. University Press Limited, Dhaka.

সাহিত্য-সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি

আলী রিয়াজ (২০১৩)। রচিত 'ভূমিকা : সত্তর দশকের কবিতা'। *নান্দীপাঠ* ৫ [সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.], ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৩)। 'আশির দশকের কবিতা : ঐতিহ্যসূত্র ও নবনির্মিতি'। *নান্দীপাঠ* [সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.], ঢাকা

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০০৫)। 'মহাদেব সাহার কবিতা'। এবং মুশায়েরা [সুবল সামন্ত সম্পা. 'কবি ও কবিতা সংখ্যা'], কলকাতা

পিয়াস মজিদ (২০১৫)। 'গুণের সঙ্গে যেভাবে বেড়ে উঠি'। *কাশবন* (নির্মলেন্দু গুণ সংখ্যা) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৮৯)। 'বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবিতা : চার দশকের ধারা সূত্র'। *ঐকতান* [নীতীশ বিশ্বাস সম্পা.], ঐকতান গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

—(২০১৭)। 'রফিক আজাদের কবিতার সাতকাহন'। *কাশবন* (অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৮৬)। 'গাওদিয়া : মোহাম্মদ রফিক'। *দীপঙ্কর* [জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পা.], ঢাকা

—(২০১০)। 'ভীষ্মদেব চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার'। *উলুখাগড়া* [সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা.], সংখ্যা ১৩, ঢাকা

মফিদুল হক (২০১৩)। 'কবি দিলওয়ার ও তাঁর মাটির ঘর'। ২৯ অক্টোবর, *প্রথম আলো*, ঢাকা

মিনার মনসুর (২০১৭)। 'কে বলে রফিক আজাদ নেই'। *কাশবন* (অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা

মুনীর সিরাজ (২০১৩)। 'সত্তর দশকের কবিতা'। *নান্দীপাঠ* ৫ [সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.], ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১৩)। 'আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা : ব্যাপ্তি ও দীপ্তি'। ১৯ ফেব্রুয়ারি বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম, ঢাকা

রবিন পাল (২০০৫)। 'নির্মলেন্দু গুণের কবিতা'। এবং মুশায়েরা [সুবল সামন্ত সম্পা. 'কবি ও কবিতা সংখ্যা'], কলকাতা

রফিকউল্লাহ খান (২০১৭)। 'রফিক আজাদ'। *কাশবন* (অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা

শাহীন ইবনে দিলওয়ার (২০১৭)। 'কবি দিলওয়ার : কালজয়ী কবিকণ্ঠ'। ৩০ ডিসেম্বর, *প্রথম আলো*, ঢাকা

সুস্মিতা চক্রবর্তী (২০১৩)। 'শোয়েব শাদাবের কবিতা : রক্তের গভীরে ঘাইমারা বিষধর শিঙের বিবৃতি'। রাশপ্রিন্ট [আহমেদ সায়েম সম্পা], ২৫ ডিসেম্বর (https://raashprint.com/2013/12/692/)]

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০১৩)। 'গণমানুষের কবি'। *অন্য আলো*, *প্রথম আলো*। ২৫ অক্টোবর, ঢাকা

হেলাল আহমেদ (১৯৯১)। 'শোষিত মানুষের ভাষাচিত্র : মানুষের মানচিত্র'। *একবিংশ* [খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পা.], ঢাকা

https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8,_%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন : নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষা

এক. তাত্ত্বিক পটভূমি

মহৎ শিল্প-সাহিত্য নিগূঢ় জীবনসত্যের সৃষ্টিগুণে কালোত্তীর্ণ হয়, আবার সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে কালের গর্ভে হারিয়েও যায়। কবিতায় সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীল কবির সময়জ্ঞান, সংস্কৃতিচেতনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির পিপাসা। বিশেষত, ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সম-সময়কে ধারণ করেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে সৃষ্টি-কাঠামোতে প্রাতিস্বিক প্রকরণের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নিরাসক্ত হয়ে সব প্রভাবকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মোকাবিলা করলেও শিল্পীমন তার চলমান কালের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। তবে তিনি অতীতের দর্পণে বর্তমানের প্রতিচ্ছবি আঁকতে পারেন, কখনো বর্তমানের ক্যানভাসে দাঁড়িয়ে চিরন্তন সৌন্দর্য নির্মাণে প্রয়াসী হন। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হলে লক্ষ করা যায়, ব্যক্তিগত দর্শন যেমনই হোক, সৃজনশীল কোনো ব্যক্তিই সময়কে অবজ্ঞা করতে পারেন না। তাই প্রকরণের স্বার্থে বিচিত্র করণকৌশল-প্রকল্পে অবতীর্ণ হয়েও তাঁকে হতে হয় সময়-সচেতন। আর সময়ের প্রতি সচেতনতা নিজস্ব সমাজ, নিকটবর্তী মানুষ, অবিচ্ছেদ্য পরিমণ্ডলের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ককে নিবিড় করে তোলে। কারণ, 'কবিতার ভেতর যে কালগত সত্য থাকে, তার মূল্যই অধিক এবং সেই সত্যের কালগত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কবিতা কালোত্তীর্ণ হয় তখনি, যখন পরবর্তীকালসমূহের মধ্যে তার ভেতরকার ঐতিহাসিক সত্যের ব্যঞ্জনাময় সম্প্রসারণ ঘটে, যুগের উদ্‌ঘাটিত জীবনসত্য যখন পরবর্তীকাল-সমূহেরও জীবনসত্য বলে পাঠকসমাজে অনুমোদন লাভ করে।' (আজীজুল; ১৯৮৫: ৭৭)

একইভাবে, শিল্পস্রষ্টার বিষয় নির্বাচনেও সময়ের শাসন অনিবার্য। বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রতীকের মাহাত্ম্যে প্রবলভাবে বিরাজমান থাকে সময়ের সংকেত। সময়ের সুচিহ্নিত স্বর ও কালচিহ্নিত শিল্পভাষা ছাড়া শিল্পসচেতন স্রষ্টাগণ তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে কালের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন না। কারণ, 'যে-মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে একটি কবিতা, সেই মুহূর্তের নির্যাস তার ভাষা-অন্তর্বস্তু-প্রাকরণিক কৃৎকৌশলে নিশ্চয় প্রতিফলিত হবে। এই আবশ্যিক দায়বদ্ধতা কবিতা কখনও অস্বীকার করতে পারে না। তবু, এও ঠিক, ওই মুহূর্তে রুদ্ধ হয় না বর্ণ-সঞ্চার। কালে-কালান্তরে সম্ভাব্য গ্রহিষ্ণু পাঠকের উদ্দেশ্যে অব্যাহত থাকে তার চলাচল। কবিতার নন্দন তাই যুগপৎ সময় ও পরিসরের কাছে ঋণী এবং সময় ও পরিসরও ঋণী কবিতার কাছে।' (তপোধীর; ২০০৯: ১২) শব্দের ব্যবহার, চিত্রকল্প নির্মাণ, ভাষার নতুনতর বিন্যাস, রস সৃষ্টির অকৃত্রিম প্রয়াস ইত্যাদির পাশাপাশি প্রকাশভঙ্গিতে যে স্বকীয়তার পরিস্ফুটন ঘটান কবিগণ, তাতে শিল্পসৃষ্টির সক্ষমতা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি নান্দনিক চিন্তার ভিত্তিও রচিত হয়। সাধারণত নান্দনিকতা সময়ের বিচিত্র যাত্রার মধ্য দিয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও কালগত রুচিবোধের

তারতম্যের কারণে নান্দনিক অভিযাত্রা বৈচিত্র্যপূর্ণও হয়ে থাকে। নান্দনিকতার মান নির্ধারণে বিজ্ঞানের মতো স্বতঃসিদ্ধ বা ধ্রুব কোনো মানদণ্ড নেই। সেই হিসেবে শিল্পের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে নিচের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক মনে হয় :

> শিল্পের প্রধান পরিচয় শিল্প একটি সৃষ্টি এবং শিল্পমাত্রই এক অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত।...জীবনবাদী ও সমাজাশ্রয়ী শিল্প সমালোচনা অনুযায়ী শ্রমিকের রক্তে ঘামে তৈরি একটি রাস্তাও শিল্প, গুণটানা মাঝিরাও শিল্পী। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে এসব শিল্প হলে এখানে আনন্দের স্থান কোথায়? উত্তর: শিল্পে আনন্দ প্রয়োজনসিদ্ধ নয়, এবং এর কোনো রূপ নেই। গুণটানা মাঝির বিষণ্ন শরীরে বা ক্লান্ত শ্রমিকের পরিশ্রমী অবয়বে বাহ্যিক সৌন্দর্য নেই; চোখকে বা মনকে তা তৃপ্ত করে না। কিন্তু এদের উপস্থিতি একধরনের মহত্ত্বের দাবিদার, পরিপার্শ্বকে তারা সহজেই ক্ষুদ্র করে ফেলে, শ্রমের সমুন্নতিতে নিজেদের অস্তিত্বকে করে বিশাল। এই মহত্ত্বের অনুভবই সৌন্দর্য। শিল্পের অন্বিষ্ট হলো জীবন। তাই এ মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, জীবনধারণের গূঢ় তাগিদই শিল্প। যে তাগিদই জীবনকে পরিচালিত করে তাই সৃষ্টি করে শিল্প। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত না হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিল্প মানবিক সৃষ্টি বলে কোনো না কোনোভাবে এতে জীবনের প্রসঙ্গ থাকবেই। (মনজুরুল; ২০০৬: ৭-৮)

তবু কবিতাকে 'কবিতা' হয়ে উঠতে কিছু মানদণ্ড অতিক্রম করতে হয়। এই মানদণ্ড পাঠক ও জনসমাজের রুচিজ্ঞানসাপেক্ষ নান্দনিক সৌন্দর্যের অভিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে পারে। এতে ব্যক্তি-কবির ছন্দ-অলংকার-প্রতীকের ব্যবহার কবিতার শরীরকে করে তোলে সামষ্টিক বৈচিত্র্যের ঐক্যে আবদ্ধ। এমন ভাবনা থেকেই 'জীবনবাদী ও সমাজাশ্রয়ী' বাস্তবতা ও কল্পনার নিরিখে সৃষ্ট শিল্পিত কবিতা পরিপুষ্টি লাভ করে। আর তাতে সময়ের চিহ্ন ও নন্দনচিন্তার রূপান্তরও লক্ষ করা যায়। কারণ:

> কবিতা লেখার মূল উপাদান শব্দ বা ভাষা।...শব্দ বা ভাষাকে মান্য করতে হবেই। শব্দ দিয়ে কবিতা লেখা হয়, ভাব দিয়ে হয় না।...শব্দ প্রয়োগ কবির হাতেই থাকে এবং তা সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়। একথা ঠিক, কবিরা প্রত্যেকেই শব্দলোভী। তাঁদের অনেক কথা আছে। তাঁরা সেগুলো নিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছোতে চান। নিজেদের কথা শোনাতে চান। তাই দরকারে নিজেদের ভেঙে নেন। পাঠকের কাছে কবির কথা পৌঁছোতে গিয়ে শব্দের ব্যবহার আভিধানিকতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বর্তমানে। গ্রহণযোগ্য শব্দ এনে আলাদা আবেদন তৈরি করাই কবিদের প্রয়োজন। তাঁরা সেই পথেই এগোচ্ছেন। (তরুণ; ২০১২: ১০-১১)

শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে যে স্বকীয়তা প্রদর্শন করেন কবিগণ, তাতেও থাকে সময়ের প্রভাব। সময় ও সমাজের চিহ্ন, সংস্কৃতি ও পেশাজীবীর চিত্র, দায় ও দায়বোধের আভাস কবিতার শরীরে খচিত

থাকে বলেই অতিবাহিত যুগের সাংকেতিক ভাষাও শিল্পস্মারক হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। এভাবেই নানা যুগের গহীনে আবির্ভূত চিন্তা ও চেতনাকে আশ্রয় করে নন্দনবীক্ষা বা নন্দনদর্শন বিকশিত হয়। এই নন্দনদর্শনের গহীনে প্রবাহিত থাকে কবির স্বকীয় সত্তার পরিচয়। তাই পাঠকগণ যেমন বিচিত্র স্বাদের অধিকারী, তেমনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মতো সাহিত্যস্রষ্টা-ভেদে দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৃষ্টিস্বাদ হয় বিভিন্ন রকম। কারণ, 'aesthetics, also spelled esthetics, the philosophical study of beauty and taste. It is closely related to the philosophy of art, which is concerned with the nature of art and the concepts in terms of which individual works of art are interpreted and evaluated.' (সূত্র: Encyclopedia Britannica : 06 November 2020) নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বকীয় দর্শনের কারণেই অভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েও কবি থেকে কবি, শিল্পী থেকে শিল্পীর চেতনা ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য, শিল্পসাফল্যের স্বকীয়তা-মৌলিকতার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এবং তা নিজস্ব নান্দনিকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল দুজনের মত দুইদিকে। প্লেটো ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বস্তুর কোনো সৌন্দর্য নেই। তাঁর কাছে সৌন্দর্য একটি ধারণামাত্র। আর অ্যারিস্টটল বলেছেন, সৌন্দর্য কেবল একটি ধারণামাত্র হতে পারে না। সৌন্দর্যের কারণ বস্তুর মধ্যেই থাকে। যে-কোনো বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে সুন্দর হিসেবে গণ্য হতে পারে। প্রয়োজন সঠিক পারম্পর্য, সামঞ্জস্য ও স্পষ্টতা। সৌন্দর্য সম্পর্কে প্লেটোর 'বায়বীয় ও অস্পষ্ট' ধারণা থেকে অ্যারিস্টটল তাকে জ্ঞানের সীমার মধ্যে এনেছেন। শুধু তা-ই নয়, নান্দনিক সৌন্দর্যের অনুভূতিকে তিনি মতবাদ ও যুক্তিবাদী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে গেছেন। (সূত্র: তরুণ; ২০০২ : ৫৭-৫৮) সেই সুবাদে আমরা বলতে পারি, অনিন্দ্য সৌন্দর্য-চর্চার অব্যাহত তাগিদে নান্দনিক উপায়ে নিরন্তর প্রকাশের প্রয়াসের যুগকে উপজীব্য করে কবি যে সাধনা-সাফল্য লাভ করেন, তা-ই মানুষের মনের গভীরে অম্লান থেকে যায়। কারণ, আমরা 'কবির অনুভূতি-নিবিড় ভাষাকে বুঝে নিই বিকল্প বিশ্বের তোরণ বলে। প্রতিমুহূর্তের সসীম বাস্তবকে পেরিয়ে যেতে কবিতা নন্দনের অসীম সম্ভাবনাকে ক্রিয়াত্মক করে তোলে। তখন যে-কোনো শব্দ হয়ে উঠতে পারে সংকেতগর্ভ চিহ্ন, প্রচলিত বস্তুসম্বন্ধ হয়ে অচেনা অজানা জগতের আদল ফুটে ওঠে।' (তপোধীর; ২০০৯: ১৩) শিল্পিত কবিতাবয়বের সেই 'আদল' থেকে কাঙ্ক্ষিত সঞ্জীবনী সুধা গ্রহণ করতে মানুষ বারবার ফিরে আসে তেমন সৃষ্টিরই কাছে, ব্যক্তির সৃষ্টিই যেখানে সামষ্টিক নন্দন-সৌন্দর্যের অভিধায় সিক্ত হতে থাকে।

> ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যুগের বৈশিষ্ট্য, অসংখ্য বিচিত্র মতামতের সংঘর্ষ, রুচির অশ্রান্ত জঙ্গমতা—এই সমস্ত অতিক্রম ক'রে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, মানুষের আনন্দ-চেতনায় কিছু-একটা চিরন্তন নিশ্চয়ই আছে, নয়তো সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা কিছুই সম্ভব হতো না থাকতো না, থাকতো শুধু খবর, থাকতো শুধু তত্ত্ব। যে-খবর একবার শুনলে আমরা ভুলতে পারি না, বার-বার শুনতে চাই, এবং বার-বার শুনেও যা পুরোনো হয় না, তাকেই বলি সাহিত্য বা আর্ট। (বুদ্ধদেব; ১৯৪৬: ১৩৯)

দেশ-কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে সাহিত্য-শিল্পের রুচি ও চাহিদা যেমন পৃথক হয়, তেমনি এর স্রষ্টাগণ সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন নান্দনিক শিল্পসৌকর্য নির্মাণে প্রয়াসী হন। যুগের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সময়কে চিরন্তন বা কালোত্তীর্ণ করতে সৃষ্টিপ্রয়াসীদের আত্মনিবেদনের সাধনা করে যেতে হয়। এই সাধনা উপলব্ধি করেন নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষকগণ। কারণ, 'নব্যভাবুকদের মতে, ভাষা বাস্তবের প্রতিফলন নয়, ভাষাই বাস্তবতা তৈরি করে—ভেতরে-বাইরে সর্বত্র। এটাই পোস্টমর্ডানিস্টদের জ্ঞানতত্ত্ব। মনন ও শ্রম অবিরাম বস্তু সৃষ্টি করে চলছে, সেসবের নামকরণ করছে, সেই নামই লেখ বা কথাচিত্র হয়ে ভাষার স্পেস বাড়িয়ে তুলছে, নতুন নতুন বাস্তবতার জন্ম দিচ্ছে। তাই সবকিছুই ভাষার তত্ত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।' (আকতার কামাল; ১৪: ২০১৪) 'ভাষার তত্ত্বের' মধ্যে লালিত-পালিত হয় কাব্যতত্ত্ব কিংবা কাব্যদর্শনের মতো বিষয়-আশয়। কাব্যস্রষ্টাদের কাছে আলংকারিক জ্ঞানকাণ্ডের সবকিছুই সম্ভাবিত হয় ভাষা দ্বারা সংগঠিত নানামাত্রিক অবকাঠামোর মাধ্যমে। তাই একজন 'নন্দনতাত্ত্বিক যখন প্রশ্ন করেন, একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য সত্ত্বেও শিল্পে এত ভিন্নতা কেন, প্রকাশের এত বৈচিত্র্য কেন, তখন নানা মত হাজির করা হয়। টলস্টয় বলেন, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, বোধ, অনুভূতির তারতম্যের জন্য এমনটি ঘটে; আবার ই. এইচ. গোম্ব্রিচ-এর মতো নন্দনতাত্ত্বিক মত পোষণ করেন যে টলস্টয়ের ধারণাটি সত্য বটে, তবে তাতে শিল্পীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানকে অবহেলা করা হয়েছে।' (মনজুরুল; ২০০৬: ৯) সময়-সমাজ-মানুষ শিল্পীদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অবিকল্প আশ্রয়। কলাকৈবল্যবাদীদের কেবল সৌন্দর্যচর্চার লক্ষ্যে শিল্পচর্চার দর্শনেও যে সময়ের প্রভাব বিরাজ করে প্রবলভাবে, তা সমাজের গভীর সত্যকে উন্মোচিত করে বলেই। সত্যই শিল্প, সত্যই সুন্দর—এই প্রতীতিও জীবনবাদী শিল্পদর্শনকেই সামনে আনে। কারণ, 'এই সৌন্দর্যের সন্ধান ও চর্চাই নন্দনতত্ত্বের সর্বপ্রথম উপজীব্য। ইউরোপীয় দার্শনিক ব্যমগার্টেন নন্দনতত্ত্বকে সর্বপ্রথম "সৌন্দর্যের দর্শন" বলে অভিহিত করেছেন।' (মনজুরুল; ২০০৬: ১১) শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের মানদণ্ড নিয়ে যে বহুমাত্রিক মত রয়েছে, অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও তাতে রয়েছে সৌন্দর্যচর্চারই বাধ্যবাধকতা। কারণ :

> শিল্পসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনার ধারাটি প্রাচীন। বলা বাহুল্য, তা নিয়ে ভিন্নমত এবং যুক্তিতর্কের বিভিন্নমাত্রিক বয়ান কম নয়। তবে ওই বিতর্কের বিষয়বস্তু শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির পেছনে দুটো শক্তি সক্রিয়। প্রথমত শ্রম—তা মূলত মানসিক, কিছুটা দৈহিক, অন্যদিকে পরিবেশ ও নিসর্গ প্রভাব। শেষোক্ত দিকটি, বিশেষত নিসর্গ কখনো হয়ে ওঠে সৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা। সময়ের ধারায় ও মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রেই কথাগুলো সত্য। যেমন সাহিত্যে তেমনি স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায়। তবে এক্ষেত্রে সাহিত্যসৃষ্টিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। (আহমদ রফিক; *কালি ও কলম*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

দেশে-দেশে সময়ে-সময়ে সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে 'শিল্পের জন্য শিল্প' আর 'জীবনের জন্য শিল্প'—এর পক্ষবিপক্ষের মত-দ্বিমত নিয়ে যুক্তিতর্কের নানামাত্রিক শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে। নান্দনিকতা নিয়ে এই তর্কের অবসান কারও কাম্য নয়। এই ধরনের যুক্তিতর্কে এ-বিষয়টি স্পষ্ট হয়, নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দুটি ধারাই প্রবলভাবে সঞ্চরণশীল। তা শিল্পচর্চার ধারাবাহিকতাকেই উচ্চকিত করে। তাই পাঠক বা সমালোচকদের মধ্যে যেমন দুটি ধারার সমঝদার রয়েছে, তেমনি লেখকগণও দুই শিবিরে থেকে দুটি মতকেই প্রতিষ্ঠা করতে চান। সময়ে সময়ে এর উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটে। কারণ:

> কাব্যসৃষ্টিতে সচেতনতা এবং চেতনার অভাবও অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হতে পারে, কিন্তু সে-ও এক আলাদা প্রশ্ন। চেতনা, বরং বলা উচিত আত্মচেতনা যার আর এক পিঠ হল পর-চেতনা, তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ভর করে এক দিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবর্তনে লেখক-ব্যক্তির মানসিক অবস্থিতির উপর এবং অন্যদিকে সমাজ যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তা থেকে উপলব্ধ জ্ঞানের উপর। এ জ্ঞানকে ইতিহাসের এক একটা সময়ে কোনো বিরাট প্রতিভা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং প্রয়োগের উপযোগী করে তার আকার দেন। যেমন, বর্তমানকালে মার্কস, লেনিন এবং মাও-ৎসে তুং। (অরুণ; ১-২: ১৯৯৯)

আদতে শিল্পিত যে-কোনো সৃষ্টি কালজয়ী হলে তাতে অবশ্যই চিরায়ত নান্দনিকতা বিরাজমান থাকে—কেবল সৌন্দর্যচর্চার প্রতিফলন থাকুক কিংবা জীবনকে কেন্দ্র করে শিল্প চর্চা হোক। সুতরাং শিল্পিত জীবনবাদী নান্দনিকতাকে আশ্রয় মেনে অগ্রসর হলেও সুন্দর ও সত্যকে মুখোমুখি করা হয় না, বরং সত্য ও সুন্দরের সাবলীলতাকেই পরম কাঙ্ক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। হয়তো সে-কারণেই বলা হয়, 'শিল্প হচ্ছে পালাক্রমে জীবনভিত্তিক এবং জীবন থেকে পলাতক।' (মনজুরুল; ২০০৬: ১৩) আর তাই কার্ল মার্ক্স, হেগেল, এঙ্গেলসসহ অনেকেই স্রেফ কলাকৈবল্যবাদের যেমন বিরোধিতা করেছেন, তেমনি কেবল অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজকে শিল্প-

সাহিত্যে নান্দনিক চেতনাহীনভাবে উপস্থাপনের পক্ষে ছিলেন না। এঙ্গেলসের ভাষ্য, যে-কোনো চিত্রকলা, ভাস্কর্য কিংবা সংগীতে যে শিল্পসৌকর্য দৃশ্যমান থাকে, তার নেপথ্যে থাকে শ্রম ও শ্রমিকের অবদান। তাই 'হাত শুধু শ্রমযন্ত্র নয়, শ্রমের সৃষ্টিও বটে। এই শ্রমনিবিষ্ট হাতই সর্বত্র জোগায় কুশলতা, যা শিল্পপ্রক্রিয়ার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত অর্জন।' (মনজুরুল; ২০০৬: ১৩) তাই সার্থক বা শ্রমজীবী মানুষের ঐকান্তিকতাকে সৃষ্টি-বিবেচনায় রেখে কালের বিচারে আলোচিত কবিতাসমূহের নান্দনিক সমীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

যে-কোনো শ্রম, শ্রমজীবন, শ্রমিকের স্বপ্ন ও সংগ্রামের সঙ্গে সময় ও সমাজ এবং সংস্কৃতি ও রাজনীতির সম্পর্ক থাকে ওতপ্রোতভাবে। জীবন ও সংগ্রামের যে দ্বন্দ্ব, তা আদিকাল থেকেই সচল। জীবনের প্রবহমানতা ও জীবনের সংগ্রাম দুই বৈপরীত্যের মাঝে নিহিত থাকে কালিক সৌন্দর্য। দ্বন্দ্বহীন জীবনে সৌন্দর্যের স্বাদ থাকে না। তাই বলা যায়, 'জীবন মানেই দ্বন্দ্ব: জীবনের নানান বৈপরীত্য, দ্বৈত এবং পরস্পরবিরোধী প্রকাশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়েই জীবনের উত্তাপ।' (মনজুরুল; ২০০৬: ১২) আর নন্দনতত্ত্বে শিল্প ও জীবনের সংযোগসমূহ এমনভাবে উন্মোচিত হয়ে থাকে, যাতে শিল্পের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রীতি-নীতি ও নির্মাণ প্রকরণও বিন্যস্ত হয় শিল্পকুশলতায়। এই কুশলতার মধ্যে একজন সত্যিকারের শিল্পস্রষ্টার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লুকিয়ে থাকে। নান্দনিক বিশ্লেষণে যখন উন্মোচিত হয় শিল্পীর প্রয়াস, তখন সামনে আসে সময় ও সমাজে প্রতিফলিত জীবনের প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভূত সত্য। শিল্পী-কবিও তা দেখেন, মননের গভীরে লালন করেন। শিল্পী তাঁর চারপাশে যা কিছু দেখেন, তাকেই 'সৃষ্টিমহিমায় মহিমান্বিত' করে পরিবেশন করেন না। প্রকৃতপক্ষে, জীবন এবং তাঁর চারপাশকে যেভাবে তিনি দেখতে চান, যেমন করে উপলব্ধি করতে চান, তা-ই শিল্পিত জীবনদৃষ্টিতে চিত্রিত করেন। এতেও ব্যক্তিবিশেষে থাকে নানা বৈচিত্র্য। আর 'এই বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণ এসব শিল্পীর নিজস্ব জীবনদৃষ্টি ও দেখার আগ্রহের মধ্যে ভিন্নতা। শিল্পী একটি গাছকে যেভাবে দেখতে চান সেভাবে দেখান। দেখা ও দেখানোর এই নিষ্ঠা শিল্পের বৈচিত্র্য ও নির্বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করে।' (মনজুরুল; ২০০৬: ১৫) এই 'নির্বিশেষ ভাব' প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ভর করে স্থান-কাল-পরিবেশের ওপর।

শিল্পসৃষ্টির প্রধান শর্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি—সেটা আনন্দেরও হতে পারে, বেদনারও হতে পারে। মূলত বিষয়ের গভীরের সত্যই সৌন্দর্য সৃষ্টির অবিরাম তাড়না হিসেবে কাজ করে। সেই সত্যের গহীনেই লুকিয়ে থাকে জীবনের সংযোগ। জীবনের আনন্দ-বেদনার সম্পর্কহীন সত্য শিল্প হতে পারে না। কারণ, 'মার্কসবাদ বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্ববীক্ষা। ভাববাদী দর্শন আর বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান বারংবার তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।...একথা সত্য, মার্কস-

এঙ্গেলস কিংবা লেনিন শিল্প-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের কোনো সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক স্বতন্ত্র ইতিহাস বা গ্রন্থ রচনা করে যাননি। কিন্তু এই তিন যুগন্ধর পুরুষ বিভিন্ন সময়ে, নানা উপলক্ষে, শিল্প-সাহিত্য তথা মানস-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তার পরিমাণ বিপুল না হলেও পর্যাপ্ত।' (ধনঞ্জয়; ২০১৩: ১) সেসবের ওপর ভিত্তি করেই মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা অগ্রসর হয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সবকিছু বাদ দিয়ে সাহিত্যে সমাজের অর্থনৈতিক সংকট ও মানুষের সংগ্রামকেই কেবল কার্যকারণ হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁরা সাহিত্যকে বিবেচনা করেছেন এভাবে :

> শিল্প হল, মার্কস-এঙ্গেলস-এর মতে, সমাজ-চৈতন্যের অন্যতম রূপ। সমাজচৈতন্যের অন্যান্য প্রকাশ অর্থাৎ ধর্ম, দর্শননীতি, অর্থনীতি সবই সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রগতিই যদি সাহিত্যের প্রগতির একমাত্র কারণ হত, তাহলে উন্নতমানের সাহিত্যের জন্ম সম্ভব হত না প্রাচীন গ্রিসে। মার্কসীয় দর্শনে, অর্থনীতি হল 'ভিত' বা Base এবং শিল্প-সাহিত্য হল সেই ভিতের উপরে গড়ে ওঠা অধিসৌধ বা Super structure. সাহিত্যের জন্মের সঙ্গে অর্থনীতির বিকাশের সম্পর্ক তাৎক্ষণিক বা ঐকান্তিক না হলেও এই সম্পর্কটি তাৎপর্যবহ। মার্কস বলেছিলেন—ধনবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজে শিল্প-সাহিত্য-কবিতা প্রভৃতি আত্মিক সৃষ্টির প্রতিকূল (Capitalist Production is hostile to concern branches of spiritual production, for example, art and poetry)। (বিমলকুমার; ২০১৫: ৪১)

সেটা স্বীকার করেই বলা যায়, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য সৃষ্টি হয়। প্রতিকূলতাকেই শিল্পস্রষ্টাগণ সৃষ্টির মোক্ষম মুহূর্ত এবং বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেন। তাতে প্রস্ফুটিত হয় নান্দনিক অভীপ্সা। জগদ্বিখ্যাত বহু সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-মানবিক সংকটকালে; অথবা পরবর্তীকালে সেসবকে উপলক্ষ করে। জীবনবাদী সাহিত্যস্রষ্টারা কখনো সাহিত্যের স্বরূপকে ভুলে যান না। কারণ, সাহিত্য উপভোগের সময় অনেকে সামাজিক মানুষদের মানসিক গঠন এবং তাদের মানসিক সম্পর্কের কথা ভুলে যান। কারণ শিল্পী-স্রষ্টা এবং শিল্পরসিকেরা যন্ত্রের মতো বিচ্ছিন্ন সত্তা নন, বরং একে অপরের পরিপূরক। (বিমলকুমার; ২০১৫: ৪৪) এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের বহুল পঠিত ও পাঠকনন্দিত "হে মহাজীবন" কবিতার পঙ্‌ক্তি: 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি/ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/ পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' ইতিহাস-সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে কবিতাটি রচিত। এর চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ উৎপ্রেক্ষা ও উপমান এমন বাস্তবতাকে ধারণ করে আছে, যা একাধারে নির্মম সত্য ও নন্দনশোভন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাপর পরিস্থিতি পাশ্চাত্য-প্রাচ্য কবিদের মধ্যে যে প্রভাব ফেলেছিল, তাকে আমরা মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিকতার বিপরীত অবস্থান হিসেবে গণ্য করে থাকি। জীবনের নঞর্থক ভাবনার প্রভাব—নেতিবাচকতা, নিঃসঙ্গতা, স্বার্থপরতা, নৈর্ব্যক্তিকতার সন্নিবেশে লক্ষ করা যায় সেই সময়ের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কবিতা-নির্বিশেষে। (অরুণ; ৩৯: ১৯৯৯) ত্রিশের বাংলা কবিতায় কলাকৈবল্যবাদী নান্দনিক চেতনার সমৃদ্ধি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিক্ষেপের পর। অর্থাৎ সময়ের শাসনে প্রভাবিত জীবনের কাছে তাদের শিল্পচেতনাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এমনকি অস্বীকৃত হলেও বলা যায়, কলাকৈবল্যবাদী চিন্তার কবিদের নান্দনিক বীক্ষণও কখনো-কখনো জীবনবাদী নন্দনশিল্প প্রবণতার কাছে এসে মুক্তি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে যুগের সামগ্রিক প্রভাব থেকেই শিল্পস্রষ্টাদের বিচিত্র নন্দনভাবনার সূত্রপাত ঘটে। প্রথম মহাসমরের সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যে পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে যে অন্য দৃষ্টির প্রকাশ ঘটছিল, তা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে। উনিশ শতকের কাব্য-ধারণার পেছনেও, পাশ্চাত্য দীক্ষায়, এক পৃথিবী-বোধ ও জাতিবোধ কাজ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে তার ক্রিয়া ছিল আদর্শগত।’ (অরুণ; ৩৯: ১৯৯৯) বিশ্ব রাজনীতি কিংবা স্থানীয় রাজনীতির আদর্শগত যে প্রভাব সমাজের মানুষকে আলোড়িত করে, তা কবি-সাহিত্যিকদের চোখকে সৃষ্টিশীল করে তোলে। এরই মধ্যে বিরাজ করে ভিন্ন ভিন্ন নান্দনিক শিল্পসৃষ্টির দর্শন।

দুই. কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবন : নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষা

উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কালজয়ী সৃষ্টি *মেঘনাদবধ-কাব্য* কাব্য রচনার নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল উপনিবেশায়নের নির্মম বাস্তবতা। রাবণের দেশপ্রেম, জনদরদ ও প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলা কবিতার জন্য নতুন দৃষ্টান্ত। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগমনধ্বনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সচকিত করে তুলেছিল। তাঁর গানে-কবিতায় তার ছাপ নানাভাবে পরিস্ফুট। এরপর তাঁর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী অবস্থান আরও জোরালো হতে থাকে, যার প্রভাব পড়ে সেই সময়ের সৃষ্টিশীলতার মধ্যে। ‘কলাকৈবল্যবাদী’ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি হয়ে ওঠে জীবনবাদী ও সমাজ-সচেতনতার স্মারক। শিল্পের নান্দনিকতা নতুন করে ধরা পড়ে তাঁর কবিতায়। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় সাম্যবাদ ও দ্রোহ চেতনার প্রতিফলন ঘটে, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে মানুষের অধিকারহীনতার কারণেই। তেমনি ত্রিশের কবিদের কবিতা যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনায় সাফল্য অর্জন করেছিল, তার ওপরও সময়ের অনিবার্য শাসন ছিল অনস্বীকার্য। ত্রিশের শেষের দিকে দিনেশ দাস, সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব যে রাজনৈতিক সচেতন কবিতা সৃজনের মধ্য দিয়ে, তাতে যে নতুন নান্দনিক কাব্যভাষা তাঁরা বিনির্মাণ করেছিলেন, তার শৈল্পিক মূল্য অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নঞর্থকতার বিপরীতে ছিল তাঁদের সৃজনশীল অবস্থান। ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াকু-সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়েও সার্থক কবিতাসৃজনের অকৃত্রিম প্রয়াস তাঁদের কবিতাকে নতুন শিল্পকৌশলের দিকে উন্নীত করেছিল। সেই প্রবণতা বাংলা কবিতাকে শক্তিশালী কাব্যভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে বলা যায় :

> বিংশ শতাব্দীর নব্য কলাকৈবল্যবাদীরা ছিলেন মূলত আঙ্গিকবাদী। ওই শতাব্দীতে 'কার্ল মার্কস প্রণীত "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে" বিশ্বাসী মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকগণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বাস্তবতাবর্জিত এই কলাসর্বস্ব কবিতা, যা বিপ্লবকে নির্জিত করে এবং কেবল অবসরের সাধনা করে, তাকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করেন। মার্কসবাদীরা শিল্পকর্মে সামাজিক ভূমিকাকে প্রাধান্য দেন এবং তাকেই নান্দনিকতার একমাত্র আদর্শরূপে গণ্য করেন। (তারানা; জুন ২০১৯)

পরিস্থিতিজনিত প্রতিক্রিয়া যুগে যুগে পৃথিবীর সব দেশেই হয়। কবিগণ নিজেদের সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে সেগুলোকে সৃজনপ্রক্রিয়ায় শামিল করেন। কখনো তা সমকালে প্রকাশ্য হয়, কখনো কালের দীর্ঘপরিক্রমায় উন্মোচনের অপেক্ষায় থাকতে হয়। ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। যেমন জীবনানন্দ দাশকে আপাতভাবে রোমান্টিক ও কলাকৈবলীবাদী কবি মনে হয়। অথচ উন্মোচনের অভাবে গোচরীভূত হয়নি যে, 'জীবনানন্দকে বর্তমান পৃথিবী ক্লান্ত করেছিল, তিনি নিসর্গ এবং প্রাচীনকালের অনুভবের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেন, কিন্তু সেখানেও তাঁর অবস্থান ঘিরে বিধূরতা আর অবসানের আবহাওয়া। বর্তমানের পরিবেশ স্বভাবতই তাঁর মনে বিস্মৃত থাকতে পারেনি। তিনি তাকে ঘৃণা দিয়ে, ব্যঙ্গ দিয়ে আঘাত করেছেন এবং এক আশাহীনতার মধ্যে আবর্তিত হয়েছেন।' (অরুণ; ৪২: ১৯৯৯) তাঁর মতো নৈর্ব্যক্তিক কবিও সময়ের শাসন উপেক্ষা করতে পারেননি। কাব্যবীক্ষণে সময়ের এই প্রভাব আবিষ্কৃত হলে যে-কোনো কবিতার বিশ্লেষণ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অনেকেরই ধারণা, 'তাৎপর্য তার সৃজন-ধর্মে। সৃষ্টিশীল মনই একমাত্র সেই রকম রচনার জন্ম দিতে পারে। সে-মনের উপর যখন জীবনের অভিঘাত পড়ে, তখন সাহিত্যকে উপলক্ষ করে সে তার নিজের দৃষ্টি ও উপলব্ধির কথা বলে এবং এমনভাবে বলে যা অন্য কারো কথাও হয় না, ভঙ্গিও হয় না। সে তার স্বকীয় সৃজন।' (অরুণ; ০৭: ১৯৯৯)

মূলত সময়চেতনার সেই প্রবণতার প্রভাবেই চল্লিশের দশকজুড়ে বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাজনৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়েও নান্দনিক শিল্পচর্চা করে গেছেন।

তাঁদের কবিতায় যদি কেবল ভাবানুষঙ্গী নান্দনিকতা বিরাজ করত, তবে তা মানুষকে আলোড়িত করত না। নান্দনিক শিল্পচর্চা করার মধ্য দিয়ে তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যাশা করে গেছেন, যাতে বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী জীবন হয়ে উঠেছে কবিতার প্রধান বিষয়। উল্লেখ্য, চল্লিশের অন্যতম কবি আহসান হাবীব কোনো দলীয় দর্শনকে সরাসরি কবিতায় না আনলেও সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল তাঁর কবিতায় নান্দনিকতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম আশ্রয়। তাঁর ও সমসাময়িক কবিদের সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার পথ ধরেই নির্ধারিত হয়েছে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার কবিতার পথযাত্রা। সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সূত্র যখন জীবনকে অস্তিত্বসংকটের মুখোমুখি করে ফেলে, তখন সৃজনশীল মানুষকে তার সৃষ্টি দিয়েই রুখে দাঁড়াতে হয়। কারণ, জীবন-সমাজ-রাজনীতি তখন অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে; যেন এক পৃথিবী ছাড়া অন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব নাজুক।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতায় যে নতুন একটি ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাতে জীবন-রাজনীতি-অস্তিত্ব-সংস্কৃতির বহুমুখী মেলবন্ধন ঘটে। কারণ, 'শিল্পক্রিয়া ব্যক্তির স্বকীয় ও সামাজিক অস্তিত্বের উপলব্ধিসমূহকে অস্তিত্বের মৌলিক অভীষ্ট সিদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপান্তরণের প্রক্রিয়া বিশেষ।...এসব কবিতা সামাজিক মানুষ হিসেবে কবির ব্যক্তিসত্তা থেকে কল্পিত কবিসত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াসেরই সাক্ষ্য দেয় না, কবির এ-ধারণাকে মূর্ত করে তুলতে চায় যে, উভয় সত্তা পরস্পর চিরকালের প্রতিপক্ষ হিসেবে সর্বদা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত।' (আজীজুল; ১৯৮৫: ৩৩) এই পরিস্থিতিতে কবিদের কাছে 'শিল্পের জন্য শিল্প' একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ, ভূখণ্ডের বিভাজন, মানুষের ভেতরে স্থাপিত হওয়া ধর্মীয় অসাম্য ইত্যাদি পথ ধরে নতুন কাব্যভাষার আবির্ভাব ঘটে। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের বাংলা ভাষার কবিতার পথযাত্রার আরম্ভ হয়। সেই প্রবহমানতার ভেতরেই একই ভাষী, অভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মাঝখানে দেশভাগ এসে যায় হৃদয়ভাঙার বাস্তবতা নিয়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পূর্ণ অবিচক্ষণতার দরুন যখন ভারতীয় উপমহাদেশের ভূখণ্ড ভাগ হয়ে যায়, তখন মানবমুক্তির লড়াইয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আদর্শে রাজনৈতিক সচেতনতাই বাংলা কবিতার প্রধান প্রবণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশভাগের অনিবার্যতার ফলে নতুন মানচিত্র, নতুন রাজধানী, নতুন রাজনৈতিক সংকট, মানুষের চিন্তাচেতনার বদল, স্বপ্ন-স্বাদ-সংগ্রামের বদল ঘটে। সাধারণ মানুষের স্বপ্নও বিভক্ত হয়ে যায়, হাত থেকে ছুটে যায় অনেক কিছুই। এর মধ্যেই ধর্মীয় হঠকারিতার ফসল যখন মেনে নিতে হয় সবাইকেই, তখন হাজার বছরের অভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায় স্থায়ী সীমানা-দেয়াল। পরে পাকিস্তান শাসিত

পূর্ববাংলায় আটচল্লিশে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির পর। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলাদেশের কবিতাকে স্বকীয় ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। সামগ্রিক 'বাংলা কবিতার' ক্যানভাসে এ সময়ের কবিতার শব্দচয়ন, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস, ছন্দের কারুকার্য, শরীর গঠন—সবকিছুতেই স্বতন্ত্র অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বিশেষ করে যখন শোকাহত কবি উচ্চারণ করেন :

আমরা জানি তাদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো 'ওসমান'
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
(মাহবুব উল আলম চৌধুরী; ২০১৯: ৪৯)

ধান বাংলার কৃষকের কাছে স্বর্ণের চেয়ে মূলবান; প্রধান অর্থকরী ফসল, প্রধান খাদ্যশস্য। 'মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়' যে কৃষক পিতা, তার সন্তানই হয়েছে গুলিবিদ্ধ। যেখানে তেমন পিতার সন্তানের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেখানে কেবল 'শিল্পনিপুণা' কবিতা রচনা অনর্থক। বরং জনতাকে উজ্জীবিত করে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কবির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লক্ষণীয়, পরিস্থিতি যখন বিস্ফোরুণ্মুখ ছিল, তখন কলাকৈবল্যবাদী কবিতাপ্রকরণ অনেকাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার দাবিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার ঘটনায় আমরা অভিন্ন চেতনায় আরও শিল্পসমৃদ্ধ নান্দনিক কবিতা রচিত হতে দেখি। এখানে শিল্পিত উচ্চারণে জীবন ও জাতিগত অস্তিত্বের যে দৃষ্টান্ত প্রতীয়মান, তা বিশ্বকবিতার জন্য হয়তো এক নতুন স্বরের আবির্ভাব। এখানে কবিতার ভাষা, শব্দচয়ন, বিষয়ের নতুনত্ব, উপস্থাপনের স্বাতন্ত্র্য থেকে শুরু করে নতুন নান্দনিক চেতনাও প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। জনচেতনার এই আবেগের নান্দনিক মূল্য সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে তা কাব্যের এক অমোঘ সত্যে পরিণত হয়েছে। কাব্যের সত্যের যেমন বিষয়গত মূল্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে চিরায়ত নান্দনিক মূল্য। কেননা, 'Aesthetic objects are aesthetic in so far as they arouse emotions peculiar not to individual man but to associated men. From this arises the disinterested, suspended and

objective character of aesthetic emotion.’ (Christopher; 1937: 127) আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘...সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি/ রামে জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।’ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৩৮: ২৫) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ‘কবিতায় শব্দ তার নিজের মূল্য নিয়েই দাঁড়ায়. পথটাও সেখানে ঘর। কবিতার শব্দ, সে তো হাঁটার ছন্দ নয়, সে এক নাচের ছন্দ। অন্য কোনো লক্ষ্যের দিকে তার যাওয়া নয়, সে নিজেই তার লক্ষ্য।’ (শঙ্খ; ২০২১: ২০৯) কারণ, শব্দ বিষয়ের বাহক। বিষয়কে শব্দের নতুন ব্যবহারই স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত করে। তবে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর উল্লেখিত কবিতার শব্দসমূহ একই সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্য ও কাব্যিক সত্যের চিরায়ত নান্দনিক সৌন্দর্য ও সৃজনবৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। কেমন পরিস্থিতি বিরাজমান থাকলে কবিতার নাম হতে পারে, “কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি”, তা সহজেই অনুমেয়। বক্তব্যপ্রধান এ-কবিতায় তিনি জনচেতনাকে পুরোপুরি ধারণ করে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, ছন্দ-প্রকরণেও নিয়েছিলেন স্বাধীনতা। এই ধরনের সাহিত্যকর্মের নান্দনিক অভীপ্সাকে অনুধাবন করতে গেলে কেবল ‘তার প্রতীক ও তার সাহিত্যিক ইতিহাসকে বোঝাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন যে মতাদর্শগত জগতে এটি লিখিত হয় তার সঙ্গে এর জটিল পরোক্ষ সম্পর্ককে বোঝা। এই সম্পর্ক বিষয়বস্তু ছাড়াও রচনাভঙ্গী, চন্দ্র, চিত্রকল্প ও আঙ্গিকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।...সাহিত্যকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে তার কাহিনী ও চরিত্রকে বোঝাই যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র রচনাভঙ্গীর উপর লেখার উৎকর্ষ নির্ভর করে না। মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী লেখককে বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর অভিজ্ঞতার বাস্তব অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সাহায্য করে।’ (সূত্র: তরুণ; ২০০২: ১৬১)।

এই নিরিখেই আমরা দেখতে পাই, প্রবহমান শব্দধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় ধরা পড়ে ইতিহাসের ইঙ্গিত। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে প্রথমে শিরোনামহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত হলেও কবিতাটি পরবর্তী সময়ে “স্মৃতিস্তম্ভ” হিসেবে পরিচিতি পায়।

> হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
> খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ   যে-পদপ্রান্তে
> যারা বুনি ধান
> গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার   হাপর চালাই
> সরল নায়ক   আমরা জনতা   সেই অনন্য।
>
> (সূত্র: হাসান; ১৯৫৩: ৩৭)

কবিতাটিতে অসামান্য দক্ষতায় রূপকের আড়ালে কিছু ঐতিহাসিক ও সুভাষিত শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো নিয়ে অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। তবে শব্দগুলোর গভীরে যে চিত্রকল্প প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাতে প্রতিফলিত হয়েছে শত শত বছরের আগেকার ইতিহাস-ইঙ্গিত। সে ইতিহাস বাঙালির জন্য মধুর নয়। কিন্তু শোষণের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটার প্রত্যাশা যে শ্রমজীবীদের 'পদপ্রান্তে', তার ইঙ্গিত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষক, জেলে, কামারসহ সাধারণ মানুষকে প্রতীকীরূপে ব্যবহার করে কবি একুশের চেতনার একটা গণজাগরণমূলক চিত্রকে ইতিহাসের সত্যে পরিণত করেছেন। এই সংগ্রামী ইতিহাসের সত্যে রয়েছে কিছু রূপক-সাংকেতিক শব্দের বন্ধনে: ইটের পরিবর্তে বসানো হয়েছে অসাধারণ শব্দপ্রতীক; যেমন 'হীরের মুকুট' (মোগল সম্রাট), 'নীল পরোয়ানা' (ইংরেজ শাসক ও নীলকরদের অত্যাচার), 'খোলা তলোয়ার', 'খুরের ঝটিকা' ('বহিরাগত লুটেরা হানাদার যারা লুণ্ঠন শেষে পালিয়েছে') ইত্যাদি। কেননা তাদের প্রতিহত করেছে 'সরল' 'জনতা', যারা 'গুণ' টানে, 'হাঁপর' চালায় আর 'হাতিয়ার' তুলে ধরে। পরোক্ষ বিশ্লেষণে ভাষা-আন্দোলনের তাজা আবেগ নিয়ে রচিত এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধেরও অন্যতম সূচক কবিতা। (হুদা; ২০১৩: বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম)

ত্রিশের দশকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবিতার পর চল্লিশের দশকে যে বিশ্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীগণ, মূলত তখন থেকেই ভাষাভিত্তিক শিল্পচেতনা জনচেতনার প্রতিরূপকে ধারণ করে সামনে এগোতে থাকে। বিশ শতকের সাতচল্লিশের বাংলাদেশের কবিতার সূচনা চল্লিশের প্রলম্বিত নান্দনিক প্রকাশের পথ ধরে। চল্লিশে প্রগতিশীল, সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদী রাজনীতিকে কয়েকজন কবি সরাসরি কাব্যচেতনার অনুকূলে ব্যবহার করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার মানুষের ওপর শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এমন শোষণপ্রক্রিয়াকে চাপিয়ে দেয় যে, তখন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে স্বকীয় সত্তার অন্বেষণ ও সামষ্টিক উজ্জীবন সঞ্চারই কবিদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যে মার্ক্সবাদী দর্শনে নিজেদের শামিল হওয়াকে কবিগণ একসময় 'শ্রমজীবনের মুক্তির' অবিকল্প পথ হিসেবে গণ্য করেছেন, আলাদা করে সেই পথে পঞ্চাশের বাংলাদেশের কবিগণের গমনের উপযোগিতা রইল না। কারণ, মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের 'সমাজ ও রাজনীতিই' এখানে অনিবার্য অবলম্বন হিসেবে উপস্থিত হলো। এভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা যেমন চল্লিশের দশকের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে কবিতায় ধারণ করেছেন, তেমনি সরাসরি মার্ক্সবাদী না হয়েও মার্ক্সবাদকে কবিতার শিরায় প্রবাহিত করেছেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো কবিতা বিশ্লেষক পঞ্চাশের কবিদেরকে ত্রিশের দশকের উত্তরাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে চান, 'Inspired by expressionism and

Marxism, the poets of this group make social realities the dominant theme of their poetry and consciously imitate the poets of the 30's. Shamsur Rahman, Alauddin Al-Azad, Hasan Hafizur Rahman, Syed Shamsul Haq, Al Mahmood... are the most prominent among the poets of this group.' (Source: Khan Sarwar; 1996: 27) আদতে মানবিক ও আস্তিত্বিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে পঞ্চাশের কবিগণ সমাজবাদী নান্দনিক দর্শনে নিজেদের কবিতাকে একাত্ম করতে সমর্থ হন। মূলত কবিরা সেই সময় যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তার সবই ছিল জনচেতনার পরিপূরক। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সফল প্রকাশের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হয় অনির্বচনীয় নান্দনিক সাফল্য। আর যা নিয়ে তাঁরা সৃজনপ্রয়াসী ছিলেন, সেই প্রস্তুতিসাপেক্ষ প্রয়াস সফলভাবে প্রকাশ করতে তাঁদের কোনো কার্পণ্য ছিল না। কেননা, সফল প্রকাশই 'অ্যাসথেটিকের' মূল বিষয়। বিষয়ের সফল প্রকাশ ঘটলে তাতেই সৃষ্টি হয় ভাষিক ও নান্দনিক সৌন্দর্য। (হাসনাত; ২০২১: ১৬) পঞ্চাশের দশকের কবিদের কাব্যযাত্রা ছিল তেমনই বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিশ্রুতির মেলবন্ধনে ঋদ্ধ। ফলে বাংলাদেশের কবিতাযাত্রার মধ্যে বিরুদ্ধস্রোতকে মোকাবিলার যে চ্যালেঞ্জ ছিল, তার মধ্যে নতুন নন্দনতাত্ত্বিক ডিসকোর্স তৈরি হয়ে যায়। এর মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, 'কবি যেন এই চলার পথে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ান একবার, তাঁর ওপর বয়ে যায় প্রবল স্রোত। নিজেকে তখন বিচ্ছিন্ন এবং দূরের মনে হয় তাঁর। বিপরীত স্রোতের এই আঘাত বুকে নিতে নিতে, শৃঙ্খলা আর সামঞ্জস্যের কোনো কেন্দ্র খুঁজে নিতে নিতে, গড়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টি।' (শঙ্খ; ২০২১: ৬৮) এই ধরনের সৃষ্টি ও শিল্পপ্রবণতার মধ্যে বাংলাদেশের কবিতায় দীর্ঘ সময় ধরে কলাকৈবল্যবাদী দর্শনের বিপরীতে জীবনবাদী নান্দনিক দর্শন তার পথ নির্মাণ করে নেয়। বাংলাদেশের কবিতাকে যেসব চিহ্ন-সংকেত-প্রতীক দেখে শনাক্ত করা সহজ, তা জীবনবাদী দর্শন কিংবা 'জীবনের জন্য শিল্প' সৃজনের কারণেই। অন্যদিকে, কলাকৈবল্যবাদী শিল্পচেতনা মূলত বুর্জোয়া কবিসাহিত্যিকদের মধ্যে বিরাজমান থাকে। কারণ, ত্রিশের 'ভাববাদ বুর্জোয়া দর্শনেরই অঙ্গ। বুর্জোয়া শিল্পীরা নিজেদের দেউলিয়াপনা ও দাসত্বের সাফাই হিসাবে আর্টের জন্যই আর্ট ধুয়ো তুলে থাকেন। এই নিছক সৌন্দর্যচেতনা ঐ বস্তা পচা বুলিরই অপভ্রংশ।...সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিলিপি নয়, জীবনের সমালোচনা। সাহিত্যে রূপ পায় সমকালের সামাজিক সত্য, অনুরণিত হয় আগামী কালের প্রাণস্পন্দন।' (সূত্র: ধনঞ্জয়; ২০১৩: ৭১-৭২)

একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলনে ফজলে লোহানীর কবিতাকেও আমরা সেই মানদণ্ডের নিরিখে বিচার করতে পারি। কবিতাটি একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত নির্মম সত্যকে যেমন তুলে ধরে, তেমনি তাতে জনজীবনের অনাবিল এক প্রতিচ্ছবিকে ভাস্বর করে তোলে। যেমন :

একুশে রাতে আঁধার নামে সব শহরের গলিঘুঁচিতে,
গাঁয়ের বাঁকা পথগুলোতে,
রেল কলোনীতে, কেরাণীর ঘরে, কিষাণের ঘরে।
ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
আঁধার নেমেছে।...
কামারের ঘরে হাপর থেমেছে,
কাস্তে থেমেছে, কোদাল থেমেছে,
রেলইঞ্জিনে সিটি থেকে গেছে। (সূত্র: হাসান; ১৯৫৩: ৩৪)

'রেল কলোনী', 'কেরাণীর ঘর', 'কিষাণের ঘরে' আঁধারের প্রতিচ্ছায়ার পাশাপাশি 'কামারের ঘরে' হাপর ও কৃষকের ঘরে 'কাস্তে' ও 'কোদালের' থেমে যাওয়ার যে ইঙ্গিত কবি দেন, তাতে মূল বিষয় সম্পর্কে না জানলেও একটা অশনিসংকেত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এ-সময়ের কবিগণ ব্যক্তিজীবনে সরাসরি কেউ মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী না হলেও অধিকার আদায় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াকু মানসিকতা পোষণের মধ্য দিয়ে 'জীবনের জন্য শিল্প'-কে কাব্যচর্চার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; যেন মনের অজান্তেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শই ছিল তাঁদের সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে। অবশ্য মার্ক্সবাদী শিল্পদর্শন শিল্পস্রষ্টার ওপর সে-আদর্শের রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার শর্ত আরোপ করে না। কারণ, ভাষা আন্দোলনের মূল সংগঠক ও এর কর্মীগণ ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। পঞ্চাশের কবিগণ ভাষা আন্দোলনের সন্তান বলে তাঁদের সমস্ত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়েছিল সাধারণ মানুষের ওপর। অবশ্য পঞ্চাশের বাংলাদেশের কবিতার নতুনযাত্রা যে আন্দোলনকে ভিত্তি করে অগ্রগামী হয়েছিল, তা শ্রেণিসংগ্রাম ছিল না, ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। তা সত্ত্বেও, তাতে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছিল, তা পাকিস্তানের শোষণপিয়াসী শাসকগোষ্ঠীর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটাই ছিল সমাজতান্ত্রিক। সংগত কারণে, বিষয় নির্ধারণ, শব্দ নির্বাচন, অলংকারের সার্থক প্রয়োগ, ছন্দের কুশলী ব্যবহার, আবেগের শৈল্পিক নিয়ন্ত্রণ—প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিদের নান্দনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। এরই ধারাবাহিকতায় *একুশে ফেব্রুয়ারী*র সম্পাদক কবি হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাতেও পাওয়া যায় অভিন্ন বিষয়ের স্বতন্ত্র বিন্যাসের কবিতা। কবিতাটি পরবর্তীকালে "অমর একুশে" নামে অধিক পরিচিতি পায়। এতে তৎকালীন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অদম্য তরুণদের আত্মত্যাগের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষা ও দেশ কবিতাটিতে জননীর অবিকল্প হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে। যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁরা এই জনগোষ্ঠীর কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই চিত্রকল্প

তিনি এঁকেছেন ক্ষোভ ও বেদনার অবিচ্ছেদ্য আবেগে। সাধারণত তাঁর কবিতার ভাষায় ঢঙ প্রাধান্য পায়। এখানেও তেমন প্রয়াস লক্ষণীয় :

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়...
শ্রমিক তার শিল্পের প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি

(হাসান; ১৯৫৩ : ৪৯)

'বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো'র মধ্যে কবি সফল সোনালী শস্য আশা করবেন, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জাগরণ ঘটেছিল বাঙালির মধ্যে, সেই জাগরণ সম্প্রসারিত হয়েছে শহর থেকে প্রত্যন্ত জনপদ পর্যন্ত। তারই সফল রূপায়ণ কবি করেছেন 'লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ'-এর মাঝে 'শিখা' প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসচেতনাকে কবিতার শরীরে তুলে এনে অত্যন্ত সহজ প্রকরণকৌশলেই তিনি যেন বাঙালির মনকে নাড়িয়ে দিয়েছেন অসামান্য দক্ষতায়। যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা থেকে কবি হাসান হাফিজুর রহমান *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেই চেতনাই তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্র নন্দনবীক্ষার উপাদানে ও উপস্থাপনায় সচেতন পাঠককে ঐতিহাসিক নান্দনিক চিন্তায় উজ্জীবিত করে এবং পূর্ণতার স্বাদ এনে দেয়। কারণ, এই চিন্তার পথই বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের কবি হিসেবে পঞ্চাশের কবিদের প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। পঞ্চাশের কবিগণের যে অগ্রযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল ভাষা আন্দোলনসহ সেই সময়ের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পটভূমির মধ্য দিয়ে, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই সেই পথ আঁকড়ে ধরেই শব্দে-বিষয়ে-বিন্যাসে বাংলাদেশের কবিতাকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

কৃষক-শ্রমিকের অধিকার যখন তাঁদের কবিতার বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে জীবন ও সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও ইতিহাস, আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞার সম্মিলন ঘটে। কেবল শিল্প যে সৌন্দর্য উপভোগের জন্য নয়, বরং শিল্পের ওপর দায়িত্ব এসে যায় জনসমাজকে জাগিয়ে তোলার। সেই জাগরণের মধ্যেও ভাস্বর হয় নান্দনিক পরিতৃপ্তি। এই ধরনের প্রয়াসে যে চিত্রকল্প ও রূপক ব্যবহৃত হয়, তাতে অনায়াসে মার্ক্সবাদী নন্দনচিন্তার স্মারকও রচিত হয়ে যায়। কেননা,

'সাহিত্য-সমাজ-নন্দন-ইতিহাস-দর্শন অর্থাৎ মানববিশ্বের এমন কোনো দিক নেই, যার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষা বারবার জীবনের নতুন তাৎপর্য খুঁজে নিতে চায়নি।...এক কথায় মার্ক্সীয় বীক্ষণরীতি চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে দিয়েছে এবং তত্ত্ববিশ্বের মানবিক উপযোগিতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।' (তপোধীর; ২০০৬: ১৫৫) জাতীয়তাবাদী কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ যেন সমাজসত্যের সেই নান্দনিকতাকে চিত্রিত করেছেন শ্রমিকের সংগ্রামী পৃথিবীকে আন্দোলিত করার মধ্য দিয়ে। প্রকরণকৌশলেও লক্ষ করা যায় স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা :

আমি শ্রমজীবী মানুষের
উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
আদিবাস অরণ্যের
অনার্য সংহতির কথা বলছি
শৃঙ্খলিত বৃক্ষের
ঊর্ধ্বমুখি অহংকারের কথা বলছি
আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।

(ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ১০২)

বৃক্ষরাজি বনের মুক্তাঞ্চলে যত সুন্দর, যত সতেজ, ততটা নয় শৌখিন মালিকের গৃহবাসের টবের সংকীর্ণ ও কৃত্রিম ভূমিতে। শ্রমজীবীদের পরনির্ভর জীবনকে কবি প্রতীকায়িত করেছেন 'শৃঙ্খলিত বৃক্ষের/ ঊর্ধ্বমুখি অহংকারের কথা' বলে। একই সঙ্গে তাদের অতীত ও বর্তমান যে অভিন্ন, সেই চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে কবি যুগ যুগ ধরে লড়াকু জীবনের অধিকারী মানুষের অবিকল্প অবস্থার কথাকে শব্দশৈলীতে গেঁথেছেন। এখানে 'আদিবাস অরণ্যের' রূপকার্থে প্রাচীনকালের গুহা ও জঙ্গলজীবনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা প্রাচীন সভ্যতার চিরায়ত স্বরূপকে উন্মোচিত করেছে। যে ধরনের শব্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহার কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর স্বকীয়তাকে চিহ্নিত করে, তার দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে। কবিতায় তাঁর সৌন্দর্যচেতনা শব্দ-স্বকীয়তার কারণেই ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। কারণ, তিনি ছাড়া আর কেউ 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' করেননি। একেবারে ভিন্ন রকম শব্দস্বাদে উপমা-উপমেয়কে একাত্ম করে দেন কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দিয়ে :

আমি সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করেছি
বর্ণ এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছি
শস্য এবং গাভির জন্য প্রার্থনা করেছি
আমি ভূমি এবং কৃষকের জন্য প্রার্থনা করেছি।

(ওবায়দুল্লাহ; ২০১৬: ১১০)

'গাভী', এবং 'শস্য', 'ভূমি' এবং 'কৃষক' আধার ও আধেয়ের মতো। একে অপরের পরিপূরক। সমৃদ্ধ অতীত ফিরিয়ে আনতে দুটি বিষয়ই পরম কাঙ্ক্ষিত জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের জন্য। এই শব্দচয়নকে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর স্মারক হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। তাঁর শব্দ ব্যবহার ও চিত্রকল্প সৃজন স্বতঃস্ফূর্ত সারল্যে পরিপূর্ণ। শব্দশৈলীর নৈপুণ্যে তার কাব্যপ্রয়াস যেন সাধারণের সঙ্গে তৈরি করে নেয় ঐতিহ্যিক সংযোগ। ফলে তাঁর কবিতার মাধ্যমে পাঠক ও শ্রোতা এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও রস আস্বাদন করে। এই ধরনের 'যে-কোনো সুন্দরই শিল্পীর অন্তর্জগৎ-জারিত হয়ে নতুন রূপ ও রসে প্রকাশিত হয়ে নান্দনিকতাপ্রাপ্ত হয়। বস্তুজগতের সত্য ও সুন্দর কবির অহং বা আমিত্ব, অভিজ্ঞতা ও সজ্ঞার সংস্পর্শে, রূপ-সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় রসনিষ্পন্ন হয়ে তবেই নান্দনিক হয়ে ওঠে। কবির উদ্দেশ্য সেই নতুন সুন্দরের প্রতিষ্ঠা।' (তারানা; ২০১৯)

কবিতার নান্দনিকতা বিবেচনায় লক্ষণীয় যে, অনেক সময় ব্যক্তিকবির নিজস্ব সৌন্দর্যচিন্তা সামষ্টিক ব্যঞ্জনায় আবিষ্ট হয়ে যায়, আবার কোনো কোনো সময় সামষ্টিক চিন্তার আলোড়ন ব্যক্তিক চিন্তার প্রকল্পে উদ্ভাসিত হয়। দুই সৌন্দর্য চিন্তার মাঝে কখনো থাকে প্রতিজ্ঞা, কখনো কেবল সুন্দরের সাধনা। একইভাবে কৃষি ও শ্রমজীবন কখনো কবিতায় উঠে আসে তাদের পক্ষ হয়ে, তাদের জীবনসংগ্রামের সমব্যথী হয়ে, কখনো লড়াইয়ের অংশ হয়ে আবার কখনো-বা কেবল তাদের যাপিত জীবনকে কবিতায় চিত্রিত করে একটা সফল কবিতা নির্মাণের প্রয়াসে। এতে কখনো স্থান পায় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি বা প্রতিকারের দিকে না গিয়ে শামসুর রাহমান বেশির ভাগ সময় শ্রমজীবনকে নিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। যেমন: 'এ-শহরে/ কেউবা হাপর টানে, অক্লান্ত পেটায় লোহা কেউ;/ কেউবা ঘুরিয়ে চাকা গড়ে নানা ছাঁদে।' (রাহমান; ২০০৬: ৭১) যারা 'হাপর' চালিয়ে 'অক্লান্ত পেটায় লোহা' তাদের কর্মক্লান্ত শরীর কবিকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছে। হাপর চালিয়ে উত্তপ্ত লোহাকে পিটিয়ে পিটিয়ে যে-কোনো ছাঁচে ফেলা যায়। যিনি বাংলাদেশের গ্রাম কিংবা শহরতলিতে লোহার হাতিয়ার কিংবা কৃষক-শ্রমিকের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে স্বচক্ষে দেখেছেন, তার পক্ষে এই চিত্র অনুধাবন করা কঠিন কিছু নয়। আপাত চোখে কবি এখানে সেই চিত্র অঙ্কন করেছেন সত্য, কিন্তু একটু গভীরভাবে উপলব্ধি করলে স্পষ্ট হয়, এই শ্রেণির মানুষকে চাইলে শাসককুল যে-কোনোভাবে শোষণ করতে পারে। কবিতার বিষয় যা-ই হোক, এর নান্দনিকতা রয়েছে শব্দবন্ধের অভ্যন্তরে। শ্রমজীবীদের অস্তিত্বসংকটের বিষয়টি উপলব্ধি করেই হয়তো কবি তাদের সাথে একাত্ম হতে চেয়েছেন এভাবে:

আমি মেঘনার মাঝি, ঝড়-বাদলের
নিত্য সহচর

আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত-কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
(রাহমান; ২০০৬: ৮৫)

উপমান আর উপমেয় যখন একাত্ম হয়ে যায় এবং শব্দের স্বকীয় ব্যবহার নিশ্চিত হয়, তখন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নান্দনিক আবহ তৈরি হয়ে যায়। কারও সঙ্গে তুলনায় না গিয়ে তিনি সরাসরি বলেছেন, 'আমি মেঘনার মাঝি', 'আমি চটকলের শ্রমিক', 'আমি মাটিলেপা উঠোনের/ উদাস কুমোর'। তার এই প্রকরণকৌশল কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ডিকশনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তিনি সাধারণের কাছে নাগরিক কবি হিসেবে খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কবিতা ও কবিসত্তা সম্পর্কে একটা সাধারণ মূল্যায়ন হিসেবে গ্রহণ করা যায় নিচের বক্তব্যকে :

> Shamsur Rahman's poetry inherits the historic fusion of the classical and romantic: his poems of the city contain in its heart a romantic desire to go back to the quite beauty of Nature and to live "a life of sensations rather than thought." A number of seeming contradictions run through his poetry: he is at the same time Nature-loving and incurably urban, of the pleasures of life and a morose commentator on its ills. He is at the same time excited and afraid; he is desirous of moonshine but walks under a scorched sky with "sunshine in the skull." (Ashraf; 2010: 122)

শামসুর রাহমানের দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি গ্রামভিত্তিক শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে গভীর ও নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং শহরের শ্রমজীবী ছিন্নমূল মানুষের সংগ্রাম। কবির দৃষ্টিভঙ্গির এই নান্দনিকতা তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে নিয়ে গেছে। কারণ :

> তিনি তো বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আত্মসমগ্র কবিসত্তা নিয়ে অজস্র কবিতা রচনা করে গেছেন। আমাদের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানাস্তরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সজাগতায় তিনি আধুনিক, কারো মতে আমাদের অপুষ্ট বিকাশ, কারো মতে প্রাক-বুর্জোয়া স্তরের কবি।...রাহমানের চিত্রকল্পগুলির নির্মাণশৈলীতে হরেকরকম তুলনা ও শব্দানুষঙ্গের অভিনব কৃৎকলা দৃশ্যমান। মেধা ও কল্পনার অত্যদ্ভুত মিলন দৌত্যে কখনো সেগুলো হয়ে ওঠে চেষ্টাবেদন [Kinaesthesis], নানা ভাবকে জড়িয়ে এই চিত্র লতানো গড়ানো চিত্রলতা হয়ে, অনুভূতি-কল্পনার ঘাসের বুকে নিজেকে ছড়াতে থাকে। যদি তা ঘটনাবৃক্ষ খুঁজে পায় তবে বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। সেসব ঘটনা আমাদের জাতিরাষ্ট্র ও শ্রেণীসত্তা গঠনের ইতিহাসযুক্ত। (আকতার; ২০১৪: ১৪-১৫)

সংগতকারণে শামসুর রাহমান তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঠক ও শ্রোতাপ্রিয় কবিতা 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'য় সহজাত ভঙ্গিতে যে চিত্রকল্পের সমাহার সৃজন করেছেন, তা ইতোমধ্যে চিরায়ত মূল্য অর্জন করেছে। সভ্যতার কারিগরদের মতো একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সফলতা যে সাধারণ তথা শ্রমজীবীদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে, তা অননুকরণীয় ঐতিহাসিক চিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন। অসাধারণ শব্দবন্ধ নির্বাচনের কারণে কবিতাটি তাঁর স্বকীয়তার স্মারক বহন করছে। নামগুলো যেন তাদের পেশাজীবনের সঙ্গেই অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত—'সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক', 'কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা', 'মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি' প্রভৃতি নামই ছিল মুক্তিযুদ্ধের লড়াই ও অর্জনে সর্বসাম্প্রদায়িক জনসম্পৃক্তির স্মারক। স্বকীয় শব্দচয়নই শামসুর রাহমানের কবিতাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। কারণ তিনি নিজগুণে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। তাই 'ব্যক্তিগত, বিষাদখচিত মনোবিশ্ব থেকে কলরোলদীপ্র প্রতিবেশপৃথিবী অভিমুখে শামসুর রাহমানের যাত্রা। সর্বব্যাপী অন্ধকার ও মৃত্যুগন্ধভারাতুর মনোবিশ্ব ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসেন তিনি, এবং প্রবেশ করেন রৌদ্র-অগ্নি-ব্যর্থতা-শ্লোগান-স্বপ্নশূন্যতা-বিক্ষোভ-কোলাহল কবলিত ঝাঁঝালো জীবনে।' (আজাদ; ২০০৮: ৩৭) তাঁর কবিতার নান্দনিকতা একনজরেই ধরা পড়ে যে-কোনো চৌকষ পাঠকের দৃষ্টিতে। তাঁর এমন নান্দনিক দৃষ্টির সৃষ্টি বাংলাদেশের কবিতার নান্দনিক বয়ানকে সমৃদ্ধ করেছে।

পঞ্চাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি সৈয়দ শামসুল হক। শব্দের স্বতন্ত্র কৌশল প্রয়োগে তিনি অনন্য। তাঁর সাফল্য রয়েছে কবিতায় নিরীক্ষাধর্মিতার জন্যও। তাঁর কবিতায় যেখানে কৃষি ও শ্রমজীবন এসেছে, সেখানে তিনি কেবল বর্ণনা নয়, একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজেকে কৃষক-শ্রমিকের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সমাজের শোষিত এই শ্রেণির পাশে থাকে না কোনো সুবিধাভোগীরা। ফলে শোষকদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক শব্দবাণ নিক্ষেপ করেছেন কবি; সামনে এনেছেন কৃষকের বৈশ্বিক করুণ চিত্র। 'সবচেয়ে খেতে ভালো বাংলার কৃষক'—কৃষক-জীবন সম্পর্কে গভীর নান্দনিক পর্যবেক্ষণের ফলেই এমন পঙ্ক্তি সৃজন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে :

> এশিয়ায় আফ্রিকায় অবিকল সেই
> একই স্বাদ; নিয়মিত খেতে বড় শখ।
> তবে যদি প্রশ্ন করো উত্তম কোথায়?—
> সবচেয়ে খেতে ভালো বাংলার কৃষক।
>
> (হক; ১৯৯৯: ১১০)

শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে তাঁর চিন্তার বাস্তবতা হলো 'যেমন শ্রমের কোনো বিকল্প নেই/—এই শ্রম আমাদের প্রযুক্ত হোক।' শ্রমজীবীর শ্রমের সংকট কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাই কাম্য। তাই বিষয়ের তাৎপর্য অক্ষুণ্ন রেখে অধিকারের কথা যেমন বলতে চেয়েছেন কবি, তেমনি তাতে আলংকারিক শক্তিমত্তাও প্রয়োগ করেছেন দারুণ শৈল্পিক কৌশলে। দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

যেমন শ্রমের কোনো বিকল্প নেই
—এই শ্রম আমাদের প্রযুক্ত হোক...
সংসার, শ্রম, জীবনের ভেতরে অর্জিত জীবন—
স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই,
জীবনের বিকল্প শুধু জীবন;
জীবন ও স্বাধীনতা আমাদের হোক।
(হক; ১৯৯৯: ২৬২)

একজন শ্রমজীবীর অন্তর্নিহিত কাঙ্ক্ষিত এক সত্যের দিকে ধাবিত হয়েছে তাঁর অনুচ্চ কথাসমূহ। এর ভেতরে একটা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা আছে, আছে একধরনের আশাবাদিতা। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় সমাজ-সংস্কৃতি ও শ্রমজীবী মানুষের সংকট ও উত্তরণের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তা সামাজিক প্রতিশ্রুতিরই অংশ। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, 'একজন লেখক কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে দেশপ্রেমিক। তাঁকে ভাষায় লিখতে হয়। ভাষায় লেখা মানে হলো, মানুষের কথাই লিখতে হয়।' (হক; ২০১৭: *প্রথম আলো*) তাঁর এই 'মানুষ'ই জনমানুষ, যারা সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য কায়িক শ্রমের বিনিয়োগকে দায়িত্ব মনে করেন। এই নান্দনিক দর্শনই মূলত তাঁর কবিতাকে অনন্য মর্যাদা দান করেছে। কারণ, 'একজন কবি তাঁর কাব্যিক অনুভবের আকাশে স্বদেশে সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিবাচক দোলাচলকে ঐতিহ্যের ঘনীভূত বুদ্ধিবৃত্তিকতায় যদি নান্দনিক করে তুলতে পারেন—তবেই সে-ই কবি বৈশ্বিক কবি-সমাজের শক্তিশালী প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে।' (হাবিব; ২০১২: ১৪) রাজনীতি চেতনা, দেশপ্রেম, সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম টানের জন্য তিনি সাধারণ মানুষকে কবিতায় বিধৃত করেছেন। ফলে তাদের শ্রমজীবনের বিনিময়ে 'জীবনের ভেতরে অর্জিত জীবন'-এর নিশ্চয়তার জন্য নির্বিকল্প শ্রমকে, শ্রমের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাই বলা যায়, 'কারণটা শিল্পের বৈশিষ্ট্যজনিত। শিল্প আমাদের জীবনের গভীর উপলব্ধিজাত সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়; সেখানে বাস্তবতার তীব্র আলো বা চিৎকারকে সরাসরি কবিতা বা শিল্পের শরীরে ব্যবহার করলে শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্যই নষ্ট হতে পারে।...স্বাধীনতার বীজমন্ত্র তাঁর চেতনায় উজ্জ্বল এক উপাদান বরাবরই। ইতিহাস থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন সূত্র।' (তারিকুল; ২০০৮: ১০০) সংগতকারণেই নানামাত্রিক

নান্দনিক কবিতাযাপনের মধ্য দিয়ে সৈয়দ হক সত্যিকারের কবিশিল্পী হিসেবে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সেই দক্ষতার প্রমাণ মেলে অসংখ্য কবিতায়। নিসর্গ ও ঋতু, বিশেষত 'বৈশাখের' ব্যবহার তাঁর কবিতাকে আলাদা নান্দনিক মাত্রা দান করেছে। যেমন:

এ এক বৈশাখ সমস্ত কিছুতে লাঙ্গল চালিয়ে
অনবরত দু'ভাগ করে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে;
উড়ছে
বস্তু আর উদ্বেগের কণা বৈশাখের চুল্লির বাতাসে।
কুটিরে তো স্ফটিক-শীতল মেঝে হয় না
কৃষককে কেউ হাওয়া করে না চন্দনের জলে ভেজানো পাখায়।
চিল একটা চিৎকার করে উঠছে থেকে থেকেই।

(হক; ১৯৯৯: ২১৪)

পঞ্চাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর কাব্যচর্চার মৌল প্রবণতা হলো সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির প্রতি অকৃত্রিম প্রতিশ্রুতি। *একুশে ফেব্রুয়ারী*র সম্পাদক হিসেবে তিনি পঞ্চাশের দশকের সম্ভাবনাময় প্রায় সব লেখককে একত্র করেছিলেন। কবিতাকে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য করতে তাঁর 'জীবনের জন্য শিল্প' প্রয়াসই বাংলাদেশের কবিতার নতুন নান্দনিক যাত্রাপথের অভ্যুদয় সম্ভাবিত করেছিল। শ্রমজীবীদের জীবনসংগ্রাম, জনমানুষের অস্তিত্বসংগ্রাম, রাজনীতির অবিচল গন্তব্য নিরূপণেও তাঁর কবিতা দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কবিতার শরীরে শরীরে মার্ক্সীয় চিন্তা অন্তঃশীলা প্রবাহের মতো সক্রিয় থেকেছে। তিনি খরস্রোতা নদীর গতিশীল প্রবাহকে হাজারও সংকট মোকাবিলা করে প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে জয়ী বাংলার কৃষকের অবিচল কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন 'বাঙাল চাষার মতো ঘাড় বাঁকানো' ব্যতিক্রমী চিত্ররূপময়তায়। তাঁর কবিতায় সচরাচর গদ্যঢঙের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। স্বাধীনচেতা হাসান হাফিজুর রহমান কৃষক-শ্রমিককে কবিতায় তুলে আনার ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ সময় গদ্যের মতো সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া শ্রমিককে তিনি তুলে এনেছেন তাদের জীবনসত্যের বাস্তবতার নিরিখে। যেমন :

নিরবধি কাল পদ্মা যমুনা বাংলারই
যদিও একরোখা, গোঁ-ধরা ষাঁড়ের
মতো কিংবা বাঙাল চাষার মতো ঘাড় বাঁকানো।
দু-ধারে তার বাৎসরিক পলিমাটি,...
শ্রম আর অক্লান্ত বিশ্রামে বিচিত্র
না জানি কী আছে স্তব্ধতায়।

(হাসান; ২০০১: ৩৩-৩৪)

হাসান হাফিজুর রহমানের সমাজঘনিষ্ঠ নান্দনিক প্রয়াসে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, 'কবিতার নান্দনিকতা সমষ্টিবোধ থেকে কালক্রমে ব্যক্তিবোধে রূপান্তরিত হয়। মহাবিশ্ব যেমন এক মহাঘনীভূত শক্তি থেকে ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে-হতে উল্কায় পরিণত হয়, কাব্যও তেমনি তার বিশ্বম্ভর মূর্তি থেকে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে কবি-রূপ উল্কাখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ হয়।' (তারানা; জুন ২০১৯) নিচের পঙ্ক্তিসমূহ যেন তেমন বার্তাই দিয়ে যায় :

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালি শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি;...
শ্রমিক তার শিল্পে প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম

(হাসান; ২০০১: ৪০-৪২)

কবির কাছে কৃষিনিষ্ঠ জীবন প্রতিভাত হয় বলেই 'কৃষাণের' 'পলিসিক্ত মাঠ' 'সোনালি শস্যের আকাঙ্ক্ষায়' স্বপ্ন তৈরি করে তাঁর চেতনায়। একইভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য-চেতনার 'তৃপ্তিতে' 'স্পর্শের পরাগ' মেখে হয়তো শোষণমুক্ত 'আকাশের' দিকে তিনি বাধাবিঘ্নহীন পৃথিবী গড়তে চান। কারণ, কবির দৃষ্টিতে তারাই রাজা, যারা সভ্যতাকে গড়তে চায়। দেশাত্মবোধের অকৃত্রিম চেতনায় তাদের নিবেদনকে কবি বেঁধেছেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক শব্দবন্ধের দক্ষতায়—

কে আসে সঙ্গে দেখ দেখ চেয়ে আজঃ
কারখানার রাজা, লাঙ্গলের নাবিক,
উত্তাল ঢেউয়ের শাসক উদ্যত বৈঠা হাতে মাল্লা দল,
এবং কামার কুমোর তাঁতি।...
শাণিত রক্তে ঢল হয়ে যায় তোমার শিরাময় সারা পথে পথে।
সেই কোটি হাত এক হয়ে
মোছাবে তোমার মুখ তোমার আপন পতাকায়।

(হাসান; ২০০১: ১৫৮)

'কারখানার রাজা', 'লাঙ্গলের নাবিক' পুঁজিপতিদের বিপরীতে এমন শব্দের ব্যবহার যে তৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, তা দিয়ে সভ্যতার কারিগরদের প্রতি একধরনের অনুরাগই দেখিয়েছেন কবি। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে কবিগণ কাব্যচেতনাকেও শামিল করেন, এর প্রামাণিক ও নান্দনিক দৃষ্টান্তের স্মারক উপর্যুক্ত চরণসমূহ।

বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত কবি আল মাহমুদ। গ্রামীণ নিসর্গের নতুন চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর সাফল্য অনন্য। লোকজীবনের নানাবিধ পরিচিত চিত্রকে আধুনিক

প্রকরণকৌশলে নতুন আঙ্গিকে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নির্মিত নান্দনিক সৌকর্যের অনেকাংশেই কেবল সৌন্দর্য-সুখ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশের সমাজ-সচেতন প্রজন্মের কবি হলেও তিনি হেঁটেছেন অনেকটা ভিন্ন পথে। তাঁর পাঠকমাত্রই জানেন, 'Al Mamhmood has tried, that early in his poetic career, to master a style of his own steeped in the smell of the soil.' (Source: Khan Sarwar; 1996: 30) কবি হিসেবে তাঁর সাফল্য এখানেই যে, তিনি অত্যন্ত সাধারণ ও পরিচিত চিত্রমালাকে অসাধারণ নান্দনিক উপস্থাপনায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। সনেট রচনায় তাঁর মুনশিয়ানা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাতে হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখের মতো সামাজিক দায়দায়িত্বের কোনো ইঙ্গিত নেই, আছে কৃষক-শ্রমিককে নিয়ে যথার্থ বর্ণনাশ্রয়ী চিরন্তন নান্দনিক সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার সংবেদ। যেমন :

চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাটরেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।
দেখবেন, লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্তনীল শাড়ির নিশেন।
(মাহমুদ; ২০১৩: ৩৪-৩৫)

স্বকীয় সৌন্দর্যের চিত্রকল্প নির্মাণের কুশলী কারিগর হিসেবে আল মাহমুদ স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন এঁকেছেন মাটিঘনিষ্ঠ শব্দ ব্যবহারে নতুনত্ব আনয়নের মধ্য দিয়ে; যা তাঁকে প্রাতিস্বিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তাতে কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আছে কবি হিসেবে নান্দনিক সৌন্দর্য সৃজনের প্রত্যয়; অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। তিনি শ্রমিককে প্রাধান্য দিয়েছেন মুষ্টিমেয় যে কটি কবিতায়, সেখানে তাঁকে সাম্যবাদী দর্শনের সমঝদার বলে মনে হয়েছে। শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়া যে সমাজের ভারসাম্য অর্জন সম্ভব নয়, সে বিষয়টিও প্রাধান্য পেতে দেখা যায় তাঁর কালজয়ী কিছু কবিতা-ক্যানভাসে। এমন শিল্পিত কবিতায় তিনি অনায়াসে নির্মাণ করেন সার্থক সনেট; আর তাতে পর্ব ও মাত্রাবিন্যাসে গ্রহণ করেন স্বাধীনতা। সনেট রচনায় তিনি পেত্রার্ককে নয়; অনুসরণ করেছেন শেক্‌সপিয়ারের প্রকরণ-পদ্ধতিকে :

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়াছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,

পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

(মাহমুদ; ২০১৩ : ১০৪)

সাধারণত আল মাহমুদ সামগ্রিক কবিতা-প্রবণতাকে কিছুটা নিরীক্ষাসাপেক্ষ অবকাঠামোতেই শিল্পিত হওয়ার পক্ষে ছিলেন। তাঁর আঙ্গিক সচেতনতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'আল মাহমুদ ছন্দ-বিদ্ধ কবি। কবিতার গঠনে প্রথানিষ্ঠ। সারা জীবন অনর্গল সনেট লিখেছেন, বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির লীলা আস্বাদ করেছেন প্রাণভরে। বিশুদ্ধ লিরিক চেতনায় মনন এসে মিশেছে—তারই রূপবন্ধ ধরা পড়েছে সনেটে।' (সূত্র: জিজ্ঞাসা: ২০০৫) সময়ের প্রবহমানতায় অনেক কবির ভিড়ে যখন কোনো কবিকে কোনো সংকেত ছাড়াই কেবল শব্দচয়নের মুনশিয়ানার কারণে আলাদা করে চেনা যায়, তখন একে তাঁর চূড়াস্পর্শী সাফল্য বললে অত্যুক্তি হয় না। *সোনালী কাবিনের* কবি আল মাহমুদ উপর্যুক্ত শব্দসমূহের কারণে তেমনই শিল্পস্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিশেষত 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্র', 'কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত', 'আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন' প্রভৃতি শব্দবন্ধের গহিনে রয়েছে সামাজিক সাম্য প্রত্যাশার নান্দনিক শিল্পভাবনা। সমাজের প্রতি শিল্পকে দায়িত্বশীল করার ক্ষেত্রে আল মাহমুদের এমন প্রয়াস সর্বজনীনতা লাভ করেছে। নান্দনিক প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিকে অতিক্রম করেছেন সমষ্টিকে পাওয়ার প্রত্যাশায়। ফলে তাঁর কবিসত্তার বিকাশের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে সমাজ ও দেশাত্মবোধে। তাই সমষ্টির কল্যাণে শ্রমিকের হয়ে সমাজের স্বরূপ উন্মোচনে গ্রামকে প্রাধান্য তিনি দিয়েছেন। (মাসুদুজ্জামান; ১৯৯৩: ৩০১) প্রেম-নিসর্গ-ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত সাধারণ অনুষঙ্গ। কারণ :

> গ্রামবাংলার মানুষজন, সাধারণ জীবন ও প্রকৃতি আল মাহমুদের কবিতায় নান্দনিক প্রাণস্পন্দন নিয়ে মূর্ত হয়ে আছে। আল মাহমুদের জনজীবনচেতনা পরিবেশ সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছড়িয়ে আছে তাঁর লোকজ-অনুষঙ্গ-নির্ভর কবিতাগুলোতে। সেখানে কবির মনের লতাগুল্ম তন্তুজালের আলো-আঁধারি রহস্য—নানা রঙের বর্ণভার—নন্দনচেতনায় আলোকিত, প্রকৃতি, মানুষ লোকজ-সংস্কৃতি—সবই ঐক্যে; সৌন্দর্যের ধারণায় কবিতায় নন্দন-সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। (মাসুদুল; ২০০৮: ১২২)

এর বাইরে গিয়ে আল মাহমুদ যে লোকজ সংস্কৃতি ও শ্রমজীবনকে সামনে আনেন, তাকে আল মাহমুদের সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি নান্দনিক অভীপ্সার সুচারু বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ, একসময় তিনি মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি দিলওয়ার। শ্রমজীবীদের বিষয় করে তাঁর রচিত কবিতাসমূহ সফল চিত্রকল্পের কারণে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। একটি কাব্যগ্রন্থ তিনি উৎসর্গই করেছেন শ্রমজীবীদের উদ্দেশে। উৎসর্গবার্তায় তিনি শ্রমজীবীদের আত্মত্যাগ ও সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ টেনেছেন। সভ্যতার চালকদের প্রতি এই নিবেদন নান্দনিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে—ছন্দ, চিত্রকল্প, অলংকারের বিবিধ প্রয়োগে। এর মধ্য দিয়েই তিনি শ্রমজীবীদের নিয়ে সুনিপুণ শব্দবিন্যাসে শিল্পিত কবিতা সৃজনে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত :

যাদের চোখের মণি জ্বলে ওঠে রাত পোহাবার আগে
পৌঁছিয়ে দিতে পৃথিবীর কথা সূর্যের পুরোভাগে
শ্রমজীবী সেই মহামানবের রক্তগোলাপী হাতে
আমার কবিতা ছড়িয়ে দিলেম নিদ্রবিহীন রাতে।

(দিলওয়ার; *উদ্ভিন্ন উল্লাস*: উৎসর্গপত্র)

সূর্য জাগার আগে নিদ্রা শেষ করা অর্থে ‘চোখের মণি জ্বলে ওঠে রাত পোহাবার আগে’ এক অনন্য ও দৃপ্ত চিত্রকেই সামনে আনে। প্রচলিত ও স্বীকৃতি ছন্দ ব্যবহারের পাশাপাশি অন্ত্যমিলের কবিতা রচনার প্রতি কবি দিলওয়ারের একধরনের দুর্বলতা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। সাধারণ মানুষকে দেখার নান্দনিক বোধই তাঁকে এমন হৃদয়স্পর্শী কবিতা সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়:

> নন্দনতত্ত্ব সত্যিকার অর্থে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় সাধারণ ব্যবহারিক দর্শন থেকে যাকে বলা যায় ‘শৈল্পিক নন্দনতত্ত্ব’, নিজেদের ব্যবহারের জন্য শিল্পীদের দর্শনে স্থানান্তরের দ্বারা। মূলনীতিটি এখন পরিবর্তিত ও সীমাবদ্ধ হয়েছে একটি সংযোজন দ্বারা: শিল্পে, এটি বলা হয়, (এবং এর অর্থ: জীবনের ক্ষেত্রে এমনটি হয়) সৌন্দর্য হলো সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত মূল্যমান। জীবন আর সৌন্দর্যের অধীনস্থ নয়, বরং জীবনের পরিসরের মধ্যে শিল্পের জন্য একটি স্বশাসিত অঞ্চল দাবি করা হয়। শিল্প তার সুনির্দিষ্ট মূল্যসহ নিজের জন্য অস্তিত্বশীল থাকে। সুন্দর হওয়ার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে। (শফিকুল; ২০২২: ৪৮৪)

কবি যে বিষয়কে যেভাবে দেখেন, সেভাবেই তিনি কবিতাকে নান্দনিক শব্দমালায় গাঁথেন। সেই নান্দনিক সৌন্দর্য ব্যক্তি থেকে সমষ্টি এবং সমষ্টি থেকে তা অনায়াসেই সর্বজনীনতায় পৌঁছে যায়। নান্দনিক চিন্তার কবিতাকর্মের সাফল্যের ভিত এভাবেই রচিত হয়। গণমানুষের জীবনের সঙ্গে যখন শিল্পবোধের একাত্মতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তখন শ্রমজীবনের প্রতিও তা পক্ষপাতী হয়। সংগত কারণে মার্ক্সীয় নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকেই যে দিলওয়ার কবিস্বভাবের অলংকার মেনে এগিয়ে

গেছেন, তা সহজেই বোধগম্য হয়। গণমানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি কবিতার অবয়ব গঠনেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন:

একদা কৃষাণ আমি : হতভাগ্য শ্রমিক মজুর
একক ভোগের দুর্গে দুর্গতির বুকফাটা সুর
শ্বেত কণিকার মতো জারের ঔরসজাত বিষে
সেদিন নীরক্ত আমি অলৌকিক আশার কার্ণিশে।...
বার্তা এলো অতঃপর এই বিশ্ব রিক্তজনতার
একান্ত শ্রমেরি মূল্যে সমগ্র সৃষ্টির অধিকার,
ঝাঁকেঝাঁকে জন্ম নিল অন্ধকারে রৌদ্রের সঙিন

(দিলওয়ার; ২০১১: ৬৯)

'শ্বেত কণিকার মতো জারের ঔরসজাত বিষে' বলে বিশ্বের ক্ষমতাধর সম্রাটদের শাসন-শোষণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কবি। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিতে রয়েছে শ্রমের অকৃত্রিম ভূমিকা, সেই দিককে প্রতীকায়িত করে কবি বলেছেন, 'ঝাঁকেঝাঁকে জন্ম নিল অন্ধকারে রৌদ্রের সঙিন।' বঞ্চনা থেকে প্রতিরোধের অস্ত্রপথ তৈরি হতে পারে, সেই দিকটিকে অসাধারণ প্রতীকের মাধ্যমে তুলে এনেছেন তিনি। শ্রমিকের ঘাম ও কৃষকের লাঙলের ফলায় যে শ্রমনিষ্ঠা রয়েছে, তা অন্য কিছুতে নেই। শ্রমক্লান্ত কৃষকের ঘাম যেমন অকৃত্রিম, তেমনি চাষকাজে লিপ্ত লাঙলের ফলা কিংবা কৃষকের কর্মক্লান্ত শরীরের যে অকৃত্রিম নান্দনিক সৌন্দর্য, তা কবি খুব সফলভাবে চিত্রিত করেছেন একটি কবিতায় :

আমার মহত্ত্ব যদি পায় কভু নির্বাধ সম্মান
জেনো তা নিখিলব্যাপ্ত মেহনতি মানুষেরি দান।
শ্রমিকের হাতুড়ির, কৃষাণের লাঙলের ফলা,
কেরানির লেখনির, মজুরের ক্লান্ত পথচলা,
কামারের কুমারের, ঘর্মসিক্ত শিল্পী ও কবির
নিখাদ সৃজনী তীর্থে আমি পুত্র: জ্ঞানভিখারীর।

(দিলওয়ার; ২০১১: ১৪৭)

'কামারের কুমারের, ঘর্মসিক্ত শিল্পী ও কবির/ নিখাদ সৃজনী তীর্থে আমি পুত্রঃ জ্ঞানভিখারীর।' উপর্যুক্ত কবিতার পঙ্‌ক্তিসমূহে শ্রমজীবীদের জন্য সাম্যচেতনা প্রতিষ্ঠায় কবি একধরনের নিবেদন দেখিয়েছেন। তা সমাজের শ্রমজীবীদের ন্যায্যতা আদায়ের ভবিষ্য-কল্পনা থেকেই হয়তো তিনি সভ্যতা বিনির্মাণের ঝকঝকে অবস্থাকে 'শ্রমিকের দান' হিসেবে দেখেছেন। তাদের কাঙ্ক্ষিত

জীবনের সত্যকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন তিনি তাঁর নান্দনিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যেখানে উপমা আর উপমান একাত্ম হয়ে গেছে তাঁর সৃজনদক্ষতায়।

তিন

বাংলাদেশের আধুনিক মনস্ক এবং 'আন্তর্জাতিক মানের' কবি বলা হয় রফিক আজাদকে। তাঁর কবিতায় নঞর্থক ভাবনা প্রাধান্য পেলেও কৃষক ও শ্রমজীবীদের নিয়ে যে কিছুসংখ্যক কবিতা তিনি রচনা করেছেন, তাতে তাঁর শেকড় কোথায় প্রোথিত, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ষাটের দশকের দেশীয় ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংকটে যন্ত্রণাকাতর কবিকে খুব স্পষ্ট করে পাওয়া যায় ওইসব কবিতায়। তিনি সাম্যবাদী কবিদের মতো শ্রমজীবীদের ভাগ্যের পরিবর্তন চান না, তাদের মতো জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হতে চাননি। কিন্তু তাঁদের একজন হিসেবে নিজেকে ধরতে চান শ্রমজীবন-বিষয়ক কবিতায়। কোনো কোনো কবিতায় চমৎকার চিত্রকল্প সৃজন করে তিনি এক অসাধারণ গ্রামীণ আবহ তৈরি করেন, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা পড়ে ঐতিহ্যবাহী কৃষক ও তাদের দারিদ্র্যের চিহ্ন। পাশাপাশি চিহ্নিত হয় কবির নান্দনিকতার স্মারকও। তেমনই একটি কবিতায় তিনি বলেন :

> তরুণ চাষার হাতে-ধরা প্রবীণ লাঙল, গাছ-গাছালির
> ধারাবাহিকতা, নিকোনো উঠোন শোলার বেড়ার ফাঁকে দেখি
> ঘোমটা-দেয়া চাষা-বউ, ছিমছাম গেরস্থালি, জ্বলন্ত উনুন;
> প্রতিটি বাড়ির থেকে ভেসে-আসা ঢেঁকি-ছাঁটা চালের আঘ্রাণ;
> কিশোর নাতির পিঠে হাত রেখে গল্প করে গাঁয়ের মোড়ল
> অতিক্রান্ত যৌবনের শস্যের ও সুন্দরীর; সাহস, নিষ্ঠার।
> কৃষকের মতো শ্রমে মনো-মৃত্তিকায় পুঁতি মৌল চারাগাছ:
> মুহূর্তেই সেই কচি চারা দেখি সারা বিশ্ব ব্যেপে বেড়ে ওঠে;
>
> (রফিক; ২০০৭: ১১৭)

বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষিসমাজকে কতটা সুনিপুণভাবে অনুধাবন করলে তাঁর নন্দনচিন্তায় অকৃত্রিমভাবে উঠে আসে 'শোলার বেড়ার ফাঁকে'র মতো দরিদ্র কৃষকের ঘরের প্রতীক, 'ঘোমটা-দেয়া চাষা-বউ'-এর মতো সরল জীবনের ইঙ্গিত, 'ছিমছাম গেরস্থালি, জ্বলন্ত উনুন'-এর মতো অতি স্বাভাবিক দৃশ্য এবং নতুন ফসল তোলার পর কৃষকের ঘরে নবান্ন উৎসবের আবহে 'প্রতিটি বাড়ির থেকে ভেসে-আসা ঢেঁকি-ছাঁটা চালের আঘ্রাণ'। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলে কিংবা কৃষকের নিকটবর্তী হয়ে প্রত্যক্ষ করলেই এমন চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। এমন চিত্রকল্পের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা সম্ভব, সৌন্দর্য হলো এক সর্বোচ্চ ও পরম মূল্য। এই সরল ধারণাটিকে

ব্যবহারিক নন্দনতত্ত্বে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সীমাহীন অর্থে গ্রহণ করা যায়। (শফিকুল; ২০২২: ৪৮৩) তা ছাড়া, স্বীকারোক্তির মতো করে তিনি বলেন, 'বহিরঙ্গে নাগরিক—অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক;/ স্থান-কাল পরিপার্শ্বে নিজ হাতে চাষাবাদ করি/ সামান্য আপন জমি, বর্গাজমি চষি না কখনো।' (রফিক; ২০০৭: ১০০) তাই এ মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক মনে হয় যে, এই 'আমি কারও কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে না, আপন ভুবন থেকে উৎসারিত হয় প্রেরণা ও দীপ্তি। বাকবৈভবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই শ্লোক, এবং শব্দে-বর্ণে উপমা-অলঙ্কার-সাহিত্য-জাতিগত প্রতিমার আলোকে সমগ্র কবিতাটি পাঠককে মুগ্ধ করবে।' (বড়ুয়া; ২০০৯: ১১৭)

রফিক আজাদের আরেকটি কবিতায় পাওয়া যায় অনন্য এক দৃশ্যাবরণ। একটি গল্পের স্বাদে তিনি ধরেছেন বংশপরম্পরায় এক কৃষক পরিবার এবং নগরজীবনের অভিঘাতে বদলে যাওয়া তার নতুন প্রজন্মের ভাবনার কথা। স্বাভাবিকভাবে হতদরিদ্র অবস্থা কেটে গেলে, নগরায়ণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এবং কৃষিজীবিতার বাইরের জুতসই পেশাজীবন গ্রহণ করলে কেউ আর কষ্টকর কৃষিজীবন গ্রহণে সম্মত হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। ফলে তিন প্রজন্মের পেশাজীবন গ্রহণ না করে তা প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা জেগে উঠেছে কবির ভেতরে। তাতে কবিমনে মৃদু হাহাকার ও তীব্র বেদনাবোধ উৎপাদিত হলেও তাঁর হাতে কোনো বিকল্পও অবশিষ্ট থাকে না। নিম্নোক্ত কবিতাংশ থেকেই তা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় :

আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে পুরো দুই মাস
এ ঋতুতে কোনো কর্ম ছিল না দাদুর
অবিরাম দড়ি-পাকানোর কাজ ছাড়া,
ছিলেন কৃষক বটে—কৃষিকার্যে ব্রতী;...
মৃত্যু তাকে নিয়ে গেলে ধারাবাহিকতা
বর্তায় পুত্রের ঘাড়ে; পুত্র তার খুব
কৃতকর্মা নয়, তবু ধারা রক্ষা করা
অবশ্য কর্তব্য জেনে দড়িটি পাকাতে
দ্যান মনপ্রাণ, পরবর্তী বর্ষাগুলো
অতি যত্নে পাকাতেন আমার জন্য...
পরম্পরাময় পারিবারিক কর্মটি
করতেই হয় বলে দায়িত্বটি নিই...
আমার মৃত্যুর পর?—সন্তানেরা কিন্তু
অস্বীকারও করতে পারে কৃষি-ঐতিহ্যকে!
কিংবা তারা ঐ দড়ি থাকবেই ধ'রে

কী ক'রে তা বলি—তারা তো আমার মতো
নয় মোটে অনিবার্য কৃষক সন্তান!
(রফিক; ২০০৭: ২১-২২)

কবি যে কৃষক-পরিবারের সন্তান তা যেমন এই কবিতার নান্দনিক শব্দবিন্যাসের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি এক কৃষি উপকরণের প্রসঙ্গ এনে তিনি সামনে এনেছেন এক অভূতপূর্ব চিত্ররূপময় জীবনের কথা। সচরাচর 'আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে' কৃষিকাজ কম থাকে বলে কৃষকের অলস সময়ে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় নিয়ে দড়িসহ কৃষি উপকরণের কিছু তৈরি করে রাখেন কৃষকেরা। সেই বিষয়টি 'অবিরাম দড়ি-পাকানোর' মধ্য দিয়ে তুলে এনেছেন। গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত যে কেউ কবির এই নন্দনচিন্তার উৎস সম্পর্কে অবগত। মনের অজান্তেই হৃতগৌরবের এক নিঃশব্দ আর্তনাদ ভর করে। বিশেষত যখন তিনি বলেন, 'আমার মৃত্যুর পর?/ সন্তানেরা কিন্তু /অস্বীকারও করতে পারে কৃষি-ঐতিহ্যকে!' এমনকি নিজের মতো তাঁর সন্তান তাঁর পারিবারিক পারম্পর্য ধরে রাখবে না, সেই শঙ্কা তিনি মেনে নিচ্ছেন। এই পেশাজীবনের সমাপ্তি দেখে ফেলেছেন কবি। কারণ, তৃতীয় প্রজন্ম 'নয় মোটে অনিবার্য কৃষক সন্তান!'

মহাদেব সাহার কবিতায় দেশপ্রেম ও রোমান্টিকতা প্রাধান্য পায়। ফলে 'তাঁর কবিতা কখনও উচ্চনিনাদে উচ্চকিত নয়, এক মগ্নস্রোতে তিনি অবগাহন করেন—পাঠককে কখনও কখনও প্রায় জানতেই দেন না তার অস্তিত্ব সম্পর্কে, আর কখনও যদি উচ্চ সুরে ধ্বনিতও হয় তা মূল সুরকে আচ্ছন্ন করতে পারে না।' (বড়ুয়া; ২০০৯: ১৫৪) তাঁর কবিতায় এমন বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য সত্ত্বেও বেশ কিছু কবিতায় ঘটেছে মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী চেতনার প্রতিফলন। কৃষক-শ্রমিকের জাগরণের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্তির যে রাজনৈতিক চিন্তা, তা মার্ক্সবাদী নান্দনিক চিন্তার কবিতার শিল্পশৈলীতে ধরা পড়েছে। যথাযথ শব্দপ্রয়োগে তাঁর কবিতার চরণসমূহ হয়ে উঠেছে কৃষক-শ্রমিকের হৃদয়কথন। পাশাপাশি বাস্তবানুগ চিত্রকল্প সৃজন এবং রূপক ও উপমার মতো আলংকারিক উপকরণ প্রয়োগে নির্মিত হয়েছে উৎকৃষ্ট কবিতা। নিম্নোক্ত কবিতার পঙ্‌ক্তিতে বিবরণধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন কবি :

জুঁইফুলের চেয়ে কবিতার বিষয় হিশেবে আমার কাছে
তাই
শাদা ভাতই অধিক জীবন্ত—আর এই ধুলোমাটির মানুষ;
এই কবিতাটি তাই হেঁটে যায় অন্ধ গলির নোংরা বস্তিতে
হোটেলের নাচঘরের দিকে তার কোনো আকর্ষণ নেই,
তাকে দেখি ভূমিহীন কৃষকের কুঁড়েঘরে বসে আছে

একটি নগ্ন শিশুর ধুলোমাখা গালে অনবরত চুমো খাচ্ছে
আমার কবিতা,
এই কবিতাটি কখনো একা-একাই চলে যায় অনাহারী
কৃষকের সঙ্গে...
শোষকের শস্যের গোলা লুট করতে জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে;
এই কবিতাটির যদি কোনো সাফল্য থাকে তা এখানেই।

(মহাদেব; ২০১৭: ৯৯)

বিলাসিতা কিংবা কেবল সৌন্দর্য উপভোগ নয়, প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পের যে সম্পর্ক, সেটাই যেন কবিতাটির 'শাদা ভাতই অধিক জীবন্ত—আর এই ধুলোমাটির মানুষ'-এর মাঝে পাওয়া যায়। রাজনীতি ও শিল্পগুণের মেলবন্ধন কবিতাটিকে ঋদ্ধ করেছে। এই মেলবন্ধন প্রগতিশীলতারও দ্যোতক। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> সমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত শিল্পীর পক্ষে আর রাজনীতি-নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। বলা যায়, পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলো যত বেশি বৈরীভাবাপন্ন হবে, রাজনীতি তত বেশি স্পর্শ করবে সবার জীবনকে। ফলে, রাজনৈতিক বিষয়, চেতনা ও বক্তব্য উত্তরোত্তর বেশি আসবে সাহিত্য জগতে।... সৌন্দর্য সৃষ্টিকে সব সময়ে মনে রাখতে হবে। রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আঙ্গিকের প্রতি অবহেলা সাহিত্য সৃষ্টিকে ব্যাহত করবে। এক্ষেত্রে মাও সে-তুং-এর বক্তব্য স্মরণীয়—'আমাদের দাবি হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একতা, বিষয় ও আঙ্গিকের একতা, বিপ্লবী রাজনৈতিক বক্তব্য ও শিল্প রূপের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খুঁতহীনতার একত্ব। রাজনৈতিকভাবে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পগুণহীন রচনার কোন শক্তি নেই।' (সাঈদ; ২০১৩: ১৭)

আলোচ্য কবিতাটি শোষিত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী, 'তাই হেঁটে যায় অন্ধ গলির নোংরা বস্তিতে।' তাদের কল্যাণে কিছু করার দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে এই কবিতা। কারণ, এই কবিতা 'ভূমিহীন কৃষকের কুঁড়েঘরে বসে' থাকে, 'নগ্ন শিশুর ধুলোমাখা গালে অনবরত চুমো' খায় এবং 'কখনো একা-একাই চলে যায় অনাহারী/ কৃষকের সঙ্গে'। তিনি মূলত পুঁজিপতি কর্তৃক কৃষকদের শোষণের অবসান চান তাদের জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে। তাঁর কবিতা যেন নিয়োজিত হয় জীবনের স্বার্থ রক্ষার কাজে এবং উন্নীত হয় কৃত্রিম শিল্পপ্রকল্পে। তাই বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন, 'শোষকের শস্যের গোলা লুট করতে জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে;/ এই কবিতাটির যদি কোনো সাফল্য থাকে তা এখানেই।' মানুষের বিপন্নতার নান্দনিক চিত্র যেমন কবির সাম্যচিন্তার ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমনি রূপকের সার্থক ব্যবহার হিসেবেও কবিতাটি হয়ে উঠেছে অনন্য।

মানুষের প্রতি লেখকের সামাজিক প্রতিশ্রুতি উন্নীত হয়েছে শিল্পানুষঙ্গের নানাবিধ চিন্তার রূপকে। মার্ক্সবাদী চিন্তার ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশে প্রগতি লেখক সংঘ (১৯৩৬) প্রতিষ্ঠিত হলে প্রগতিশীল বামপন্থী লেখকগণ সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। সেই পথেই সাহিত্যের সমাজবাদী ধারা পরিপুষ্টি লাভ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চিন্তা ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার মতো শক্তিশালী ধারাকে প্রায় পরাভূত করে সাহিত্যের সামাজিক শক্তি বিস্তার লাভ করে। ফলে ক্রমশ সংগ্রামী জীবনের অধিকারী কৃষক-শ্রমিককে নিয়ে এ-ধারার কবিগণও নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে যান। ষাটের দশকে যখন জনদাবির উন্মাতাল অবস্থা বিরাজমান ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলায়, তখনকার কবিগণও সংগ্রামমুখর মানুষের মুক্তিকে যেন খুব সন্নিকটে দেখতে পেয়েছিলেন। এ-কারণে অনেকেই সেই সময় আশ্রয় নিয়েছেন সংগ্রামী সাম্যবাদী চেতনার। কবি মহাদেব সাহা এই চেতনাকেই নান্দনিক কাব্যভাষায় সামনে এনেছেন। তাঁর কবিতায় সেই সময়ের জননন্দিত চেতনা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছে নিচের পঙ্‌ক্তিসমূহে।

> মনে হয় আর কোনো ভয় নেই—
> শোষণের দিন শেষ পৃথিবীতে মেহনতী মানুষ জেগেছে!
> লেনিন এনেছে পৃথিবীতে নবযুগ
> কাস্তে-হাতুড়ি সাম্যের সংবাদ,
> লেনিন এনেছে ঐক্যের মহামন্ত্র
> মানুষে মানুষে মৈত্রীর সেতুবন্ধন;
>
> (মহাদেব; ২০১৭: ১০১)

'শোষণের দিন শেষ পৃথিবীতে মেহনতী মানুষ জেগেছে!'—এর মধ্যে যে বাঁধভাঙা জাগরণের ইমেজ উপলব্ধি করা যায়, তাতে কবির জনকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় যে 'কাস্তে-হাতুড়ি সাম্যের' বিকল্প নেই, সেই সামাজিক সাম্যের মধ্যেই রয়েছে শ্রমজীবনের জয়গান, আছে কবিতাকেন্দ্রিক সামাজিক সৌন্দর্য। কবি বলেন :

> আমি দেখতে পাই এঙ্গোলার কৃষকের মতোই
> বাংলাদেশের ভূমিহীন চাষীও
> মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলেছে আকাশে
> সে-হাত শোষণের বিরুদ্ধে দুর্জয় হাতিয়ার
>
> (মহাদেব; ২০১৭: ১০৩)

কৃষক যখন 'মুষ্টিবদ্ধ হাত' তোলে, তখন তা সব ধরনের 'শোষণের বিরুদ্ধে দুর্জয় হাতিয়ার' হিসেবেই দেখা দেয়। কোনো অস্ত্রই তখন সেই চেতনাকে থামিয়ে রাখতে পারে না। আফ্রিকার এঙ্গোলায় কৃষকের যে দুঃখ, বাংলাদেশের বর্গাচাষিদের অবস্থাও অভিন্ন। যুগে যুগে এই ভূখণ্ডের

কৃষকের বঞ্চনার তুলনা হিসেবে এঙ্গোলার স্মরণ যথাযথ। এখানে সামাজিক চেতনা আর শিল্পের নান্দনিক চেতনা গভীর একাত্মতায় পরিবেশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ রফিক মাটি ও মানুষকে বিষয় করে কবিতা রচনা করেন। তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাধান্য পেয়ে যায় গ্রাম ও কৃষক, কৃষকের বাসগৃহ; এমনকি কৃষকের দিনলিপি। প্রাকরণিক শুদ্ধতার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়াসে অত্যন্ত পরিচিত চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তিনি কৃষি ও কৃষকের প্রসঙ্গ কবিতায় আনেন, তখন কোনো অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখান না। কিন্তু উপমা-উপমানের সংমিশ্রণে যে বাস্তবতার চিত্র সামনে আনেন, তা অত্যন্ত আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। কৃষকের জীবনকে অকৃত্রিমভাবে প্রত্যক্ষ না করলে এই নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় :

হালের ফলায় লেগে ঝুরঝুরে বালি কিছু মাটি,
এখন ভাটার টান খালের ঘোলাটে ম্রিয়মাণ
জলরেখা, সারাটা আকাশে আলো গলে গলে ছায়া,
হালের বলদ একা ঘুরে ফেরে, একাকী কিষাণ
দাওয়ার ফ্যাকাশে রোদে চুপচাপ মূঢ় জবুথবু;
সারাটা দিন খাটাখাটি এন্তার কাজের চাপে ভাঙা,
মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ
(মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ৫১)

প্রতিটি চরণই স্বমহিমায় অত্যন্ত পরিচিত চিত্রায়ণের পক্ষে কথা বলে। চরণগুলো এতই প্রাঞ্জল ও অকপট যে, এগুলোর বিশ্লেষণ যেন নিষ্প্রয়োজন। 'হালের ফলায় লেগে ঝুরঝুরে বালি কিছু মাটি', 'হালের বলদ একা ঘুরে ফেরে', 'মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ' প্রভৃতি শব্দবন্ধ ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে কৃষকের অধিকার আদায়ে কোনো পঙ্‌ক্তি-ব্যয় না করলেও 'সারাটা দিন খাটাখাটি'র পর মুখাবয়বে 'মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ' দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় কবি কোন শ্রেণির কৃষককে কবিতায় তুলে এনেছেন।

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা যেন কৃষক, বিশেষত ভূমিহীন কৃষকের জীবন এবং দারিদ্র্যের চিত্র তুলে আনার জন্য রচিত। কবিতা এবং কৃষিশ্রমিকের জীবন যেন অভিন্ন হয়ে যায়। তাই তিনি অনন্য চিত্রকল্প তুনে আনেন দীর্ঘ এক কবিতায়; যেখানে কবিতার শব্দসমূহ, কৃষক, চষা ভূমির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যিক উলঙ্গ আঘাতের প্রসঙ্গ আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কবিতাটির প্রতিটি শব্দই শিল্পিত আর নির্মোহ। অত্যন্ত সচেতনভাবে কবি নান্দনিকতার নানা মানদণ্ডে কবিতাটিকে উত্তীর্ণ

করেন। কবি 'একদিকে সামাজিকতা, অন্যদিকে শিল্পসচেতনতা'র কল্যাণে কবিতাটিকে শিল্পসফল করে তুলেছেন। যেমন :

> এইবার কবিতার ছন্দ চিত্রকল্প হোগলার
> বেড়া, ছনে-ছাওয়া ঘর, দোআঁশলা মাটির কাঁচা ভিত,
> উপড়ে ফেলে কীর্তনখোলার রক্ত মেদমজ্জা হাড়;...
> ভূমিহীন মজুরের ভূমির অপূর্ব সৎকারে
> চিত্রল চাঁদের দেশি-বিদেশি চিতার চক্রান্তের
> সাম্রাজ্যিক উলঙ্গ, পেষণে এক হাজার বিঘার
> চষা ভুঁই, ভাঙনের ঢলে চিরতরে ভেসে গেলে;
> করিম আলীর থ্যাবড়া দন্তহীন মুখের চোয়াড়ে
> চৈত্রের খরায় দগ্ধ ঘোলা স্বপ্ন, চোখের কোটর,
> অনাবাদি চোয়ালের, লাঙলের নিরেট কর্ষণ,
> খুঁড়ে তোলে বলিরেখা; এইবার দেশ গড়া হবে।
>
> (মোহাম্মদ রফিক; ২০১১: ১৬১)

হয়তো সে-কারণেই 'হোগলার বেড়া' হয়ে যাচ্ছে 'কবিতার ছন্দ' ও 'চিত্রকল্প'। এখানে রূপকের মধ্য দিয়ে উপমা-উপমানের অভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য কৃষক-পরিবারের গৃহ কতটা ভঙুর, তা স্পষ্ট হয়, যখন তিনি বলেন, 'ছনে-ছাওয়া ঘর, দোআঁশলা মাটির কাঁচা ভিত।' অনিশ্চিত জীবনের কৃষককে যদি শতভাগ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয় এবং প্রকৃতির খামখেয়ালির শিকার হতে হয় হরহামেশায়, তখন তাকে আশায় উজ্জীবিত নয়, বরং হতাশায় নিমজ্জিতই হওয়ার কথা। তাই কবি ফুটিয়ে তোলেন এমন অমোঘ চিত্রকল্প, 'চৈত্রের খরায় দগ্ধ ঘোলা স্বপ্ন, চোখের কোটর।' বেদনাদায়ক হলেও জীবনের এমন নান্দনিক চিন্তা ধরতে মোহাম্মদ রফিকের জুড়ি মেলাভার। তাঁর কবিতা সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে :

> মোহাম্মদ রফিকের কবিতা বাংলাদেশের মেঘ-কাদা-জল হাওয়ার ভেতর থেকে গড়ে ওঠা চেতনাশীল নান্দনিক সৌন্দর্যের অনুভূতিমালা।...ষাটের দশকের প্রধান ধারাটি পাশ্চাত্য ধরনের, কিন্তু মোহাম্মদ রফিকই বাংলা কবিতার প্রাকরণিতা ও নান্দনিক চেতনায় দেশজ রীতি ও চিত্রকল্প প্রণয়ন করে একটি নতুন ধারার সূচনা করেন। কবিতাকে নিজস্ব শিকড়ের দিকে ধাবিত করতে গিয়ে তিনি নিজস্ব দেশ ও কাল-লগ্ন হয়েও কোনো নির্দিষ্টতায় আবদ্ধ না থেকে বিশ্বমণ্ডল ও অনন্তকালকে ছুঁয়ে, তাঁর অন্তর্লোক ও বহির্জগতের চেতনা-স্পর্শকে মানুষের জীবন-যাপনের সংগ্রামে মিলিয়ে নেন। (মাসুদুল; ২০০৮: ১৪৮-১৪৯)

স্থানীয় কাব্যিক ভাষার ভেতর দিয়ে তিনি যে-ধরনের নান্দনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন, ভাষার কারণে তার মধ্য দিয়ে তা স্থানিকতার পারম্পর্যে শেকড়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে। একইভাবে নিজের অস্তিত্বের ঘ্রাণ সঙ্গে নিয়ে প্রতীক ও রূপকের সর্বজনীন প্রয়োগে কবি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলকেও ছুঁতে চেয়েছেন; প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন একেবারে নিজস্ব কাব্যভাষা, যা দিয়ে তিনি নান্দনিকতার শেকড়কেও আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন।

নির্মলেন্দু গুণ বাংলাদেশের কবিতায় সহজ-সরল ভাষার ব্যবহার এবং অত্যন্ত অভিনব চিত্রকল্প সৃজনের জন্য খ্যাতিমান। তাঁর যেসব কবিতায় কৃষক ও শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এসেছে, তা কেবল কবিতার প্রয়োজনে নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে গৃহীত। কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনে তাদের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার মধ্য দিয়ে তিনি সহজবোধ্য নান্দনিক আবেশের সৃষ্টি করেছেন। ফলে পাঠকের বুঝতে সমস্যা হয় না যে, কাব্যসৃষ্টিতে তিনি মার্ক্সবাদী নন্দনচিন্তাকে অকৃত্রিমভাবে অবলম্বন করেন। তাঁর পাঠক ও শ্রোতাপ্রিয়তার সেটিই অন্যতম কারণ। নিম্নোক্ত কবিতাটির অবয়বের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক :

> যতক্ষণ তুমি পলিমৃত্তিকার মতো শস্যময়
> ততক্ষণ আমিও তোমার।
> এই যে কৃষক বৃষ্টিজলে ভিজে করছে রচনা
> সবুজ শস্যের এক শিল্পময় মাঠ,
> এই যে কৃষক বধূ তার নিপুণ আঙুলে
> ক্ষিপ্র দ্রুততায় ভেজা পাট থেকে পৃথক করছে আঁশ;
> (গুণ; ২০২০: ১৫৯)

অত্যন্ত সাধারণ চিত্রকল্প হলেও যখন কবি বলেন, 'কৃষক বৃষ্টিজলে ভিজে করছে রচনা', 'সবুজ শস্যের এক শিল্পময় মাঠ', 'এই যে কৃষক বধূ তার নিপুণ আঙুলে' ও 'ক্ষিপ্র দ্রুততায় ভেজা পাট থেকে পৃথক করছে আঁশ', তখন বুঝতে সমস্যা হয় না যে, সমাজের খাদ্য উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত এই পেশাজীবীর অবদানকেই তিনি অত্যন্ত গর্বভরে সামনে আনেন। অনেকেই সমাজের এসব চিত্র এত সহজে তুলে আনাকে শিল্পিত বা নান্দনিক সৌকর্যের কবিতা বলতে চান না। তবে স্মরণে রাখতে হবে: য়ুরোপীয় আধুনিকবাদী কবিতার বহু আপ্ত ধারণা বিপুলভাবে সংশোধিত হয়েছে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতায়; সৃষ্টি হয়েছে একটি জাতির প্রাণরস-সিক্ত, একটি জনগোষ্ঠীর শ্রম-ঘাম-রক্ত-নিষিক্ত আশাবাদী, প্রকৃতি ও সমাজঘনিষ্ঠ কবিতার ধারা। আধুনিক কবিতার ধারণার এই অবাক বিস্তারণে কারো চোখ কপালে উঠলেও কিছু করার নেই। আধুনিক

কবিতার ভবিষ্যৎ এভাবেই নির্ধারিত হয়ে গেছে এই সমস্যাখচিত, সামাজিক-রাজনৈতিক-দুর্দৈবপ্রপীড়িত বাংলাদেশে। (আশরাফ; ২০১০: ২৫৫-২৫৬)

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশের কবিদের কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করে শিল্পিত কবিতা রচনা করলে যেমন তা প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে গণ্য হয় না, তেমনি কেবল সভ্যতা ও নগরজীবনের জটিলতাকে বিষয় করে কবিতা রচনা করলেও তাতে সামাজিক দায় মেটে না। তাই এখানে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কবিতা-শিল্প নির্মাণ করতে হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের যে সীমাবদ্ধতা যে কৃষক-শ্রমিককে তার প্রাপ্য থেকে নিয়ত বঞ্চিত করে গড়ে তোলে সম্পদের পাহাড়, তা কেবল শিল্প বা সৌন্দর্য-সচেতন কবি অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু সমাজমনস্ক কবি তা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। নির্মলেন্দু গুণ তেমনই একজন কবি, যিনি সাধারণ পাঠকের জন্য এবং অধিকারবঞ্চিত শ্রমজীবীদের জন্য কবিতায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ফলে তাঁর কবিতায়িত শৈল্পিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সমাজের তৃণমূল-সংসক্ত মানুষের জীবন। সে-কারণেই তাঁর দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে না শ্রম-নিপীড়নের শিকার হওয়া শিশুরা। ফলে মানবতাবাদী কবি হিসেবে বঞ্চনাক্লিষ্ট শ্রেণির বাস্তবতা এভাবে গোচরীভূত হয় তাঁর কবিতায় :

সেই শিশু শ্রমিকের কথা তুমি বলো, যে তার
দেহের চেয়ে বেশি ওজনের মোট বয়ে নিয়ে যায়,
ব্রাশ করে জুতো, চালায় হাঁপর, আর বর্ণমালাগুলো
শেখার আগেই যে শেখে ফিল্মের গান,
বিড়ি টানে বেধড়ক।...
যতক্ষণ তুমি দৃঢ়পেশী শ্রমিকের মতো প্রতিবাদী
যতক্ষণ তুমি মৃত্তিকার কাছে কৃষকের মতো নতমুখ
ততক্ষণ আমিও তোমার।

(গুণ; ২০২০: ১৬০)

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় রূপক ও প্রতীকের স্থান কম। তিনি উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারে বেশি স্বচ্ছন্দ। কারণ, তিনি সরাসরি চিত্রিত করেন সমাজ ও মানুষকে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় হরহামেশা দেখা যায়, 'দেহের চেয়ে বেশি ওজনের মোট বয়ে নিয়ে যায়' শিশুশ্রমিকেরা কিংবা 'ব্রাশ করে জুতো, চালায় হাঁপর'। এই শিশুরা সুবিধাবঞ্চিত হয়ে গ্রহণ করে জীবনঘাতী মাদকদ্রব্য। এই শ্রেণির মানুষের পক্ষে সমর্থন জুগিয়ে তাদের মুক্তির জন্য তিনি বলেছেন, 'দৃঢ়পেশী শ্রমিকের মতো প্রতিবাদী' হলে কিংবা 'মৃত্তিকার কাছে কৃষকের মতো নতমুখ' হলে তিনি তার পক্ষাবলম্বন করবেন। এই চিত্রকল্প শ্রমজীবীদের জীবনবাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে

মূলত তিনি সমাজ-সম্পর্কিত শিল্প রচনা করতে চেয়েছেন, কেবল শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চাননি। কারণ, কবিতায় তিনি প্রলেতারিয়েতদের স্থান দিতে চান। এ সূত্রে কার্ল মার্ক্সকে স্মরণে আনা যায়। হেগেলের এক বক্তব্যের বিষয়ে মার্ক্স বলেছেন, ইতিহাসের ভেতরে কিছু প্রহেলিকাও থাকে। সেই প্রহেলিকার সমাধান করে সমাজকে এগিয়ে যেতে হয়। 'ইতিহাস-প্রহেলিকার' সমাধানের জন্য মার্ক্সের প্রস্তাব 'প্রলেতারিয়েত'কে গুরুত্ব দেওয়া। (আইয়ুব; ২০১৪: ১৩৭) নির্মলেন্দু গুণ এ-বিষয়ে মার্ক্সের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার পথেই এগিয়ে গেছেন। ফলে তাঁর কাব্যিক স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি 'হুংকার' শোনেন 'নিঃস্বের' এবং 'মজুরের কিষাণের হাতে' দেখতে চান 'ঝলমল করা খড়্গের'।

কমরেড লাল চেতনার রঙে
রাঙা রক্তিম বিশ্বের,
পদধ্বনি বাজে আমার রক্তে
হুংকার শুনি নিঃস্বের।
বুঝি মজুরের কিষাণের হাতে
ঝলমল করা খড়্গের,
দিন আসে ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ
কাঁপে ঈশ্বর স্বর্গের।
(গুণ; ২০২০: ১৬১)

এর মধ্যে স্বপ্নাশ্রয়ী চিত্রকল্প আছে, সংকেত আছে। উপমা-উপমান অভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো প্রতীকের আশ্রয় কবি নেননি। ফলে কবিতাটি হয়ে উঠেছে বক্তব্যপ্রধান। কারণ কবির উদ্দেশ্য কবিতায় ব্যবহৃত শিল্প-উপকরণ ব্যবহার করে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছানো। নান্দনিক সৌন্দর্য কিংবা বক্তব্য কোনোটাই কবির কাছে অন্যূন নয়। (আবিদ; ২০১৮: ২৪) একই ধরনের বাস্তবানুগ চিত্রকল্প তিনি সৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন আরও কবিতায়। যেমন নন্দনশোভা নান্দনিকতার বয়ান ছুঁয়ে যায় চিরদুখী কৃষিসমাজকে। নিচের পঙ্ক্তিমালায় পাওয়া যায় তার কিছু দৃষ্টান্ত :

ধানের হাসি মাঠের হাসি চাষীর হাসি নয়,
চাষীর বুকে চিরকালের দুঃখ নদী বয়।...
সভ্যতাকে বন্দী রেখে কতিপয়ের হাতে
চাষাভুষার কাব্য লিখে লাভ কি হবে তাতে?...
জীবন থেকে নিঃস্ব হাতে ফিরে যাবার আগে
যাদের বুকে মাঠের ছবি কাবা'র মতো জাগে
চাষাভুষার কাব্যে তুমি লিখো তাদের গান
দিয়ো তাদের রোজহাসরে বীরের সম্মান।

মাটি যেথায় লেখার খাতা, কলম যেথায় ফলা,
রক্ত যেথায় কবির কালি, সেই তো শ্রেষ্ঠ কলা।
(গুণ; ২০২০: ১৬৭)

অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষ্যে সহজবোধ্য ব্যঞ্জনায় কৃষি ও কৃষকের আজন্মলালিত বেদনাকে তুলে ধরেছেন। এখানে যে শব্দচয়ন ও অলংকারসমূহ কবিতাটিকে অনন্য করে তুলেছে, তা হলো 'ধানের হাসি মাঠের হাসি চাষীর হাসি' থাকা সত্ত্বেও সমাজবাস্তবতার কারণে 'চাষীর বুকে চিরকালের দুঃখ নদী বয়', 'কতিপয়ের হাতে' সভ্যতার বন্দী হয়ে থাকা, 'চাষাভুষার কাব্য' প্রভৃতি। চিত্রকল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'যাদের বুকে মাঠের ছবি কাবা'র মতো জাগে', 'দিয়ো তাদের রোজহাসরে বীরের সম্মান', 'মাটি যেথায় লেখার খাতা, কলম যেথায় ফলা' ইত্যাদি।

চার

মুক্তিযোদ্ধা কবি ত্রিদিব দস্তিদার দেশপ্রেমের কবিতায় সংগ্রামী চেতনার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিককে শিল্পিত বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। ষাটের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পর সত্তরেও কবিদের মাঝে জনসচেতনতা সক্রিয় ছিল। এ-সময়ের কবিতায় নন্দনচিন্তা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা পরিস্রুত হয়েছে। তবে তাতে সব সময়ই তত্ত্বাশ্রয়ী নান্দনিকতা প্রাধান্য পেয়েছে, এমন নয়। এর কারণ নির্দেশনায় উল্লেখ করা যায় :

> ব্যক্তিমাত্রেই এসময়ে ছিল ঘটমান ইতিহাসের অন্তর্ভূত ঐতিহাসিক মানব। কবিও ব্যক্তিমাত্র নন—বহু আয়তানিক জীবনদ্রষ্টা, কালের কণ্ঠস্বর। কিন্তু ব্যক্তিকবি ঘটনাকন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিজ্ঞতার রূপায়ণেই শুধু ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাতে ঐতিহাসিক দূরপ্রসারী দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, আত্মঅভিজ্ঞতা পরিণত হয় অতিভাষণে, বর্ণনা বাহুল্যে, ব্যক্তিময় অনুভবে।...তবু যুদ্ধপ্রসঙ্গ '৭০-এর কবিতার মূল সঞ্জীবনী শক্তিরূপে কবিতাকে প্রদান করেছে ঘটনাকাল-সম্পৃক্তি, কাব্যপ্রকাশকে করেছে ক্ষমতাবান, শব্দ ও স্তবকসজ্জাকে করেছে আবেগস্পন্দিত। (সূত্র: সাঈদ; ২০০৩: ১৬)

এই 'আবেগের স্পন্দিত' রূপের কারণেই ত্রিদিব দস্তিদার নিজেকে মাটির সঙ্গে লীন করে বলতে চেয়েছেন নিখাদ শ্রমজীবীর কথা। তাই তাঁর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 'আমার গায়ে আমন-গন্ধ/ পায়ে থাকগে কাদা,—আমি কোন হাঁদা যে/ তোমার কথায় আতর মেখে যাবো?' (ত্রিদিব; ২০০৫: ৬৭) শুধু কৃষকের সন্তান কিংবা কৃষকই যেন তাঁর অস্তিত্বের রূপক। তা না হলে বলতে পারতেন না, 'আমার আতর শস্য-ঘ্রাণে, শস্য-বীজে রেখো।' অর্থনৈতিক মুক্তিহারা কৃষকের প্রতি শোষণের শেষ নেই। কিন্তু তাদের প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে লোকবিশ্বাসের চিরায়ত এক রূপকে গেঁথেছেন নান্দনিক শব্দকথনে। কিন্তু তাতে রয়েছে পুঁজিপতিদের প্রতি শ্লেষাত্মক বাণ। যেমন :

উদ্বৃত্তের অন্ন যদি মাটিতে গড়ায়
তবে সকল শস্যের অমঙ্গল হবে
উৎপাদনে ব্যাহত হবে শস্যের ভুবন।
কিছু উদরে নাও, কিছু ফেলে দাও
উচ্ছিষ্ট ভেবে ভেবে পায়েতে মাড়াও
এও তোমাদের এক ধরনের ধনবান ঢেউ।
(ত্রিদিব; ২০০৫: ১৫৮)

ছাত্রজীবনে সাম্যবাদী দর্শন দ্বারা নিজের চিন্তাকে পরিস্রুত করেছিলেন সত্তরের দশকের কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। দ্রোহ ও প্রেমচেতনায় তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ছিলেন রাজপথের লড়াকু সৈনিক, কবিতার শিল্পিত পথেও সক্রিয় ছিলেন সমানতালে। তাঁর কবিতার বড় অংশজুড়ে রয়েছে কৃষক-শ্রমিকের প্রতি অকৃত্রিম দরদ। বাঙালির শেকড়ের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ ছিল তাঁর। প্রতিবাদের ভাষার যে শৈল্পিক কাব্যরূপ থাকতে পারে, তাতে প্রযুক্ত হতে পারে শিল্পসফলতার সমস্ত মানদণ্ড, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতা। তিনি যখন কৃষক-শ্রমিককে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে কবিতা রচনায় ব্রতী হন, তখন তাতে অবধারিতভাবে স্থান পায় তাদের বঞ্চনার প্রসঙ্গ। বঞ্চনাই যেন তখন অধিকার আদায়ের দাবিতে পরিণত হয়। আর সেই সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার অকৃত্রিম প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তিনি যুক্ত করে দেন অভীপ্সিত নন্দনভাবনা। ফলত তাঁর সৃজনী লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অসামান্য চিত্রকল্প বা প্রতিমা। যেমন :

পাণ্ডুর রমনী দেহে কালো কৃষকের বুকে
শস্যের সম্পাত নিয়ে একফালি মুগ্ধ চাঁদ
কাস্তের চিৎকারে দুলে তুলে দেবে নাকি কিছু ফেলে আসা শ্রম,
শ্রমের ক্ষমতা।
(রুদ্র; ২০১৪: ৬০)

তেজোদ্দীপ্ত শব্দ, অকৃত্রিম চিত্রকল্প, শ্রমিকের প্রতি আপসহীন নিবেদন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। যে ধারায় তিনি কাব্যসাধনা করেছেন, পূর্বসূরি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার সঙ্গে তার সাযুজ্য রয়েছে। তবে, প্রতিপাদ্যের নিরিখে রুদ্র মূলত উত্তরাধিকার বহন করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবির। শাসককুল বা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ভয়ডরহীনভাবে সত্য উচ্চারণও শিল্পমণ্ডিত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত রুদ্রর কবিতা। সময় ও প্রাসঙ্গিকতার পরিবর্তনের কারণে অন্যদের চেয়ে তাঁর কাব্যকৌশল ও

প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। বিষয় ও প্রকাশে জীবনসংগ্রামী মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাঁর কবিতা জনসম্পৃক্ত এবং গণচেতনার পরিচয়বহ। যেমন:

মৌশুম যায় অনাবাদী জমি প'ড়ে থাকে চাষহীন,
লাঙল আসে না, আসে নর্তকী খেমটা নাচনে ধেয়ে।
ধেনোমদ চায় বিদেশি বনিক, ধান চায় স্বদেশিরা...
গেরামের পর গেরাম উঠছে জেগে
শস্যের মাঠে লাঙলের কোলাহল

(রুদ্র; ২০১৪: ৬৪-৬৫)

একই কবিতায় একদিকে 'মৌশুম যায় অনাবাদী জমি প'ড়ে থাকে চাষহীন' বলে যে শ্রেণির অর্থনৈতিক হাহাকারের কথা বলেছেন, সে 'শ্রেণির লাঙল আসে না' জমিতে। কিন্তু পুঁজিপতিদের কাছে 'নর্তকী খেমটা নাচনে ধেয়ে' আসে ঠিকই। বিদেশি বণিকেরা চায় 'ধেনোমদ' উৎপন্ন ফসলের ফেনায়িত রক্তাক্ত সুরা।। এর বিপরীতে কবি রিক্ত কৃষকের জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখেন 'গেরামের পর গেরাম উঠছে জেগে'—এই জনজাগৃতির চিত্রভাষ্যে। কারণ, 'শস্যের মাঠে লাঙলের কোলাহল।' অন্য কবিতাতেও আমরা একই ধরনের প্রবণতা প্রত্যক্ষ করি। কিছুটা উপমা আর বাকি সব ক্ষেত্রে চমৎকার চিত্রকল্পের সমাহার ঘটিয়ে কবি লিখেছেন :

গতবার আষাঢ়ও পার হয়ে গেল তা-ও নামে না বাদল,
এবার জ্যোষ্টিতে মাঠে নেমে গেছে কিষানের লাঙল জোয়াল।
আমাদের মাঝে দ্যাখো জমির ভাগের মতো কতো-শতো আল্
এই দূর পরবাস কবে যাবে? জমিনের আসল আদোল
কবে পাবো? কবে পাবো আল্হীন একখন্ড মানব-জমিন?

(রুদ্র; ২০১৪: ১০৭)

কবিতাটিতে পুরোপুরি মার্ক্সবাদী নন্দনচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। সামাজিক চেতনাবোধ থেকে চিত্রকল্পের নির্মাণ তিনি করেছেন, তাতেই প্রমাণিত হয়, কেবল কাব্যসৌন্দর্য নয়, জনযুক্তিও তার প্রার্থিত। কারণ 'জমিনের আসল আদোল' যদি না থাকে, তবে অমীমাংসিত রয়ে যাবে অনেক কিছু। নিচের কবিতাটিতেও কবি অকৃত্রিমভাবে ছিন্নমূল কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গ এনে বলেন—

আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত, হাড্ডিসার।
আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন।
আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুন।
আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর
দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে।

(রুদ্র; ২০১৪: ১৩৬)

সভ্যতার কারিগরদের এই বঞ্চনা কবির কাছে অসহনীয়। সুভাষ-সুকান্তের চেতনাপথ কবিকে সম্ভবত আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর স্বর ও সুরের স্বাতন্ত্র্য কবিতায় প্রযুক্ত শব্দ ও চিত্রকল্পসমূহে পরিস্ফুট। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার শিল্প-প্রকরণে সময়ের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় প্রযুক্ত হয় অভিজ্ঞতার চিত্রকল্প। বাংলাদেশের কবিতার ধারায় তাঁর কবিতা অনুসরণ করেছে সমাজ-রাজনীতি-সচেতন জীবনমুখী স্বতঃসিদ্ধ পথ। তাঁর নন্দনচিন্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি প্রণিধানযোগ্য:

> রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার নন্দনবীক্ষা নিয়ে তাঁর সময়কে যে ভাবে দেখেছেন, ঠিক সে ভাবেই নিরাভরণ শব্দমণ্ডলে আবেগের সঞ্জীবনী তন্ময়তার মাধ্যমে সরাসরি বোধকে পৌঁছে দেন পাঠকমেধায়।...একই কালে দূর-ঐতিহ্যের প্রতি দুর্বলতা এবং শব্দ-শিল্পের প্রতি তৃষ্ণা—যা তাঁকে খুব সহজেই বিশিষ্ট করে তোলে। অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ভৌগোলিক-ইতিহাস জ্ঞান শেষ পর্যন্ত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে দিয়েছে পরিণতি, স্থিতধী শক্তি আর শিল্পের স্থায়িত্ব। (মাসুদুল; ২০০৮: ২৪৫)

বলা যায়, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর স্বকীয়তার নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক চেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি ও সংগ্রাম-নিবিড় সক্রিয়তা। সত্তরের উত্তাল সময় ধারণ করেই এ-দেশের মানুষের প্রত্নপেশাকে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত মাটির কাছাকাছি বসবাসরত স্বজনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি।

একই ধারার কবি হিসেবে গণ্য করা যায় কবি সমুদ্র গুপ্তকে। সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিককে সরসারি 'যুদ্ধরত' আখ্যা দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন তিনি। কবিতা সৃজনে তাঁকে অত্যন্ত সহজবোধ্য শব্দ ও চেনা অলংকার প্রয়োগে বেশি স্বচ্ছন্দ বলে মনে হয়। তাঁর চিত্রকল্পসমূহ কৃষক-শ্রমিকের জেগে ওঠার, সংগ্রামী চেতনার। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বান্তকরণে সরাসরি লড়াই চেয়েছেন, তাঁর চিত্রকল্পগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে। কাজী নজরুল ইসলাম যেমন 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় বলেছেন, 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর/ প্রলয় নূতন সৃজন বেদন', তেমনি সমুদ্র গুপ্ত চেয়েছেন 'সামাজিক ঝড়', যাতে তছনছ হয়ে যায় শোষকের সমস্ত অবকাঠামো। দৃষ্টান্ত :

> প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীতে সামাজিক ঘূর্ণিঝড় চাই
> চাই সেই বেগবান বায়ু
> যে বাতাসে পত্রবৎ উড়ে যাবে ঘৃণ্য মানুষ তার শিকড় সমেত...
> প্রতিষ্ঠিত ভুল সত্যের ভিত্তিমূলে খাপ খোলা তলোয়ারের মতো ঢুকে যাবে
> যুদ্ধরত কর্মজীবী মানুষের হাত
>
> (সমুদ্র; ২০০৯: ২৭)

সংগ্রামী চেতনার মধ্যে তাঁর চিত্রকল্প কথা বলে সরাসরি। রাজনৈতিক চেতনায় ভর করে তিনি বিন্যস্ত করেন তাঁর নন্দনপৃথিবী। কোনো রাখঢাক নয়, বরং শক্তিপ্রয়োগ করে যে-কোনো মূল্যে তিনি ফিরে পেতে চান শ্রমিকের অধিকার। উপমা-উপমান তিনি ব্যবহার করেন কোনো অস্পষ্টতা ছাড়া। তাঁর কবিতার সৌন্দর্য সৃজনের মধ্যে নেই কোনো অস্পষ্টতা। ফলে স্পষ্টতা ও সহজতার দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর কবিতা এক অভিনব রাজনৈতিক-সুন্দরকে বাঙ্ময় করে তোলে :

শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেয়া রাইফেলে বুলেটে যেনো
বিজয়ের মহাসঙ্গীত
শ্রমিকের রক্তে যেনো চিরকালের বাঁধভাঙা তুমুল তুফান
আমার তোমার এবং
তোমার আমার মতো কৃষকের শ্রমিকের বাপভাইবোন
মা এবং কমরেড শহীদের লাশ যেন লাশ নয়
আমাদের ন্যায়যুদ্ধে বিজয়ের ভীষণ বিশ্বাস।

(সমুদ্র; ২০০৯: ৩৭)

তাঁর সমস্ত বিশ্বাস 'ন্যায়যুদ্ধে'। এই যুদ্ধের অপর নাম নিরন্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামী চেতনা শ্রমিকের অর্থনৈতিক মুক্তির, যা মার্ক্সবাদী চেতনা থেকে উৎসারিত। ফলে সভ্যতা বিনির্মাণের কারিগরদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি বলেন, 'তোমার আমার মতো কৃষকের শ্রমিকের বাপভাইবোন', 'শহীদের লাশ', লাশ নয়, ভবিষ্যতের সংগ্রামের তুমুল বিশ্বাস হিসেবে অনুপ্রাণিত করবে। কৃষক-শ্রমিকের জীবন পরিবর্তনের জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। সুতরাং এই সংগ্রামমুখরতাই সমুদ্র গুপ্তর কবিতার নান্দনিকতাকে আলাদা মাত্রা দান করেছে।

আবু হাসান শাহরিয়ার রোমান্টিক কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর কবিতার নান্দনিক সূত্র প্রোথিত থাকে গ্রামীণ জনপদে। ফলে তাঁর কবিতা থেকে উৎপন্ন চিত্রকল্পে আমরা দেখি কৃষকের শাশ্বত রূপ। কৃষক এবং শ্রমিকের বেদনা নয়, আত্মীয় হিসেবে তাদের নিয়ে গর্ব করতে দেখা যায় তাঁকে। গ্রাম এবং শেকড়, কৃষক এবং শ্রমিকের জীবনযাপন, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নির্মিত চিত্রকল্প অল্পকথায় অনন্য হয়ে উঠেছে নিচের পঙ্‌ক্তিগুলোতে :

আমি লুঙ্গি-বাউলের নাতি, শাড়ি-কিষানির ব্যাটা
আমার বাপের নাম কে না জানে—চাষা-মালকোঁচা
আমি গামছা-কুমোরের প্রতিবেশী, আরও জ্ঞাতি খড়ম-তাঁতিরা
আমি লুঙ্গি-বাউলের নাতি, শাড়ি-কিষানির ব্যাটা।

(শাহরিয়ার; ২০১৭: ৪১)

'লুঙ্গি-বাউল', 'শাড়ি-কিষানি', 'চাষা-মালকোঁচা', 'গামছা-কুমোর', 'খড়ম-তাঁতি' শব্দবন্ধগুলোতে কেবল নান্দনিক চিত্রকল্প নয়, উপমান-উপমেয় একাকার হয়েছে শিল্পিত কৌশলে। মার্ক্সবাদী নন্দনচিন্তায় নিজেকে যুক্ত না করেও তিনি শ্রমিকের জীবনকে কবিতায় এনেছেন। কবিতার নান্দনিকতা যে কেবল একমুখী নয়, তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপর্যুক্ত পঙ্ক্তিসমূহ।

পাঁচ

আশির দশকের বাংলাদেশের কবিতায় বিষয় ও আঙ্গিকগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষণীয়। অধিকাংশ কবি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে জীবন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা উপেক্ষা করে কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবু কয়েকজনের কবিতায় কৃষক-শ্রমিক আসে কেবল কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই; সেসব কবিতায় তাদের জীবন কিংবা সংগ্রাম কোনোটিই প্রাধান্য পায় না। আগের দুই দশকের চেয়ে স্বতন্ত্র কবিতা রচনায় তাদের শৈল্পিক প্রচেষ্টাও দৃশ্যমান হয় বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণের ক্ষেত্রে। কবিতায় ভিন্নতা আনয়নে তাঁরা সমাজমনস্কতা থেকে বিচ্যুত হন। অথচ জাজ্বল্যমান সমাজবাস্তবতা বিরাজমান থাকলেও তাঁরা ষাট বা সত্তরের দশকের পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করেননি। আদতে, কবিতার প্রবণতা সময়নিরপেক্ষভাবে কখনো স্থির থাকে না। তাই সময় ও সমাজের প্রভাব কবিতায় না পড়াটাও এ-ক্ষেত্রে একধরনের প্রভাব হিসেবে গণ্য হতে পারে। কারণ, বিষয় ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্রসূচক দৃষ্টান্ত স্থাপনই কেবল তাঁদের অনেকের লক্ষ্য ছিল। এই সূত্রেই আশির দশককে পর্যবেক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, সময়ের প্রভাব ও শিল্প-সচেতনভাবে কবিতা-সৃজনে মনোনিবেশ করলে কেবল, 'নান্দনিক প্রক্রিয়ার বিবর্তনে দেখা যায়, কিছু কিছু উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে কিংবা হারিয়ে যাচ্ছে আর সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু নতুন লক্ষণ অথবা একদিন যা ছিলো প্রায় নিরুচ্চার সেইটে সোচ্চার নয় শুধু, প্রাধান্যও পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এও বড়ো কথা নয় তত, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ঐ প্রক্রিয়াতে বিচিত্র উপকরণ ও অনুপুঙ্খগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপুল ওলট-পালট হয়ে যাওয়া। আসলে যা ঘটছে তা হলো প্রাধান্যসূচক বৈশিষ্ট্যের পালাবদল।' (তপোধীর; ১৯৯৫: ১৩১) এই 'পালাবদল' বা 'ওলট-পালট' অবস্থা আশির দশকের কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই এই সময়ের কবিতা-প্রবণতা সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যায়, 'এই দশকের কবিতার নান্দনিক বোধে আবির্ভূত হয় অন্তর্লীন হার্দ্য চেতনাধারা, ঐতিহ্যের শেকড় খোঁজা, প্রাজ্ঞ দার্শনিকতা আর দৃশ্যের সম্মোহন তৈরির বাক্যবন্ধন। জীবনের জটিলতা অবিরাম পাল্টে দিচ্ছে কবিতার আঙ্গিক, প্রকরণ, ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, শব্দচয়নজাত ব্যঞ্জনাময় উপলব্ধি।'

(মাসুদুল; ২০০৮: ২৫৯) রাজনৈতিকভাবে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন এই দশকের কবিগণ, তা তেমন কারও কবিতার নান্দনিকতাকে প্রভাবিত করেনি। এর মধ্যে ব্যতিক্রম খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা। যেমন:

এই হাতে হাতুড়িও কোনদিন মানাবে না জানতাম;
চতুষ্কোণ আঙুলের শ্রমিকেরা ঠুকঠাক দেয়াল ভাঙছে
সান্ত্বনা-প্রলেপ ঢেকে রাখে ইটের সমূহ ক্ষত;
আমি তো এখন হাতুড়িকে বন্ধু বলে হেঁটে যাই—
পর্বত-ডিঙানো উরু আমাকে দিলে না,...
আমি নিজেকে বিস্তৃত করতে এক সময় ছিন্ন হয়ে যাই
ইস্পাতের দিলে না কঠিন বুক, তবুও তো হাপরের
দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে বাঁচাতে পারতাম এক
নির্জন আগুন।

(আশরাফ; ২০১১: ১২৭)

এই কবিতায় 'হাতুড়ি', 'চতুষ্কোণ আঙুল', 'শ্রমিকের ঠুকঠাক', 'হাপরের দীর্ঘশ্বাস' বক্তব্যের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতায় নির্মিত প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্প পেরিয়ে এখানে রূপক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে আদিম যুগের প্রতিও। একজন চিত্রকরের কাজ যেমন রঙ ও রেখা নিয়ে, তেমনি কবির কাজ শব্দ ও ধ্বনি নিয়ে। এ-শিল্পের ঔজ্জ্বল্য তিনি বৃদ্ধি করেন শব্দের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে। পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত শব্দসম্ভারই প্রকাশভঙ্গির কৌশলে স্বকীয় নান্দনিকতার ভাবনা তৈরি করে পাঠকের মনে। (আবিদ; ২০১৮: ৮৪) এমন কাব্যপ্রয়াসেই খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রতিনিয়ত নিজেকে সক্রিয় রেখেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা-কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন সৌন্দর্যনির্ভর কাব্যচর্চা করলেও সমাজমনস্কতা থেকে তাঁর নান্দনিক মনকে দূরে রাখতে পারেননি। ফলে 'তিনি কবিতায় খুঁজে ফেরেন পরম্পরার অন্বেষণ। এই অন্বেষণেই তিনি বুঝেছেন, কবিচরিত্র স্বয়ম্ভু কোনো ব্যাপার নয়, তার জগৎ, ইতিহাস, সময় পরম্পরা, সম্পর্কে নিজ চেতনাকীর্তি, উত্তরাধিকার সম্পর্কে মূল্যায়ন, আবার তার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে নিদ্ধান্ত না থাকলে কবি দাঁড়াতে পারেন না নিজ অক্ষে, নিজ মেরুদণ্ডে।' (মাসুদুল; ২০০৮: ২৬১) তাই শেকড়ের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। নিজস্ব শব্দচয়নে কবিতার আলংকারিক সমৃদ্ধিতে তিনি হতে চেয়েছেন সমাজমনস্ক। শ্রমজীবীর প্রসঙ্গ তিনি আনেন শৈল্পিক চিত্ররূপময়তায়। যেমন :

জীবনের বাহুমূলে হাত দাঁড়িয়েছে সোমত্ত মানুষ
চিরকাল, প্লাবন ঝড়ের মুখে বৈঠার আঘাতে
উঠেছে ঘোড়ার মতো উজ্জ্বল আর্শির মতো ফেনা
কারখানার চুল্লিগুলো বানিয়েছে টেরাকোটা মাটির মানুষ।

(আশরাফ; ২০১১: ৬৪-৬৫)

এই 'টেরাকোটা মাটির মানুষ'ই সভ্যতার মণিবন্ধ রচনায় নিবিষ্ট থাকে। 'উজ্জ্বল আর্শির মতো ফেনা' এবং'কারখানার চুল্লিগুলো' জ্বলে বলেই জীবন থাকে চলিষ্ণু। এ-কবিতারই অন্যত্র তিনি ব্যবহার করেছেন চমৎকার উপমা, '...ঐ যে মহান পিতা একদিন/ চরের জমির মতো চিতিয়ে ছিলেন পড়ে কারো পদঘাতে/ তাঁকে ঢেকে দাঁড়িয়েছে অশ্বমুখী কুম্ভীরের দল।' তাঁর কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 'বহির্বাস্তবকে তাঁর সময়ের বৃত্তকে, কবিতার পরম্পরার সঙ্গে, কবিতার বাস্তবের অন্বেষণে যুক্ত করেন।' (মাসুদুল; ২০০৮: ২৬১) নিজস্ব শব্দই একজন কবিকে স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করে দেয়। কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সেই সক্ষমতা স্বকীয়তায় দীপ্তিমান।

মাসুদ খানের কবিতা আশির দশকের কবিতার মধ্যে শব্দযোজনা ও ভাবনার বৈচিত্র্যের কারণে আলাদা স্থান করে নিয়েছে। কৃষক-শ্রমিককে বিষয় করে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ না করলেও তাঁর কিছু কবিতায় কৃষক-শ্রমিক ঠাঁই পায় কবিতার নান্দনিকতাকে সমৃদ্ধ করতে। সভ্যতা বিনির্মাণে শ্রমিকদের অবদান তিনি স্বীকার করেন বটে, তবে তাতে তাঁর দায়িত্ব নির্ধারিত হয় না। কারণ তিনি কেবল শিল্পই নির্মাণ করতে চান। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিচের অভিমতটি গ্রহণীয় হতে পারে:

> কবিতা এমন এক শিল্পভুবন নির্মাণের প্রক্রিয়া যা জীবনঘনিষ্ঠ হয়েও কিছুটা অতিজৈবনিক। এক-অর্থে অতিজৈবনিকতা অর্জনকেই বলা যায় কবিতার কবিতা হয়ে-উঠার প্রাথমিক লক্ষণ।...কবি যেহেতু স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, প্রকৃতি ও জীবন দেখার অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রথমত দ্রবীভূত করেন তার মানসলোকের বয়লারে এবং হৃদয় নামের বকযন্ত্রে পরিশোধিত করে পরিণামে জন্ম দেন জীবনের কেলাসিত রূপটিকে—যে-কেলাস থেকে ঠিকরে বেরোয় এক অতিজৈবনিক আলোর স্ফটিকী বিচ্ছুরণ—'শিল্প' যার ডাকনাম। (আবিদ; ২০১৮: ৮৬)

শৈল্পিক কবিতা নির্মাণেই মাসুদ খানের আগ্রহ, সমাজমনস্কতা নয়। তবে কবিতার সৌন্দর্য নির্মাণে যে চিত্রকল্পগুলো নির্মাণ করেন তিনি, তাতে কখনো কখনো উঁকি দেয় তাঁর বাস্তব জীবনকেন্দ্রিকতা। কারণ, কবিতার সক্রিয়তা চিরকালই তাৎক্ষণিক বিবেচনাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

থাকে। তাঁদের অগ্রযাত্রা সুনির্দিষ্ট নান্দনিক চিন্তাদ্বারা প্রভাবিত থাকলেও স্বীয় চেষ্টাতে তাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে, 'অনুধ্যানী কবি তাঁর জ্ঞান, ধী ও স্মৃতির দৃশ্যকল্পে রচনা করেন ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংবেদন, চিন্তারূপ ও ভাবসত্য।' (সূত্র: সাঈদ; ২০০৩: ২৮) মাসুদ খানের কবিতায় তেমন নান্দনিক ইঙ্গিতই যেন পাওয়া যায়। যেমন:

> হরপ্পার কোষে কোষে হাতুড়িগর্জন, হ্রেষা, সিংহের বৃংহণ
> শাবল মোহর শিশু সিন্ধু সুরকি পাখি লেদ লায়ারের মিশ্রিত কূজন
> আরো বহু শব্দ ছিল
> যাবতীয় শব্দ ক্রমে কাষ্ঠীভূত হয়ে
> তবে ওই সারি-সারি সাজানো বৃক্ষ। (মাসুদ; ২০১৮: ৩২)

অত্যন্ত গীতল কাব্যভাষা, শব্দ ব্যবহারে সচেতন, রূপকল্প নির্মাণে দক্ষ, ইতিহাস সচেতনতায় নির্নিমেষ স্পষ্টতা মাসুদ খানকে আলাদা পরিচিতি দান করেছে। এমনিতেই এ-সময়ের অনেকের কবিতায় দার্শনিকতা ও চিরকালীনতা প্রত্যয়ী ও ঐতিহ্যপটে স্থাপিত। ইতিহাস ও সমাজমনস্কতা দ্বারা এসব কবিতা তাড়িত হয় না। তাঁর 'ছন্দ-দক্ষতা, আলংকারিক প্রবণতা, মিথ ব্যবহারের ঝোঁককে আমরা তাঁর শিল্পচিন্তার টেকনিক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।' (মাসুদুল; ২০০৮: ২৬৪) তাই তাঁর কবিতায় নান্দনিক শিল্পসৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান থাকে। যেমন:

> রে চারণ, তোমার চেরাগজন্ম বৃথা যায় যায়
> চিমনি চির খায় আজ এ উন্মার্গ জলের ছিটায়
> চিমনি চিরে যায় আজ দিকচক্রবাল থেকে
> তেড়ে আসা অভিশাপে, ভর্ৎসনায়।
>
> (মাসুদ; ২০১৮: ৪৮)

অসাধারণ চিত্রকল্প দিয়ে শ্রমজীবনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি, শ্রমিকদের বিষয় হিসেবে না এনেও। তাঁর কবিতায় জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যাসহ বিজ্ঞানমনস্ক নানা শব্দসংকেতের সাবলীল প্রয়োগ লক্ষণীয়। শব্দ বিন্যাসে গীতল ধারায় তিনি বেশ স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ। মনে হয়। শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে যেন নান্দনিকতার নতুন ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন তিনি। আদতে 'মাসুদ খান তাঁর বিজ্ঞানচেতনা ও ঐতিহ্যপ্রেরণার কারণে জড় ও জীবনের অভিন্ন উৎসকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়, যা তাঁকে নিয়ে গেছে জাগতিক ও মহাজাগতিক স্পন্দনের সূত্রসন্ধানে। এই অভেদ বোধ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কবিতার প্রাণ।' (মাসুদুল; ২০০৮: ২৬৩)

আশির দশকের কবিগণ সমাজ ও জীবনের সরাসরি সংশ্লেষ নয়, বরং শিল্পের সঙ্গে জীবনের দূরবর্তী নান্দনিকতা সৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন। ফলে দু-একটি কল্পপ্রতিমা নির্মাণের জন্য কৃষক-

শ্রমিকের উপমা কিংবা কৃষক-শ্রমিককের রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবি কাজল শাহনেওয়াজ এ-সময়ের অন্যতম কবি। তাঁর কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের বিরল ইঙ্গিত পাওয়া যায় পরাবাস্তববাদী চিত্রকল্প নির্মাণের সুবাদে। যেমন :

নদী ও রেললাইনের মাঝামাঝি মহকুমা জেলায়
একসার ওয়ার্কশপের কাছে
খালি পিপার পাহাড়।...
মালা বদল লেনায় দেনায়
দেশী কারখানায় গুরুর সাথে হাত ধরাধরি
এক পা ছায়ায় ধরে চৌকো বুনো পাতা
এক পা অগ্রগতির রুরাল জনসভায়
তানানা নানানা তান নানা নানা
মাছের বুকের লেদের বিছানা

(কাজল; ২০১৮: ২৫-২৬)

'ওয়ার্কশপ', 'দেশী কারখানা', 'লেদের বিছানা' প্রভৃতি শ্রমজীবনের ইঙ্গিতবহ হলেও প্রাসঙ্গিক শ্রমজীবীরা তাঁর কবিতা রচনার লক্ষ্যভুক্ত ছিল না। তবে একধরনের গভীর জীবনবোধ থেকে তিনি কবিতা রচনায় ব্রতী হন। আর সেই সাধনায় মানবিক আবেদন তৈরি করে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শৈল্পিক বিবেচনায় নিয়ে তিনি পৌঁছে দেন অনন্য এক নান্দনিক মাত্রায়। অন্যদিকে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের ধরনও প্রায় অভিন্ন। তবে তিনি তাঁর নিখুঁত ছন্দচাতুর্যে মোহগ্রস্ত করে রাখতে পারেন পাঠককে। যেমন :

ছায়া-শরীরের নিখাদ ফলদ
জমিন চ'ষছে সুনীল বলদ;
দিনভর সেচ, রাতভর হাল।
আমি সেচ চাই, আমি চাষ চাই,
মৌরুসি নয়, আমি খাস চাই,
নয়ানশ্রী গাঁ'র মেঠো ঘাস চাই,
তোমাতে আমার অধিবাস চাই।

(সুব্রত; ২০০৬: ২২২-২২৩)

তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলা যায়, 'ভাষা চলমান জীবনের সূক্ষ্মতম ও নিবিড়তম দর্পণ। আর এই ভাষার দর্পণেই ইঙ্গিতময়তা দিয়ে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ নান্দনিক বীক্ষায় জীবনের ধারাবাহিক সংকেত, রুদ্ধতার সন্তাপ ও যৌনতার ছায়াসংলগ্ন অনুষঙ্গকে পরিস্ফুট করতে চান।' (মাসুদুল; ২০০৮: ২৯২) যেমন উপর্যুক্ত কবিতায় চাষাবাদ-সংশ্লিষ্ট শব্দপারম্পর্যে নিশ্চিত হওয়া যায় না,

তিনি আসলে শ্রমজীবনের কথা বলেছেন কি না। আদতে কেবল কাব্যসৌন্দর্যের জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন 'জমিন চষছে', 'সুনীল বলদ', 'দিনভর সেচ', 'রাতভর হাল', 'আমি চাষ চাই' প্রভৃতি শব্দবন্ধ। এসব শব্দবন্ধ প্রত্যক্ষ করলে হঠাৎ মনে হতে পারে শ্রমজীবীর প্রতি অন্য রকম ভালোবাসা থেকেই সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ তেমন অলংকারবহুল রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। এতে অবশ্য আলাদা নান্দনিকতা এসেছে। কিন্তু তাঁর কবিতা সমাজমনস্ক নান্দনিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

আশির দশকের অন্যান্য কবির মধ্যেও নিয়ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষণীয়। কালের ক্লান্তি, সংশয়, শৃঙ্খলাহীনতা, নৈরাশ্য প্রভৃতি প্রপঞ্চের মধ্য দিয়ে কবিতার শারীরিক ও আলংকারিক নতুনত্ব আনয়নের প্রয়াসে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছিলেন তাঁরা। ফলে সমাজ তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত থেকেছে বেশির ভাগ কবির অধিকাংশ কবির কবিতায়। যেমন গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেও শোয়েব শাদাব, শান্তনু চৌধুরী, সাজ্জাদ শরিফ, ফরিদ কবির প্রমুখের কবিতার নন্দনচিন্তায় বাংলাদেশের শ্রমজীবন গুরুত্ব পায়নি। তাদের কাব্যচর্চার লক্ষ্যবিন্দুতে শ্রমজীবনকে তাঁরা স্থাপন করেননি। ফলে শিল্পিত কবিতায় নিজেদের শানিত করলেও সমাজমনস্ক কবিতার ধারার প্রতি তাঁরা আকর্ষণ অনুভব করেননি। এই স্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করেও আমাদের বিবেচনা রাখতেই হয় যে, কবিতার শৈলী ও সামগ্রিক শৈল্পিকতা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করা দুরূহ। কারণ, 'কবিতার প্রতিটি পাঠ প্রকৃতপক্ষে নতুন, প্রতিটি পাঠই আলাদা বিশ্লেষণের উৎস হিসেবে বিশিষ্ট উচ্চারণ রূপে গণ্য। এমনকি একই পাঠকের একাধিক পাঠ পুরোপুরি এক নাও হতে পারে, এর মানে একই কবিতা থেকে তিনি তৈরি করে নিতে পারেন একাধিক পাঠকৃতি। সুতরাং কবির রচনার নিহিতার্থ কোনো পাঠক সম্পূর্ণভাবে জেনে নিয়েছেন, এমন দাবি পেশ করা কঠিন।' (তপোধীর; ১৯৯৫ : ২৩০)

তবু সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, বাংলাদেশের কবিদের সৃজনপ্রয়াসে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ যেমন একচ্ছত্রভাবে গুরুত্ব পায়নি, তেমনি উপেক্ষিতও হয়নি। তবে বাংলাদেশের কবিতার মূলধারা যে ধরনের সংকটকে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে স্বকীয় শিল্পসৌকর্যকে অবলম্বন করে যাত্রা শুরু করেছিল, তাতে কৃষক ও শ্রমজীবনের শিল্পিত অবয়ব-সংবলিত কবিতার সৃজনপ্রয়াসই কবিগণের নন্দনভাবনার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হতে পারত। কিন্তু কবিতায় বিষয়বস্তু হিসেবে এ দেশের মানুষের খাদ্যের জোগানদাতা কৃষকদের জীবনপ্রসঙ্গ যেমন প্রাধান্য পায়নি, তেমনি নগরসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে অকৃত্রিম সারথি হিসেবে শ্রমিকজীবনও কবিদের কাছে অগ্রাধিকারভুক্ত হয়নি। তবু

আমাদের বিবেচনায় যেসব মুষ্টিমেয় কবি তাঁদের শিল্পিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সবচেয়ে বঞ্চিত পেশাজীবীর অধিকার আদায় এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রয়াসে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের কবিতাই মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

সহায়কপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (২০১৬)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। ভাষাচিত্র, ঢাকা

আল মাহমুদ (২০১৩)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

কাজল শাহনেওয়াজ (২০১৮)। *কবিতাসমগ্র*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১১)। *কবিতা সংগ্রহ*। শিখা প্রকাশনী, ঢাকা

ত্রিদিব দস্তিদার (২০০৫)। *কবিতাসমগ্র*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

দিলওয়ার (২০১১)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা

নির্মলেন্দু গুণ (২০২০)। *নির্বাচিতা*। কাকলী প্রকাশন, ঢাকা

মহাদেব সাহা (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মাসুদ খান (২০১৮)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা

মাহবুব উল আলম চৌধুরী (২০১৯)। *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি*। কুঁড়েঘর, ঢাকা

মোহাম্মদ রফিক (২০১১)। *কবিতাসমগ্র*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

রফিক আজাদ (২০০৭)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (২০১৪)। *কবিতাসমগ্র*। অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৬)। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

সমুদ্র গুপ্ত (২০০৯)। *কবিতাসমগ্র*। মুক্তচিন্তা প্রকাশন, ঢাকা

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (২০০৬)। *নাগপঞ্চমী*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৯৯)। *কবিতা সংগ্রহ*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৫৩)। *একুশে ফেব্রুয়ারী* (বিশেষ মুদ্রণ ২০১৬)। সময় প্রকাশন, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০১)। *কাব্যসমগ্র*। সময় প্রকাশন, ঢাকা

সহায়ক গ্রন্থ

অরুণ মিত্র (১৯৯৯)। *কবিতা, আমি ও আমরা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আজীজুল হক (১৯৮৫)। *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবিদ আনোয়ার (২০১৮)। *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১০)। *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৫)। *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

—(২০০৬)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর

—(২০০৯)। *কবিতার বহুস্বর*। প্রতিভাস, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০১২)। *কবিতার ঘর কবির বারান্দা*। সাহিত্যশ্রী, কলকাতা

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (২০০৯)। *কবিতায় বাক্‌প্রতিমা*। সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা

বিমলকুমার মিশ্র (২০১৫)। *সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৪৬)। *কালের পুতুল*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাসুদুল হক (২০০৮)। *বাংলাদেশের কবিতা নন্দনতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৮)। *ভাষা ও ছন্দ*। বিশ্বভারতী, কলকাতা, ভারত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড*। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

রহমান হাবিব (২০১২)। *বাংলাদেশের কবিতা: নন্দনতত্ত্ব ও জীবনার্থ সন্ধান*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা

শঙ্খ ঘোষ (২০২১)। *নির্মাণ আর সৃষ্টি*। প্যাপিরাস, কলকাতা, ভারত

শফিকুল ইসলাম (২০২২)। *নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস* (*দি হিস্ট্রি অব এস্থেটিক্স* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূল: ক্যাথারিন এভারেট গিলবার্ট ও হেলমুট কুন)। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সালাহউদ্দীন আইয়ুব (২০১৪)। *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০০৬)। *নন্দনতত্ত্ব*। সন্দেশ, ঢাকা

হাসনাত আবদুল হাই (২০২১)। *সবার জন্য নন্দনতত্ত্ব*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *শামসুর রাহমান/ নিঃসঙ্গ শেরপা*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

Khondakar Ashraf Hossain (2010). MODERNISM AND BEYOND: Western Influences on Bangladeshi Poetry. Dhaka Viswavidyalay Prakashana Sanstha, Dhaka.

সংকলন ও সম্পাদিত গ্রন্থ

অবন্তীকুমার সান্যাল (২০০২)। 'ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের কথা'। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (সম্পা. তরুণ মুখোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ধনঞ্জয় দাশ (২০১৩)। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে'। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* (সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ)। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

প্রণবকুমার নায়ক (২০০২)। 'হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন'। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (সম্পা. তরুণ মুখোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রদ্যোৎ গুহ (২০১৩)। 'সাহিত্য-বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি'। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* (সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ)। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা'। *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* [সম্পা. সাঈদ-উর রহমান], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সাঈদ-উর রহমান (২০১৩)। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*। জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা

হীরেন চট্টোপাধ্যায় (২০০২)। 'প্লেটো ও অ্যারিস্টটল'। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (সম্পা. তরুণ মুখোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

Christopher Caudwell (1937). *Illusion and Reality*. Macmillan, United Kingdom. (https://www.marxists.org/archive/caudwell/1937/illusion-reality/ch07.htm)

Encyclopedia Britannica (06 November 2020). 'aesthetics'. Encyclopedia Britannica, Inc.

M. Harunur Rashid (1996). *Contemporary Bengali Writing: Bangladesh Period*. Contemporary Poetry of Bangladesh (etd. Khan Sarwar Murshid). University Press Limited, Dhaka

প্রবন্ধপঞ্জি

আহমদ রফিক (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। *শিল্পসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা*। কালি ও কলম, ঢাকা

তারানা নূপুর (জুন ২০১৯)। *কবিতার নান্দনিক রূপান্তর*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা

পত্রিকাপঞ্জি

প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭। 'কবিতার উপাদান নিতে আমি কখনো ইউরোপের কাছে যাইনি : সৈয়দ শামসুল হক'

জিজ্ঞাসা (২০০৫)। জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা। কলেজ স্কয়ার, কলকাতা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১৩)। 'আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা : ব্যাপ্তি ও দীপ্তি'। ১৯ ফেব্রুয়ারি, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম, ঢাকা

উপসংহার

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রাচীনকাল থেকে খাদ্যশস্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষিজীবী, কৃষক, কৃষিশ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এ-অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কৃষক ও কৃষিব্যবস্থার সক্রিয় অবস্থান এবং সমাজ বিনির্মাণে কৃষকজীবনের অংশগ্রহণ যেমন দেখা যায়, তেমনি রাজনৈতিক ইতিহাসে শাসক-শোষকদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের শ্রমজাত অর্থনৈতিক অবদানের অনস্বীকার্য পরিচয়ও পাওয়া যায়। খাদ্য উৎপাদনে তাদের শ্রমদান ও বঞ্চনা যেন নিয়তি-নির্ধারিত ছিল। একটা সময় পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে অবিকল্প পেশাজীবী হিসেবে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের ওপরই নির্ভর করা হতো। কালক্রমে মানুষের শ্রম বিনিয়োগের নানা ক্ষেত্র প্রসারিত হলেও এমনকি কৃষকের অবদান খর্ব না হলেও তাদের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শত শত বছর ধরে কৃষকের মতো প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক যুগে নানা ক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রমিক শ্রেণিও শাসক-শোষক তথা পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত-বঞ্চিত-নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। ফলে এ-ভূখণ্ডের সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও সবচেয়ে অবহেলিত ও উপেক্ষিত পেশাজীবীর নাম কৃষক এবং শ্রমিক। এ-বাস্তবতার চিত্র আমাদের দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশেও ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বিশ শতকের বাংলাদেশের বাংলা কবিতার বর্তমান ধারা ওই শতকের ত্রিশের দশকের কবিদের কবিতা দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। একমাত্র পূর্বসূরি জসীমউদ্‌দীনকে পাওয়া যায় একেবারে গ্রামীণ শেকড় থেকে উঠে আসা কবি হিসেবে। তবে তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে একমাত্রিক গ্রামীণ জীবন; এ জীবন কেবল চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তবে, গর্বে-আনন্দে বিভিন্ন পেশাজীবন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় স্থান পেয়েছে। আর জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পাওয়া যায় গ্রামীণ জীবনের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুমাত্রিক রূপ ও রূপান্তর। কোনো নির্দিষ্ট পেশা ও গোষ্ঠীভুক্ত জীবন নয়, বরং বিচিত্র চিত্রকল্পের সমাহার ঘটিয়ে তিনি এক অনিন্দ্য গ্রামকে তুলে আনেন কবিতার শিল্পিত মহিমায়। চল্লিশের দশকে প্রগতিশীল ভাবনা ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের ধারায় যেসব কবির আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন সমাজ-রাজনীতি ও শিল্পিত কবিতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর পঞ্চাশের কবিতা দুই ভাগ হয়ে যায়—ভঙ্গবঙ্গের দুই অংশে সূচিত হয় নতুন শঙ্কা-সম্ভাবনা-

উদ্দীপনা নিয়ে দুই ধারার কবিতার অভিযাত্রা। পূর্বাংশের কবিতা রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধের তাড়নায় পরিপূর্ণ নতুনত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়। এ-সময় নতুন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য ও জীবনচর্চা ত্বরান্বিত হতে থাকে, যাতে দুই দিক থেকেই নাগরিক হওয়ার বাসনা উচ্চকিত হতে দেখা যায়।

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের চার দশকের (১৯৪৭-১৯৯০) প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের কবিতাকে বিবেচনাভুক্ত করা হয়েছে। আর নির্বাচিত কবিতাসমূহকে গুণগত অনুসন্ধান-পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যাতে গুণগত গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে সমাজবৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন-দৃষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, দেশভাগের ফলে নতুন ভূখণ্ডে নতুন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কবিগণকে নতুন বিষয় নির্বাচন এবং নতুন ভাষা বিনির্মাণের পথ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। তাতে প্রধান আশ্রয় হতে পারত কৃষক-শ্রমিক ও তাদের যাপিত জীবন; কিন্তু প্রার্থিত মূল্যে সেই আশ্রয় চিহ্নিত হয়নি। তবে দীর্ঘ কাল-পরিসরে কবিদের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ যে একেবারেই আসেনি, তাও নয়। বরং, যখন নানা অনুষঙ্গে কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ এসেছে, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অকৃত্রিমভাবেই তা স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অধিকাংশ কবির মননজুড়ে বিরাজমান থাকলেও কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রে তা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, তখন কবিগণ সদ্য নগরবাস শুরু করেছেন। গ্রাম ও গ্রামীণ পেশাজীবন তাঁদের কাছে তখনো দূরবর্তী কোনো স্মৃতি নয়। গ্রামকে কেন্দ্র করে তখনো তাঁদের মধ্যে তেমন কোনো নস্টালজিয়া তৈরি হয়নি। আবার যখন গ্রাম স্মৃতিময় হওয়ার কথা, তখন তাঁরা নগরজীবন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেকড়কে অনেকাংশে বিস্মৃত হয়েছেন। অন্যদিকে ধীরে ধীরে 'সদ্য নগরবাসী' কবিগণ তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাস্তবতায়ও আলোড়িত। সামাজিক ও রাজনৈতিক এই সব কার্যকারণ সূত্রে বলা যায়, কৃষক-শ্রমিককে তাঁরা কবিতার বিষয় ও বিন্যাসে, উৎপাদন ও উপকরণে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে চাননি।

উপর্যুক্ত এ-প্রবণতা কেবল বাংলাদেশের কবিদের মনোভঙ্গিতেই তুলনামূলক কম ক্রিয়াশীল ছিল, তা নয়। কৃষক-শ্রমিককে কাব্যপ্রবণতার প্রধান অবলম্বন না করার এ-ধারার প্রচলন প্রাচীন যুগের চর্যাপদ থেকে শুরু; এরপর মধ্যযুগ হয়ে উনিশ শতকের আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্যায় শেষে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের কবিতার জগতে তা প্রবেশ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজস্ব জোগান থেকে খাদ্য সরবরাহ, বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য—সবকিছুতেই কৃষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এ-সুদীর্ঘ কালব্যাপী রচিত কাব্যসমূহে বিভিন্ন

জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এলেও সরাসরি কৃষকের প্রসঙ্গ পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য পর্যন্ত। এর আগে কৃষক এসেছে আভাস-ইঙ্গিতে। এরপর *শিবমঙ্গল* ব্যতীত কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ কাব্যপ্রবণতায় কখনো প্রবল প্রভাববিস্তারী কোনো বিষয় হিসেবে স্থান পায়নি। আমাদের নির্ধারিত সময়পর্বে বাংলাদেশের কবিতার নানা ধরন বিশ্লেষণ করেও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কৃষক-শ্রমিক যেমন আমাদের ইতিহাসে উপেক্ষিত, তেমনি সাহিত্যেও উপেক্ষিত। কারণ, বাংলাদেশের বেশির ভাগ কবির শেকড় মৃত্তিকা-সংলগ্ন গ্রাম আর গ্রামকেন্দ্রিক পেশাজীবী কৃষক-পরিবারের গর্ভে প্রোথিত থাকলেও তাদের কবিতাতে কৃষক-শ্রমিক প্রধান বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়নি।

অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে আমাদের অন্বিষ্ট ছিল, বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় রচিত কবিতায় কৃষক-শ্রমিক ও তাদের জীবনের প্রসঙ্গ অনুসন্ধান ও তার মূল্যায়ন। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের উপান্তে এসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ব্যতীত বেশির ভাগ কবিই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিপতি, শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টি দিয়েই কৃষক-শ্রমিককে অবলোকন করেছেন। ফলে সাতচল্লিশোত্তর সময়ে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলার মধ্য দিয়ে নতুন ধরন ও নতুন ধারার কাব্যচর্চা শুরু হলেও কৃষকের সংগ্রামী জীবন ও চির-উপেক্ষিত অবস্থা তাঁদের কবিতাকে খুব একটা স্পর্শ করেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, নতুন রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা শুরু করার মধ্য দিয়ে সমাজ ও সময়ের প্রতি সচেতন থেকে এবং নতুন দায়িত্বের প্রতি প্রবলভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেকেও 'নাগরিক কবি' হয়ে ওঠার এক অদম্য বাসনা প্রায় সব কবিকে পেয়ে বসেছিল। শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার দরুন উঠতি মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে নগরবাসী হওয়ার এই প্রবণতা পঞ্চাশের দশক থেকে ষাট-সত্তর পেরিয়ে আশির দশকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নির্বাচিত কবিদের বিপুলসংখ্যক কবিতার মধ্য থেকে খুব কমসংখ্যক কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। এই কবিতাসমূহকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কেবল কবিতার শিল্পগত শ্রীবৃদ্ধি ও মানবৃদ্ধিতে কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গের ব্যবহার। এই প্রবণতাকে নিছক কবিতার প্রয়োজন মেটানোর অবলম্বন বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্বিতীয়ত, কৃষক-শ্রমিকের বঞ্চনা ও ত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করে কবিতা রচনার প্রয়াস; যেখানে কখনো-কখনো কবিগণ তাদের (কৃষক-শ্রমিকের) উত্তরসূরির সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গকে কবিতা ও শিল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করে কবিতা রচনার প্রয়াস চালানো। এক্ষেত্রে বামপন্থি বা মার্ক্সবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত কবিগণের

অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের অনেকের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ অধিক গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণির মানুষের অধিকার আদায়ের ভাবনা, তাদের চিরায়ত বঞ্চনা থেকে মুক্তির প্রয়াসে নিজেদের ভেতরে লালন করা বহমান যন্ত্রণা দ্বারা সমাজকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা কিংবা কৃষক-শ্রমিকের হয়ে নতুন স্বপ্ন দেখতে পক্ষাবলম্বন করার প্রয়াসও তাঁদের কবিতায় লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিকের উত্তরসূরি হিসেবে তাদের বঞ্চিত সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরা শিল্পিত কবিতা নির্মাণে অগ্রগামী হয়েছেন। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে এ-ত্রিধারার কবিতাকেই বিশ্লেষণ-বিবেচনায়
নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কবিদের মানস, বিরুদ্ধ বাস্তবতায় কবিতা রচনার প্রয়াস, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে কবিতাসমূহকে নন্দনতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তবে, প্রাচীনকালে কৃষক-শ্রমিকের জীবন যেমন সমাজের সুবিধাভোগীদের দ্বারা উপেক্ষিত ছিল, এখনো তেমনই রয়ে গেছে। এখনো তারা অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব নিয়ে, পুঁজিপতিদের বঞ্চনা নিয়ে তুমুল সংগ্রামী জীবন অতিবাহিত করে। অতীত-বর্তমান মিলিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল শাসকগোষ্ঠীর মাঝে বিরাজমান নয়, কবিদেরও মাঝেও বর্তমান ছিল এবং আছে। ফলে খুব কমসংখ্যক কবি কৃষক-শ্রমিককে আত্মীয় ভেবে, তাদের উত্তরসূরি ভেবে জীবনের জন্য কবিতাশিল্প রচনা করেছেন। আপাতভাবে বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রত্যাশিত হলেও তার প্রতিফলনগত বাস্তবতা ভিন্ন। অথচ আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষক-শ্রমিকের অবদান প্রাচীনকালে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মাত্রাগত ভিন্নতা পেলেও এখনো তেমনই গুরুত্ববহ।
নির্ধারিত কাল-পরিসর বিবেচনায় নিয়ে স্পষ্ট করেই বলা যায়, আদতে কোনো যুক্তিতেই বাংলাদেশের কবিতায় এ অঞ্চলের মানুষের প্রাচীন পেশা ও পেশাজীবীদের উপেক্ষার বিপরীতে অজুহাত দাঁড় করানো যায় না। এরপরও বাস্তবতা হলো, মাটিঘেঁষা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আলোড়নে কবিগণ তাড়িত হলেও কবিতায় বেশির ভাগ সময় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ উপেক্ষিত থেকেছে। অথচ এদেশের মূল সাহিত্য ধারার সবচেয়ে বড় অবলম্বন হতে পারত অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখা কৃষক ও শ্রমিক। চিহ্নিত এ-সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেসব কবি কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে কবিতা-সৃজনে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রগণ্য হলেন পঞ্চাশের দশকের শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, দিলওয়ার; ষাটের দশকে রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ; সত্তরের

দশকে আবিদ আজাদ, ত্রিদিব দস্তিদার, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, সমুদ্র গুপ্ত; আশির দশকে খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মাসুদ খান, কাজল শাহনেওয়াজ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ। কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গকে গুরুত্ববহ করে তোলায় আমরা তাঁদের মূল্যানুসন্ধান করেছি। কবিতা সৃজনে জীবনঘনিষ্ঠতা, শেকড়নিষ্ঠা, তৃণমূল-সম্পৃক্ততা এবং কৃষক-শ্রমিকের জীবনায়নকে শিল্পিত ক্যানভাসে চিরকালীন মর্যাদায় আসীন করার ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের বাংলা কবিতায় তাঁদের স্থান কালের আখরে উচ্চাসনেই নির্ধারিত থাকবে।

বাংলাদেশের কবিতায় কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গ নিয়ে এর আগে গবেষণাকর্ম সম্পাদিত না হওয়ায় আমরা নিবিড়ভাবে কবিতা বিশ্লেষণে সচেষ্ট থেকেছি। এ-অভিসন্দর্ভে প্রতিফলিত এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সামগ্রিক কবিতা-গবেষণায় একটি শূন্যস্থান পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

আবিদ আজাদ (২০০৮)। *কবিতাসমগ্র*। শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা

আবিদ আনোয়ার (২০১৫)। *কাব্যসংসার*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (২০১৬)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

আবু হাসান শাহরিয়ার (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। ভাষাচিত্র, ঢাকা

আল মাহমুদ (১৯৭১)। *আল মাহমুদের কবিতা*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

—(২০১৩)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৪)। *কবিতাসমগ্র* ১। গতিধারা, ঢাকা

কাজল শাহনেওয়াজ (২০১৮)। *কবিতাসমগ্র*। আগামী প্রকাশন, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৯৬)। *নজরুল রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১১)। *কবিতা সংগ্রহ*। শিখা প্রকাশনী, ঢাকা

জসীমউদ্‌দীন (১৯৬১)। *সূচয়নী*। পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

জীবনানন্দ দাশ (২০০২)। *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র*। জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা

ত্রিদিব দস্তিদার (২০০৫)। *কবিতাসমগ্র*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

দিলওয়ার (২০১১)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। শুদ্ধস্বর, ঢাকা

দীনেশ দাস (১৯৮৩)। *দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নির্মলেন্দু গুণ (২০২০)। *নির্বাচিতা*। কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৮৯)। *কবিতা সমগ্র*। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বিষ্ণু দে (১৩৫৪)। *সন্দ্বীপের চর*। দি বুকম্যান, কলকাতা

—(১৯৫৫)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। নাভানা, কলকাতা

মহাদেব সাহা (২০১৭)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯৪২)। *মধুসূদন রচনাবলী*। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

মাসুদ খান (২০১৮)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা

মাহবুব উল আলম চৌধুরী (২০১৯)। *কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি*। কুঁড়েঘর, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৯৮)। *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যসংগ্রহ*। প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা

মোহাম্মদ রফিক (২০১১)। *কবিতাসমগ্র*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

বিহারীলাল চক্রবর্তী (২০০০)। *বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

রফিক আজাদ (২০০৭)। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮০)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

—(১৯৮৩)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

—(২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (১১ খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

—(২০১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (১৩ খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (২০১৪)। *কবিতাসমগ্র*। অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

শহীদ কাদরী (২০১০)। *শহীদ কাদরীর কবিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শামসুর রাহমান (২০০৬)। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শোয়েব শাদাব (২০০৮)। *শোয়েব শাদাবের কবিতা সংগ্রহ*। উলুখড়, ঢাকা

সমর সেন (২০১২)। *সমর সেনের কবিতা*। সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সমুদ্র গুপ্ত (২০০৯)। *কবিতাসমগ্র*। মুক্তচিন্তা, ঢাকা

সুকান্ত ভট্টাচার্য (২০০২)। *সুকান্ত সমগ্র* (ভূমিকা : বদরুদ্দীন উমর)। চারুলিপি, ঢাকা

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ (২০০৬)। *নাগপঞ্চমী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২০০৮)। *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৯৯)। *কবিতা সংগ্রহ ১*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০১)। *কাব্যসমগ্র*। সময় প্রকাশন, ঢাকা

সহায়ক গ্রন্থ

অতীন্দ্র মজুমদার (১৩৬৭)। *চর্যাপদ*। নয়া প্রকাশ, কলকাতা

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ*। ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী

অনুপ সাদি (২০১৭)। *মার্কসবাদ*। ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা

অনু হোসেন (২০০৫)। *শিল্পের চতুষ্কোণ*। ঐতিহ্য, ঢাকা

—(২০০৭)। *বাংলাদেশের কবিতা : লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

অরুণ মিত্র (১৯৯৯)। *কবিতা, আমি ও আমরা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অশোককুমার মিশ্র (২০০২)। *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা* (১৯০১-২০০০)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অশোক ভট্টাচার্য (১৩৬৫)। *কবি সুকান্ত*। সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার (১৩৮১)। *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

—(২০০০)। চোখের দুটি তারা। প্যাপিরাস, কলকাতা

অসীম সাহা (১৯৭৬)। *প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা*। মুক্তধারা, ঢাকা

—(২০১৪)। *কবিতা-টবিতা নিয়ে কিছু কথা*। রাচী গ্রন্থনিকেতন, ঢাকা

আতাউর রহমান (১৯৭৪)। *নজরুল কাব্যসমীক্ষা*। মুক্তধারা, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০০৯)। *স্বরূপের সন্ধানে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আবিদ আনোয়ার (২০১৮)। *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

—(২০১৫)। *আমাদের আধুনিক কবিতার দুই দশক : বরেণ্য কবিদের নির্মাণকলা*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আমজাদ হোসেন (২০১৮)। *বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ১*। পড়ুয়া, ঢাকা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৯৮)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

আহমদ রফিক (২০১০)। *বিষ্ণু দে : কবি ও কবিতা*। বিভাস, ঢাকা

—(২০০১)। *কবিতা : আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*। অনন্যা, ঢাকা।

—(২০২১)। *রুশ বিপ্লব স্তালিন বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আহমদ শরীফ (২০১৮)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [প্রথম খণ্ড]*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

—(১৯৭১)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [দ্বিতীয় খণ্ড]*। বর্ণমিছিল, ঢাকা

আহমেদ মাওলা (২০০৭)। *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ইরফান হাবিব (২০০৪)। *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সমীক্ষা* (অনুবাদ: সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়)। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

—(২০১৯)। *মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, *কলকাতা*

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল (২০১৬)। *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি*। দে'জ পাবলিশিং, ঢাকা

কুদরত-ই-হুদা (২০২২)। *জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ : বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

—(২০১০)। *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

—(২০১০)। *কবিতার অন্তর্যামী : আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। নান্দনিক, ঢাকা

গৌরিকা ঘোষ (২০০৫)। *স্বাধীনতা ও পরবর্তী বাংলা কবিতা*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

গোপাল হালদার (১৪০০)। *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (প্রাচীন ও* মধ্যযুগ)। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী (১৯৯৯*)। বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গোলাম মুরশিদ (২০১৮)। *বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল-জীবনী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

গৌতম ভদ্র (১৪২০)। *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ*। সুবর্ণরেখা, কলকাতা

চঞ্চল আশরাফ (২০১১)। *কবিতার সৌন্দর্য ও অন্যান্য বিবেচনা*। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা

জহর সেনমজুমদার (১৯৯৮)। *বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জুলফিকার মতিন (২০০১)। *বিনাশী সময় অবিনাশী কাল*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

—(১৯৯৬)। *কবিতার দেশ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জুলফিকার হায়দার (২০০৪)। *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

তপন বাগচী (১৯৯৮)। *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৫)। *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

—(২০০৬)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর

—(২০০৯)। *কবিতার বহুস্বর*। প্রতিভাস, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০১২)। *কবিতার ঘর কবির বারান্দা*। সাহিত্যশ্রী, কলকাতা

—(২০১২)। *বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ*। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা

তারেক রেজা (২০১০)। *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৮৪)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

—(১৯৯৪)। *বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যপরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৮)। *কবি এবং কবিতার বিষয়-আশয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

—(২০১৬)। *বিষ্ণু দে : স্রষ্টা ও সৃষ্টি*। প্রতিভাস, কলকাতা

নিতাই জানা (২০০৭)। *পোস্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়*। বাণীশিল্প, কলকাতা

নিতাই দাস (১৯৯৩)। *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

— (১৪০২)। বাঙ্গালীর ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পূর্ণেন্দু পত্রী (২০০১)। *কবিতার ঘর ও বাহির*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পূরবী বসু (২০১৫)। *কিংবদন্তির খনা ও খনার বচন*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

বায়তুল্লাহ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৫)। *আধুনিক কবিতার রূপরেখা*। প্রকাশ ভবন, কলকাতা

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (২০০৯)। *কবিতায় বাক্‌প্রতিমা*। সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা

বিমল গুহ (২০০১)। *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান : জসীমউদ্‌দীন-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বিমলকুমার মিশ্র (২০১৫)। *সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৯)। *সাহিত্য-বিবেক*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৪৬)। *কালের পুতুল*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বৃন্দাবন কর্মকার (২০০৭)। *সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০১০)। *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

—(২০১৪)। *শামসুর রাহমানের কবিতা : অভিজ্ঞান ও সংবেদ*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

—(২০১৯)। *রবীন্দ্রকবিতার বাতায়ন*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯১)। *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

—(২০০৪)। *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় (২০১৭)। *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*। সেতু প্রকাশনী, কলকাতা

মালেকা বেগম (২০১১)। *ইলা মিত্র : নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাসুদুল হক (২০০৮)। *বাংলাদেশের কবিতা নন্দনতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুব সাদিক (১৯৯১)। *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

—(১৯৯৩)। *কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুবুল হক (২০০৫)। *তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য*। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা

—(২০১০)। *নজরুল তারিখ অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুব হাসান (২০০৫)। *কবিতায় পরম্পরায়*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

—(২০০৫)। বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মিনার মনসুর (১৯৯৯)। *হাসান হাফিজুর রহমান : বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুনীর সিরাজ (২০১৩)। *সমুদ্র গুপ্ত'র কবিতা : তুলনামূলক বিচার*। মুক্তচিন্তা, ঢাকা

মুস্তাফা পান্না (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রংগলাল সেন (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৩)। *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*। বাংলা একাডেমি

—(২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*। একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

—(২০০৭)। *কবিতা ও সমাজ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৮)। *ভাষা ও ছন্দ*। বিশ্বভারতী, কলকাতা

রমেশচন্দ্র দত্ত (২০০৮)। *বাংলার কৃষক*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রোমিলা থাপার (১৯৬০)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ*। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, হায়দরাবাদ

রহমান হাবিব (২০১২)। *বাংলাদেশের কবিতা : নন্দনতত্ত্ব ও জীবনার্থ সন্ধান*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা

শঙ্খ ঘোষ (২০২১)। *নির্মাণ আর সৃষ্টি*। প্যাপিরাস, কলকাতা

শফিকুল ইসলাম (২০২২)। *নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস* (*দি হিস্ট্রি অব এস্থেটিক্স* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)। [মূল : ক্যাথারিন এভারেট গিলবার্ট ও হেলমুট কুন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯৯৮)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

শৈলেশ্বর ঘোষ (২০১২)। *প্রতিবাদের সাহিত্য*। এবং মুশায়েরা, কলকাতা

সমর সেন (১৯৭৮)। *বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৮)। *বাংলা কবিতার কালান্তর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

—(২০০৬)। *সুকান্তের জীবন ও কাব্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৩)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সালাহউদ্দীন আইয়ুব (২০১৪)। *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সিকদার আবুল বাশার (২০০৩)। *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন সাহিত্য*। বাতায়ন, ঢাকা

সিদ্দিকা মাহমুদা (১৯৯২)। *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন (২০২০)। *কবিতায় নৃগোষ্ঠী : মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৩)। *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১৬)। *আধুনিক কবিতার চালচিত্র*। সাহিত্যলোক, কলকাতা

সেলিম আল দীন (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯৩)। *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*। শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

—(২০০১)। *কবিতার কথা ও অন্যান্য*। গতিধারা, ঢাকা

—(২০০২)। *আধুনিক বাংলা কবিতা*। গতিধারা, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০০৬)। *নন্দনতত্ত্ব*। সন্দেশ, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫)। *মার্জিনে মন্তব্য*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

সৌমিত্র শেখর (২০১১)। *ষাটের কবিতা : ভালোবাসার শরবিদ্ধ কবিকুল*। বিভাস, ঢাকা

হাসনাত আবদুল হাই (২০২১)। *সবার জন্য নন্দনতত্ত্ব*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০০)। *আধুনিক কবি ও কবিতা*। সময় প্রকাশন, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *নিঃসঙ্গ শেরপা/ শামসুর রাহমান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন কবির (১৯৯২)। *বাঙলার কাব্য*। অনির্বাণ, ঢাকা

Christopher Caudwell (1937). *Illusion and Reality*. Macmillan, United Kingdom. (https://www.marxists.org/archive/caudwell/1937/illusion-reality/ch07.htm)

Khondakar Ashraf Hossain (2010). *MODERNISM AND BEYOND : Western Influences on Bangladeshi Poetry*. Dhaka Viswavidyalay Prakashana Sanstha, Dhaka.

mohammad nurul huda (1986). *flaming flowers : Poets' Response to the Emergence of Bangladesh*. Bangla Academy, Dhaka

সম্পাদিত গ্রন্থ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য [সম্পা.] (১৯৯৬)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অমৃতলাল বালা [সম্পা.] (১৯৯৯)। *বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*। বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.] (২০০১)। *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আশরাফ্ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান [সম্পা.] (১৯৫০)। *নতুন কবিতা*। ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা

আহমদ রফিক [সম্পা.] (১৯৯৫)। *আহসান হাবীব রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সাঈদ-উর রহমান [সম্পা.] (২০১৩)। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*। জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় [সম্পা.] (১৯৯৪)। *শাক্ত পদাবলী*। রত্নাবলী, কলকাতা

নরেশচন্দ্র জানা [সম্পা.] (১৯৯৩)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনচর্চা*। কলকাতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকার [সম্পা.] (১৯৮৯)। *বিষ্ণু দে কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

বাপ্পাদিত্য জানা [সম্পা.] (২০১৭)। *আন্দোলন ঘটনা ও কবিতা*। অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু [সম্পা.] (১৯৬৩)। *আধুনিক কবিতা*। এম, সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

——(২০১০)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যসংগ্রহ*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী [সম্পা.] (২০১২)। *অভ্যুদয়*, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী। মেগনাম ওপাস, ঢাকা

ভূঁইয়া ইকবাল [সম্পা.] (২০০৬)। *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে : শামসুর রাহমান*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মনসুর মুসা [সম্পা.] (২০১৩)। *বাঙলাদেশ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.] (১৪০২)। *কালকেতু উপাখ্যান*। *ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা*

——(১৪০২)। *চর্যাগীতিকা*। *ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা*

—— (১৪০৫)। *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*। *ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা*

——(১৯৯৮)। *মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা*। *মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা*

মোহাম্মদ আজম [সম্পা.] (২০১৬)। *নির্বাচিত কবিতা : সৈয়দ আলী আহসান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

যোগিলাল হালদার [সম্পা.] (১৯৫৭)। *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

রফিকুল ইসলাম [সম্পা.] (১৯৭১)। *আধুনিক কবিতা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শামসুজ্জামান [সম্পা.] (২০০১)। *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সন্দীপ দত্ত [সম্পা.] (২০১২)। *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য*। র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা

সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

সুধাময় দাস [সম্পা.] (২০১৯)। *পৌরাণিক অভিধান* (সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত)। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [সম্পা.] (১৯১৬)। *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগানও দোহা*। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

হাসান হাফিজুর রহমান [সম্পা.] (১৯৫৩)। *একুশে ফেব্রুয়ারী*। সময় প্রকাশন (পুনর্মুদ্রণ ২০১৬), ঢাকা।

সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

অবন্তীকুমার সান্ন্যাল (২০০২)। 'ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের কথা'। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (সম্পা. তরুণ মুখোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ধনঞ্জয় দাশ (২০১৩)। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে'। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* (সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ)। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১০)। 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.)। আনন্দ, কলকাতা

প্রণবকুমর নায়ক (২০০২)। 'হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন'। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (সম্পা. তরুণ মুখোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রদ্যোৎ গুহ (২০১৩)। 'সাহিত্য-বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি'। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* (সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ)। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা'। *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* [সম্পা. সাঈদ-উর রহমান]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মতিউর রহমান (২০১৬)। 'পিয়ারু সরদার: ইতিহাসের সাহসী এক চরিত্র'। *প্রথম শহিদ মিনার ও পিয়ারু সরদার* [সম্পা. আনিসুজ্জামান], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রণজিৎ গুহ (২০১০)। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'। *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.)। আনন্দ, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০১৩)। 'বাঙলাদেশ'। *বাঙলাদেশ* [মনসুর মুসা সম্পা.]। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯)। 'পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা'। *আমাদের সাহিত্য* [সম্পা. সরদার ফজলুল করিম]। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হীরেন চট্টোপাধ্যায় (২০০২)। 'প্লেটো ও অ্যারিস্টটল'। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা* (সম্পা. তরুণ মুখোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

M. Harunur Rashid (1996). *Contemporary Bengali Writing: Bangladesh Period.* Contemporary Poetry of Bangladesh (etd. Khan Sarwar Murshid). University Press Limited, Dhaka

Syed Manzoorul Islam (1996). 'The Achievement of Shamsur Rahman'. *Contemporary Bengali Writing: Bangladesh Period*. [etd. Khan Sarwar Murshid]. University Press Limited, Dhaka.

সাময়িকী, পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধ

আলী রিয়াজ (২০১৩)। 'ভূমিকা : সত্তর দশকের কবিতা'। *নান্দীপাঠ* [সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.], ঢাকা

আহমদ রফিক (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। 'শিল্পসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা'। *কালি ও কলম* [আবুল হাসনাত], ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৩)। 'আশির দশকের কবিতা : ঐতিহ্যসূত্র ও নবনির্মিতি'। *নান্দীপাঠ* [সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.], ঢাকা

তরুণ মুখোপাধ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫)। 'মহাদেব সাহার কবিতা'। *এবং মুশায়েরা* [সুবল সামন্ত সম্পা. 'কবি ও কবিতা সংখ্যা'], কলকাতা

তারানা নুপুর (জুন ২০১৯)। 'কবিতার নান্দনিক রূপান্তর'। *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ঢাকা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭)। 'সমর সেন প্রসঙ্গে'। 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা' [সম্পা. পুলক চন্দ]। *অনুষ্টুপ* [অনিল আচার্য সম্পা.], কলকাতা

পিয়াস মজিদ (২০১৫)। 'গুণের সঙ্গে যেভাবে বেড়ে উঠি'। *কাশবন* (*নির্মলেন্দু গুণ সংখ্যা*) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৭)। 'রফিক আজাদের কবিতার সাতকাহন'। *কাশবন* (*অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ*) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা।

——(১৯৮৯)। 'বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবিতা : চার দশকের ধারা সূত্র'। *ঐকতান* [নীতীশ বিশ্বাস সম্পা.], ঐকতান গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৮৬)। 'গাওদিয়া : মোহাম্মদ রফিক'। *দীপঙ্কর* [জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পা.], ঢাকা

——(২০১০)। 'প্রশ্নের মুখোমুখি কবি দিলওয়ার'। *উলুখাগড়া* [সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা.], সংখ্যা ১৩, ঢাকা

মফিদুল হক (২০১৩)। 'কবি দিলওয়ার ও তাঁর মাটির ঘর'। ২৯ অক্টোবর, *প্রথম আলো*, ঢাকা।

মিনার মনসুর (২০১৭)। 'কে বলে রফিক আজাদ নেই'। *কাশবন* (অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা

মুনীর সিরাজ (২০১৩)। 'সত্তর দশকের কবিতা'। *নান্দীপাঠ* [সাজ্জাদ আরেফিন সম্পা.], ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১৩)। 'আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা : ব্যাপ্তি ও দীপ্তি'। ১৯ ফেব্রুয়ারি, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম, ঢাকা

রবিন পাল (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫)। 'নির্মলেন্দু গুণের কবিতা'। *এবং মুশায়েরা* [সুবল সামন্ত সম্পা. 'কবি ও কবিতা সংখ্যা'], কলকাতা

রফিকউল্লাহ খান (২০১৭)। 'রফিক আজাদ'। *কাশবন* (অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ) [মিন্টু হক সম্পা.], ঢাকা

শাহীন ইবনে দিলওয়ার (২০১৭)। 'কবি দিলওয়ার : কালজয়ী কবিকণ্ঠ'। ৩০ ডিসেম্বর, *প্রথম আলো*, ঢাকা

সুস্মিতা চক্রবর্তী (২০১৩)। 'শোয়েব শাদাবের কবিতা : রক্তের গভীরে ঘাইমারা বিষধর শিঙের বিবৃতি'। ২৫ ডিসেম্বর, *রাশপ্রিন্ট* [আহমেদ সায়েম সম্পা]। (https://raashprint.com/2013/12/692/)]

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০১৩)। 'গণমানুষের কবি'। *অন্য আলো*, *প্রথম আলো*। ২৫ অক্টোবর, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার (২০১৭)। 'কবিতার উপাদান নিতে আমি কখনো ইউরোপের কাছে যাইনি : সৈয়দ শামসুল হক', ২২ সেপ্টেম্বর, *প্রথম আলো*, ঢাকা

হেলাল আহমেদ (১৯৯১)। 'শোষিত মানুষের ভাষাচিত্র : মানুষের মানচিত্র'। *একবিংশ* [খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পা.], ঢাকা

জিজ্ঞাসা (২০০৫)। জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা। কলেজ স্কয়ার, কলকাতা

Encyclopedia Britannica (06 November 2020). 'aesthetics'. Encyclopedia Britannica, Inc.(https://www.britannica.com/topic/aesthetics)

https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8,_%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%B0

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE